বঙ্গভঙ্গ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

বঙ্গভঙ্গ

এক

রায়বাহাদুর শ্রাদ্ধের শাস্ত্রীয় ক্রিয়া সমাপন করে যখন আসন ত্যাগ করলেন তখন বেলা একটা, তবে শীতকালের বেলা একটা এই যা। তিনি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, আঙিনা জোড়া প্রকাণ্ড শামিয়ানার তলে সারি সারি চেয়ারে উপবিষ্ট নিমন্ত্রিতগণ, তাঁর মুখ হাস্যে ও গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি এগিয়ে গিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে শুরু করলেন; প্রথমেই গেলেন শ্বেতাঙ্গ অতিথিদের কাছে। দেখলেন শহরের সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সস্ত্রীক সমাগত, সংখ্যা বড় কম নয়; জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের বড় সাহেব, সিভিল সার্জেন; তা ছাড়া আছেন শহরের মিশনারি হাসপাতাল ও ছাত্রাবাসের কয়েকজন সাহেব; সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে নমস্কার করলেন। তাঁরাও গরদের ধুতি চাদর পরা মুণ্ডিতমস্তক শুভ্র উপবীতধারী কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটালাঞ্ছিত স্থূলকায় রায়বাহাদুরকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন। শ্বেতাঙ্গ সমাজ সাধারণত হিন্দুর শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হন না, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরাই প্রধান, কারণ এ শ্রাদ্ধ সাধারণ ব্যাপার নয়, স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমন উপলক্ষে আদ্যশ্রাদ্ধ। বিশেষ শ্রাদ্ধকর্তা রায়বাহাদুর খেতাবধারী, নামকরা সরকারী উকীল, সকলেরই তিনি খাতিরের লোক। তাঁদের আপ্যায়ন শেষ হলে রায়বাহাদুর অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণের দিকে অগ্রসর হলেন।

সকলেরই হাতে ছাপানো পুস্তিকা, গোড়াতেই বিতরিত হয়েছে। শ্রাদ্ধের তাৎপর্য, রাজারানীর মৃত্যুতে প্রজার শ্রাদ্ধে অধিকার বিষয়ক শাস্ত্রীয় বচন, তার ইংরাজি ও বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত সেই পুস্তিকায়। আর আছে শোকোচ্ছ্বাস নামে একটি বাংলা কবিতা, তারও ইংরাজি অনুবাদ দিতে ভুল হয়নি। এমন সময় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সুশীল, বয়স বারো, সেই কবিতাটি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে উচ্চস্বরে পড়তে শুরু করলো—

এ কি অকস্মাৎ অশনি সম্পাত
হ'ল রে ভারত জুড়ে
মাতা ভিক্টোরিয়া সন্তানে ত্যজিয়া
গেছে রে স্বরগপুরে।
স্বরগেতে বাজে শুনি সৰ্ব্ব কাজে
দুন্দুভি নিনাদ শুরু
দেবগণ খুশি, জননীরে তুষি
বুক কাঁপছে দুরু দুরু।
কিন্তু আমাদের দীন প্রজাদের
দুখে বুক ফেটে যায়—"

দুঃখে বুক ফেটে গেল কিনা জামাকাপড়ের স্তর ভেদ করে বোঝা গেল না, তবে বালকটির চোখ ফেটে জল পড়তে লাগলো, আর সে পড়তে পারলো না। প্রয়োজনও ছিল না, এসব কবিতা শেষ করবার প্রয়োজন বড় হয় না। কবিতার অকাল সমাপ্তি বোধ করি শোকের স্বাভাবিক তীব্রতাকে বৃদ্ধি করলো, প্রথমে শ্বেতাঙ্গ সমাজ, পরে অন্য সকলে

করতালি দিয়ে উঠল। রায়বাহাদুর সকলে দেখতে পায় এইভাবে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন—অর্থাৎ কবিতাটি তাঁর লিখিত।

আপ্যায়নাদির প্রাথমিক পর্যায় শেষ হয়ে গেলে ভোজের পালা। শ্বেতাঙ্গদের জন্য আর একটি ছোট শামিয়ানার তলে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার ব্যবস্থা, অপর সকলের জন্য বাড়ির ভিতরে প্রথানুযায়ী সারিবদ্ধ পাত পেতে খাওয়ার বন্দোবস্ত। তাদের দে ।াশোনার ভার জ্যেষ্ঠপুত্র শচীনের উপরে, শ্বেতাঙ্গদের তদ্বিরের ভার গ্রহণ করেছেন স্বয়ং রায়বাহাদুর। তিনি বার কয়েক শচীনকে ডাকলেন, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না, ভাবলেন অন্য কাজে ব্যস্ত আছে, কনিষ্ঠ সুশীলকে বললেন, বাবা, তুমি এঁদের নিয়ে বসাও গে। এই বলে তিনি জোড়হাতে শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে খানার টেবিলে বসিয়ে দিলেন। সেখানে রীতিমতো প্লেট, গ্লাস, কাঁটাচামচ ও উর্দি ও পাগড়ীপরা পরিবেশক, এগুলি খাস কলকাতা থেকে আমদানি। কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁটাচামচের টুংটাং শব্দ ধ্বনিত হতে শুরু করলো। খাদ্য কিছু অশাস্ত্রীয় বটে, আদ্যশ্রাদ্ধে আমিষ অচল, তবে এক্ষেত্রে মাছ ও পাঁঠার মাংসের ব্যবস্থা, নিষিদ্ধ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ বর্জিত। অবশ্য সে বিষয়ে আগেই জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিধান নিতে ভোলেননি রায়বাহাদুর।

একজন সতীর্থ উকীল বলেছিল, রায়বাহাদুর, আদ্যশ্রাদ্ধে আমিষ পরিবেশন করবেন?

রায়বাহাদুর বললেন, আরে বাপু, ওদের কাছে মাছ ও পাঁঠা নিরামিষের সামিল, না মানলে নিষিদ্ধ খাদ্যও দিতে হতো।

বলেন কি?

বলবো কি আর, শাস্ত্রেই আছে যত্র দেশে যদাচার।

আরে দেশটা তো হিন্দুস্থান।

হলে কি হয়, রাজত্ব যে ইংরাজের। তারপর বললেন, তবে কি জানেন জগদীশবাবু, ওরা হিন্দুশাস্ত্র লঙ্ঘন করতে চায় না, বিশেষ কুইনের প্রোক্লেমেশনের পর থেকে। দেখুন না কেন আমি যখন এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করতে যাই প্রথমটা ওঁরা অবাক হয়ে গেলেন। জজ সাহেব বললেন যে তিনি এদেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিশ বৎসর জজিয়তি করছেন, কখনও এমন ব্যবস্থা তো দেখেননি। আমি বললাম হুজুর এর মধ্যে তো কোনও রাজার মৃত্যুও ঘটেনি। তিনি বললেন তা বটে। আমি তখন বললাম, হুজুর, তা ছাড়া হিন্দুশাস্ত্রে বিধান আছে রাজা-রানীর শ্রাদ্ধে প্রজার অধিকার আছে। শুনে জজসাহেব বললেন তা হলে আর কথা নাই, করুন তা হলে শ্রাদ্ধ আমরা সবাই যাবো, তবে সকলকে ব্যক্তিগত ভাবে বলবেন।

রায়বাহাদুর যখন প্রজার শ্রাদ্ধাধিকারের কথা বলছিলেন জগদীশবাবু মনে মনে বলছিলেন, প্রজারা ভালো করেই রাজারানীর শ্রাদ্ধ করবে তার আভাস দেখা যাচ্ছে। জগদীশবাবু একটু স্বদেশী ভাবাপন্ন।

রায়বাহাদুর কৃতজ্ঞ চিত্তে গদ্‌গদ ভাষণে জোড়হাতে প্রভুদের তদ্বির করছেন, গায়ের চাদর গলায় উঠেছে, পদমর্যাদা অনুযায়ী যার কাছে যতক্ষণ থাকা উচিত থাকছেন, মিশনারী সাহেবগণ বেসরকারী ব্যক্তি, তবু তাদের একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না, হাজার হোক সাহেব তো, তাতে অতিথি।

তিনি বার দুই শচীনকে ডেকে পাঠিয়েছেন, পাননি। মনে মনে বললেন, আজকালকার ছেলের দল নিজের ইষ্ট বোঝে না। তাঁর ইচ্ছা ছিল সদ্য ইংরাজিতে অনার্স সহ বি এ পাস জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে এই উপলক্ষে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ডেপুটিগিরির পথ সুগম করে দেবেন। তা ছোকরার দেখাই নাই, বোধ হয় এতক্ষণ কোমরে গামছা জড়িয়ে উকীলবাবুদের লুচি পরিবেশন করছে। উকীলরা নিজেরাই প্রার্থী, তাদের তদ্বির করে কি লাভ!

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এ দেশে নবাগত, রায়বাহাদুর কিছু দূরে যেতেই মৃদুস্বরে ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কি?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, রাজভক্তির নিদর্শন, তবে এ রকম নিদর্শন কিছু নূতন বটে।

এরকম রাজভক্ত দেশে কত আছে?

অসংখ্য। কিন্তু কি জানো তাদের সংখ্যা আর বাড়ছে না।

কেন?

ঐ ইংরাজি শিক্ষা। এই সব রায়বাহাদুরের মতো লোকদের ছেলেদেরও মতিগতি ভালো নয়।

জয়েন্ট একে নবাগত তায় ছেলেমানুষ, বলল, ইংরাজি শিক্ষায় তো ইংরাজের প্রতি ভক্তি বাড়বার কথা।

তুমি ইংরাজের ইতিহাস ভুলে গেলে নাকি হে। রাজার গলা কাটা, রাজাকে তাড়িয়ে দেওয়া, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, রাজকর বন্ধ। এ সব স্বদেশে খুব উত্তম, বিদেশে বিষম। এর চেয়ে এদের শিক্ষা দেশী ভাষায় আবদ্ধ রাখলেই ভালো হতো। নাঃ, কারিটা বড়ো জুতসই হয়েছে, আর একবার ডাকবো নাকি?

হুজুর, এ বারে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ইংরাজি ভাষায় অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি এ পাস করেছে।

জজসাহেব সংক্ষেপে বললেন, চমৎকার।

কিন্তু জজসাহেবের মুখের মধ্যে তখন কাটলেটের অংশবিশেষ থাকায় ঠিক বুঝতে পারা গেল না সেটা কার প্রতি প্রযোজ্য।

ভিতর মহলে সারিবদ্ধ ভাবে নিমন্ত্রিতগণ উপবিষ্ট। কয়েকজন ছোকরা উকীল শাস্ত্রীয় ক্রিয়ায় ম্লেচ্ছের নিমন্ত্রণ নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে যজ্ঞ পণ্ড করবার চেষ্টা করতেই একজন বিজ্ঞ উকীল বলল, আরে বাপু শ্রাদ্ধটাই যে ম্লেচ্ছের, আর তা ছাড়া যে সব ম্লেচ্ছ অতিথি বাইরে আহার করছেন তাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বেশি গোল কোরো না, খেয়ে যাও। ওহে ঠাকুর, ঐ মুগের ডালটা আর এক হাতা দাও তো। বেশ রেঁধেছ, বলি বাড়ি কোথা? বাঁকুড়া? তা এত দূর এলে কী করে? আচ্ছা আলুর দমটা আর একবার নিয়ে এসো।

ছোকরা উকীলদের একজন এতক্ষণে বৃদ্ধের মনোযোগ আকর্ষণ করবার সুযোগ খুঁজছিল, এ বারে বলল, তা হলে কি চুপ করে থাকবো?

আহা চুপ করে থাকতে কে বলেছে, সবাই যা করছে করে যাও— খেয়ে যাও। তার পরে না-হয় রায়বাহাদুরের বড় মেয়ের বিয়ের সময় বদলা নিয়ো।

শচীনের বিয়ের সময় নয় কেন?

এই জন্যে যে ছেলের বিয়েতে মেয়ের বিয়েতে অনেক তফাৎ। তা ছাড়া শচীনও যে তোমাদের দলের। বেশ একটু স্বদেশী। দেখছ না কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না, বাপের এই প্রকাণ্ড খোশামুদি বোধ করি তার পছন্দ নয়।···আরে আরে স্বয়ং রায়বাহাদুর যে।

রায়বাহাদুর এতক্ষণে একবার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

সব ঠিক মতো দিচ্ছে তো? শচীনটা বুঝি এ দিকে আছে?

সেই বৃদ্ধ বলল, খুব সম্ভব রান্নাঘরে তদারক করছে, এ দিকেই আছে, আপনি ভাববেন না।

শচীনের উপরে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। হ্যাঁ রে সুশীল, তোর দাদা কোথায় গেল?

দাদাকে তো দেখছি না?

দেখছি না কী রে! দেখতেই হবে, যা ডেকে আন। মান্য অতিথিদের ফেলে কোথায় আড্ডা দিচ্ছে?

একজন ছোকরা উকীল জনান্তিকে বলল, মহামান্যদের কোনো অসুবিধা না হলেই হল।

রায়বাহাদুর সেই বৃদ্ধ সতীর্থের উদ্দেশে বললেন, বুঝলেন না লাহিড়ী মশাই, আজকালকার ছেলেরা—

কিন্তু তাঁর মন্তব্য শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মুহুরি এসে কানে কানে কী ফিসফিস করে বলল।

বলো কী! ভালো করে বসিয়েছ তো? চলো, চলো। তার পরে অতিথিদের উদ্দেশে বললেন, একটু জরুরী কাজ পড়েছে। কী আর বলব, এ তো আপনাদের নিজের বাড়ি, তা ছাড়া সুশীল ওরা সব আছে, বলে হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন।

সেই ছোকরা উকীলটি মন্তব্য করলো, বোধ হয় আবার কোন শ্বেতাঙ্গ প্রভু এলেন।

লাহিড়ী মশাইয়ের উদ্দেশে জনৈক প্রবীণ উকীল বললেন, আচ্ছা রায়বাহাদুর চান কি? ছিলেন রায়সাহেব, হলেন রায়বাহাদুর, তার উপরে সরকারী উকীল, আর কি চাই?

কেন সি আই ই।

ইস্ বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর আর কী!

ওহে সুশীল, দইটা আর একবার যাচাই করতে বলো না, আর সেই সঙ্গে কাঁচাগোল্লা। ···কিন্তু অবিনাশবাবুকে দেখছি না যেন।

একজন ছোকরা বলল, হয়তো নিমন্ত্রণ হয় নি, তিনি পাকা স্বদেশী কিনা।

এমন সময় লাহিড়ী মশাই আধ হাঁড়ি দই শেষ করে সতৃপ্ত মন্তব্য করলেন, নাঃ, জমেছে বেশ।

ছোকরা স্বগত প্রতিমন্তব্য করলো, কোনটা?

দুই

কি হে শচীন হঠাৎ যে। তোমার অনার্স-এ প্রথম হওয়ার সংবাদ তো আগেই পেয়েছি।

আজ্ঞে সেজন্য নয়।

তবে?

জিজ্ঞাসা করলেন অবিনাশবাবু, যিনি শহরের বেসরকারী একটি স্কুলের হেড মাস্টার. রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন তাঁর প্রিয় ছাত্র।

শচীন বলল, আজ্ঞে বাড়ি থেকে চলে এলাম।

সে কি কথা! বাড়ি ভরা অতিথিসজ্জন, বাড়িতে তোমাদের এত বড়ো ক্রিয়া, আর তুমি চলে এলে। ব্যাপার কী বলো তো?

আজ্ঞে ব্যাপার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। বাবার এই সব বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগে না। মহারানীর শ্রাদ্ধ! কোন্ হিন্দু মহারানীর শ্রাদ্ধ করে। আর অতিথি সজ্জনের সবাই যে সজ্জন এমন কে বলল?

সেটা তাঁরই বিচার্য যিনি নিমন্ত্রণকর্তা। আর রাজারানীর শ্রাদ্ধের অধিকার তো প্রজার আছে।

শাস্ত্রের বিধান জানি না। কিন্তু এ ভক্তির ব্যাপার নয়—নিছক নির্লজ্জ খোশামুদি।

দেখো শচীন, বাপের কাজের বিচার করবার অধিকার পুত্রের নেই।

শাস্ত্রে কি তেমন উদাহরণ নেই? পিতার আদেশে পরশুরামের মাতৃহত্যা!

পরশুরাম কাজটা ভালো করেননি। সে কথা এখন থাক। তুমি বাড়ির জ্যেষ্ঠপুত্র হয়ে চলে এসে কাজটা ভালো করনি। রায়বাহাদুর তোমার খোঁজ করছেন নিশ্চয়।

নিশ্চয়, খোঁজ করছেন বলেই নিশ্চয় চলে এলাম।

অবিনাশবাবু চোখ থেকে চশমা জোড়া নামিয়ে রেখে বললেন, না, না কাজটা ভালো হয়নি। তার উপরে নাকি এলে আমার বাড়িতে।

তা আপনার বাড়িতে আসা যদি আপনার পছন্দ না হয় তবে না-হয় যাচ্ছি।

আহা আমি কি তাই বলেছি। বোসো বোসো।

এতক্ষণ শচীন দাঁড়িয়ে ছিল।

দেখছ তো আমি নামকাটা সেপাই। শহরসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছে আমার হয়নি, এতেই বুঝতে পারছ আমার উপরে রায়বাহাদুরের মনোভাব। তার উপরে শহরের সবাই জানে তুমি আমার প্রিয় পাত্র। এখন তোমার হঠাৎ চলে আসায় তোমায় আমায় যোগাযোগ আছে কল্পনা করে রায়বাহাদুরের সমস্ত রাগ পড়বে আমার উপরে।

মাস্টারমশাই, আপনি তো রাগের ভারি খাতির করেন। শহরের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের কার না রাগ আপনার উপরে।

তবেই বোঝো—রাগ করবার লোক আর একজন বাড়িয়ে কী লাভ। খেয়ে আসনি নিশ্চয়। ওরে রুকমি এদিকে আয়।

ডাক শুনে অবিনাশবাবুর দশ বছরের মেয়ে রুকমি এসে দাঁড়াল।

দেখ, তোর মাকে বল গিয়ে শচীন এখানে খাবে।

রুকমি এতক্ষণ শচীনকে দেখেনি, এবারে দেখে বলে উঠল, শচীনদা যে, কখন এলেন? তার পরে উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে উঠল, এখানে খাবেন? বাঃ বাঃ বেশ মজা হবে।

বলা বাহুল্য সঙ্গদোষ হেতু অবিনাশবাবুর বাড়ির কারো নিমন্ত্রণ হয়নি।

যা বল গিয়ে তোর মাকে।

রুকমি এক ছুটে ভিতরে চলে গেল।

মাস্টারমশাই, রাগের কারণ আরও বাড়ালেন তো?

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, সাগরে শয়ন যার শিশিরে কী ভয় তার। আমার বাড়িতে যাকে খেতে বলবো সে ভার আমার উপরে যেমন তোমাদের বাড়িতে কাকে নিমন্ত্রণ করবেন সে ভার রায়বাহাদুরের উপরে।

আর আমাদের বাড়ি বলবেন না, বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে চলে এসেছি।

না, না, এত বড় কথা হঠাৎ বলতে নেই।

হঠাৎ বলছি না, যদিচ প্রকাশটা হঠাৎ। বাবার এই শ্বেতাঙ্গ-তোষণ অনেক দিন থেকে আমার চক্ষুশূল। অনেক দিন হল ভাবছি পালাবো। এখন এই মহারানীর শ্রাদ্ধ উটের পিঠের শেষ বোঝা। বাবার বোঝা উচিত ছিল আমাদের মধ্যে জেনারেশন গ্যাপ হয়ে গিয়েছে।

শচীন, বাপ আর ছেলে কবে এক জেনারেশনের হয়ে থাকে। ব্যবধান অপরিহার্য।

সেটা বোঝা উচিত ছিল। ব্যবসার জন্যে যেটুকু না করলে নয় তা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু মহারানীর শ্রাদ্ধ কেন? সমস্ত দেশে আর কোথায় এমন হচ্ছে। আসলে এ টাকার শ্রাদ্ধ আর মহারানীর কুপোষ্যদের তোষণ।

সবই বুঝি শচীন, তবে কি জানো সংসারে থাকতে গেলে আপোস করে চলতে হয়।

আপোস করে চলতে পারে না এমন লোকও তো আছে। আপনি কেন সবকারী স্কুলের হেডমাস্টারি ছেড়ে এলেন এই বেসরকারী স্কুলে।

অনেকে সে জন্য আমাকে নির্বোধ বলে।

আমাকেও না হয় বলবে।

তবে ঐ যে সরকারী স্কুলের কথাটা বললে ওটা এ ক্ষেত্রে খাটে না। সরকারী স্কুল পরিত্যাগ পিতার আশ্রয় ত্যাগ নয়।

আমাদের বাড়িটা যে সরকারী স্কুলের অধম। সেখানে কোনো ভদ্রলোকের অভ্যর্থনা নেই, শহরের যত সাহেবসুবো আর খয়ের খাঁ দলের সমাদর।

তা হোক তা হোক, তবু তো নিজেদের বাড়ি।

নিজেদের বাড়িটার সীমানা বাড়িয়ে দেশটাকে নিজেদের বাড়ি ভাববার উপদেশ আপনার মুখেই শুনেছি।

কি সর্বনাশ, এই সব উপদেশ দিয়েছিলাম নাকি! তাই তো সবাই বলে আমি ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছি। তা এ সব কথা সবাই শোনে, কেউ তো মনে করে রাখে না।

যদি কেউ রাখে!

তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

দেশের ভবিষ্যৎ যেন উজ্জ্বল।

নাঃ, তোমার সঙ্গে কথায় পারবাব জো নেই—এই বলে অবিনাশবাবু হাসতে লাগলেন। হাসলে অনেক সময়ে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তিনি কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, কলকাতার কি খবর?

সে তো খবরের কাগজেই দেখতে পান।

যা দেখতে পাই নে তা-ই জিজ্ঞাসা করছি। সুরেন বাঁড়ুজ্জে কী বলেন আর রবিবাবু?

সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতাগুলো দেখতে দেখতে বেলুনের মতো ফুলে ওঠে মেসে ফিরে এসে দেখি সব কেমন চুপসে গিয়েছে। আর রবি ঠাকুরের কথা যদি বললেন তাঁর প্রবন্ধগুলোর চেয়ে গানগুলো বোঝা সহজ।

বলো কী হে, রবি ঠাকুরের গান বোঝা সহজ এ যে নূতন কথা।

নূতন কিনা জানি না, তবে সহজে ভোলা যায় না। ঘরের মধ্যে মৌমাছি ঢুকে পড়লে বের হওয়ার পথ না পেয়ে যেমন গুনগুন করতে থাকে অনেকটা তেমনি।

বেশ বলেছ। রাজনৈতিক খবর কী?

রাজনীতির কথা কে আর বলছে আমাদের। তবে কেমন যেন সব চাপা থমথমে ভাব। কানাঘুষায় শুনতে পাই লর্ড কার্জনের নাকি মতলব বাংলা দেশকে চিরে দু'ভাগ করে ফেলবেন।

আহা লর্ড কার্জন কি এত সদয় হবেন?

একে দয়া বলছেন কেন মাস্টারমশাই?

দয়া নয়। ক্যানিং, রিপন প্রভৃতি যে-সব বড়লাট আমাদের ক্ষতের উপরে প্রলেপ দিয়ে ক্ষতিটা ভুলিয়ে দিয়েছেন তাঁরা মিত্রবেশী শত্রু। আর ডালহৌসি, হয়তো কার্জনও শত্রুবেশী মিত্র। ডালহৌসির নীতির পরিণামে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন লেগেছিল। আর কার্জন যদি বাংলা দেশকে দু'টুকরো করেন তবে তার চেয়েও বড় আগুন জ্বলবে। বুঝলে না শচীন, আমাদের আঘাতের বড় প্রয়োজন।

সে যে মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা হবে।

মড়া কি জ্যান্ত আঘাত না পড়লে তো পরীক্ষা হবে না।

না, মাস্টারমশাই এ দেশের কিছু হবে না।

সে কী হে, তোমাদের মতো যুবকদের মুখে তো নৈরাশ্যবাদ মানায় না।

কোথাও তো কোনো আলো দেখছি নে।

তার মানে আলো জ্বলেনি। তেলও আছে, সলতেও আছে, কেবল স্ফুলিঙ্গটুকুর অভাব।

সেটাই তো আসল।

কোনটাই তুচ্ছ নয়, স্ফুলিঙ্গও আসবে। কামারে নেহাই-এ আঘাত দেয় দেখেছ, ফুলকি ছুটে বের হয়। আঘাত চাই হে, আঘাত চাই। ডালহৌসি আঘাত করেছিল, আবার হয়তো করবে কার্জন। রবি ঠাকুরের নৈবেদ্য পড়েছ? নির্দয় আঘাত করি পিতঃ/ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

আজ রবিবার, স্কুলে যাওয়ার তাড়া ছিল না, মনের মতো বিষয় পেয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের আলোচনার ধারা আপনি প্রবাহিত হয়ে চলল। ইতিমধ্যে রুকমি এসে বার দুই আহারের তাগিদ দিয়ে গিয়েছে।

শচীন, তুমি তা হলে বাড়িতে ফিরছ না, যদিচ ফিরলে ভালো করতে, তা এখন কী করবে ভাবছ?

আজই কলকাতা রওনা হব।

আজই? কেন দু-চার দিন থেকে গেলে কী হয়?

কি আবার হয়? আপনার দায়িত্বের বোঝা বাড়ে। সেটা আর বাড়াতে চাই নে।

তার পরে?

এম-এ পড়বো।

তোমার বাবা কি খরচ দেবেন?

না। দিলেও নেবো না। নিজের খরচটা কি চালাতে পারবো না?

ঠিকানা তোমার সেই পুরানো মেস তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানেই প্রথমে উঠবো, তার পরে যা হয়।

সেই সন্ধ্যাবেলা তো গাড়ি। আমিও দু-তিন দিন পরে একবার যাবো, দেখা করবো। আলাপ করিয়ে দেবো সতীশ মুখুজ্জের সঙ্গে।

নাম শুনেছি।

নাম নয় হে, একটা আস্ত মানুষ, দেখো।

আহারান্তে দু'জনে যখন বাইরের ঘরে বিশ্রাম করছে এমন সময়ে সুশীল এসে প্রবেশ করলো। সে-ও অবিনাশবাবুর ছাত্র। অবিনাশবাবুকে নিদ্রিত দেখে সে চুপিচুপি বলল, দাদা, বাবা তো রেগে টং, চারদিকে লোক পাঠিয়েছেন খুঁজতে। এদিকে মা কাঁদছেন। আমি বললাম তুমি কেঁদো না, আমি খবর নিয়ে আসছি। আমি তো জানি তুমি কোথায় আছ।

তার পরে সব নির্বিবাদে চুকেছে তো?

দাদা, বিবাদটি বাধিয়েছ তুমি।

কী রকম?

নানা রকম। একে তো শ্বেতাঙ্গ পরিচর্যা করোনি। তার উপরে—

তার উপরে আবার কী রে?

তুমি চলে যাওয়ার পরেই তাজপুরের রাজবাড়ি থেকে লোক এসে উপস্থিত তোমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।

বলিস কী, একেবারে তাজপুর থেকে তাজ হাতে করে!

তায় আবার রাজবাড়ি। এদিকে তুমি পলাতক। বাবা তাদের বোঝালেন জরুরী কাজ পড়ায় তুমি হঠাৎ কলকাতায় চলে গিয়েছ, এলেই খবর পাঠাবেন।

তা হলে তো পিতৃবাক্য-রক্ষার জন্য সত্যিই আমাকে কলকাতায় যেতে হয় দেখছি।

সত্যি কলকাতা যাবে নাকি? মা যে কাঁদছেন।

তাঁকে বুঝিয়ে বলিস আমার জন্য যেন চিন্তা না করেন। নিয়মিত চিঠিপত্র দেবো, আর সোমবারে তেলাকুচা পাতার রস খেতে ভুলবো না।

শেষোক্ত অংশে দুজনেই হেসে উঠল। দুজনেই সুন্দর, হাসিতে আরও সুন্দর দেখালো। হাসলে যাকে সুন্দর না দেখায় সে ব্যক্তি সন্দেহভাজন।

শচীনের মাতা পুত্রের আসন্ন রিষ্টি কাটাবার আশায় কোন্ এক তান্ত্রিকের কথামতো ঐ তুকের ব্যবস্থা করেছেন।

আর নয় তুই পালা। বেশি কথাবার্তা বললে মাস্টারমশাইর ঘুম ভেঙে যাবে।

সুশীল নিদ্রিত শিক্ষকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আস্তে আস্তে বলল, দেখো দাদা, মাস্টারমশাই ঘুমোচ্ছেন তবু চোখ দুটো একটুখানি খোলা।

আরে ওকে বলে যোগনিদ্রা, জাগাও বটে ঘুমনোও বটে। নে এখন পালা। মাকে প্রণাম দিস।

সুশীল প্রস্থানোদ্যত হলে শচীন শুধালো, হাঁ রে মলি কী করছে?

মলির বসবার অবসর কোথায়? মুখ যে পান্তুয়ায় ভরা।

মলি ওদের ছোট বোন।

সুশীল দরজার কাছে গিয়ে বলল, বাড়ি সত্যি যাবে না?

শচীন তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, না।

সুশীল আরও যখন কী বলতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু দাদার মুখের মাংসপেশীর দৃঢ়তা লক্ষ করে মনের কথাটা গিলে ফেলে দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটলো।

দ্রুত গতি মনোভাব চাপা দেবার একটি উপায়।

তিন

তাজপুর রাজার দেওয়ানজি যখন রাজকন্যার সঙ্গে রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করলেন, রায়বাহাদুর ভাবলেন এতদিনে তাঁর সৌভাগ্যের ষোল কলা পূর্ণ হতে চলল, আর হবেই বা না কেন, শ্বেতাঙ্গ-ভোজনের পুণ্যের ফল কিছু তো পাওয়া যাবেই, উপরি আছে মহারানীর প্রতি অহৈতুক ভক্তি। ওদিকে দেওয়ানজি ভাবলেন এ রকম ঘরেই রাজকন্যার পড়া উচিত। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন অনেকগুলি টাকচিক্কণ মস্তক ভূরিভোজনে নিযুক্ত। যাদের দূরে থেকে দেখে সেলাম করে কৃতার্থ হতে হয় তারা কিনা সশরীরে রায়-বাহাদুরের অতিথি।

রায়বাহাদুরের মনে পড়লো চল্লিশ বছর আগে দু'টাকা ফিসের উকীল হয়ে বটতলার জমি জরিপ করে সারা দুপুর কাটিয়েছেন তবে না দেখা দিয়েছে সৌভাগ্যের চন্দ্রকলা। তার পরে রায়সাহেব, সরকারী উকীল, রায়বাহাদুর, অপরং কিম্ ভবিষ্যতি। এখানেই যে ভাগ্যের লীলা শেষ এমন কখনও মনে হয়নি। প্রমাণ তো হাতে হাতে মিলল—রাজার ঘর থেকে এলো পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব। আর হবেই বা না কেন? অনার্স পাস পাত্র জেলায় কয়টি আছে?

দেওয়ানজি ও রাজবাড়ির মুহুরি দু'জনকে বৈঠকখানাবাটীতে পাঠিয়ে দিলেন শৈলেন-খুড়োর সঙ্গে। শৈলেনখুড়ো রায়বাহাদুরের জ্ঞাতি সম্বন্ধে খুড়ো, তবে তাঁর প্রধান পরিচয় রায়বাহাদুরের প্রধান মুহুরি আর বাড়ির কর্মকর্তা। লোকটি কাজকর্মে চৌকশ আর সৎ প্রকৃতির। রায়বাহাদুর আশ্রিতপালক, দূর নিকট অনেক আত্মীয়স্বজন থাকে তাঁর বাড়িতে। তিনি জোড়হাতে দেওয়ানজিদের বললেন, এখন আপনারা স্নানাহার করে বিশ্রাম করুন,

বিকালবেলায় কথাবার্তা হবে— আর অমনি পাত্রকেও একবার দেখে যাবেন। দেখছেন তো আমি ওঁদের নিয়ে ব্যস্ত।

দেওয়ানজি বললেন, বিলক্ষণ। আমাদের ভার যোগ্য লোকের হাতে দিয়েছেন, আপনি সাহেবদের দিকে যান।

মামলাসূত্রে শৈলেন খুড়োর সঙ্গে দেওগানজির পরিচয় ছিল।

কিন্তু এদিকে শচীনটা গেল কোথায়? ওরে সুশীল, তোর দাদাকে একবার পাঠিয়ে দে।

সংবাদটা অন্দরমহলে পৌঁছুতেই পুরনারীদের রসনাগ্র আনন্দিত উলুধ্বনিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। আজ তারা সকলেই নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে নানা রকম দাবি পেশ করলো গৃহকর্ত্রী নিস্তারিণীর কাছে। রাখোর মা শৈশব থেকে শচীনকে মানুষ করেছে, সে দাবি করে বসলো বেনারসী শাড়ি।

হরির মা বলল, তোমার কি আর বেনারসী শাড়ি পরবার বয়স আছে দিদি?

কেন, বেটার বউয়ের জন্যে তুলে রাখবো।

এখানে তার জিত। হরির মার ছেলে নেই, কোনো কালে ছিল না। কোন্ সম্বন্ধে সে হরির মা স্বয়ং শ্রীহরি ছাড়া আর কেউ জানে না।

অন্দর মহলে মাসি পিসি খুড়ি মামি প্রভৃতি সকলের মুখে হাসি, মলিন মুখ শুধু নিস্তারিণীর। তিনি আগেই সুশীলের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনেছেন, শুনেই বুঝেছেন তাজপুরের তাজের লোভেও শচীন ফিরবে না, এই নিয়ে একটা অনর্থপাত হবে। তাঁর এখন ভাবনা কথাটা জানতে পারলে স্বামী আগুন হয়ে উঠে একটা কাণ্ড করে বসবেন। তার চেয়েও বড়ো ভাবনা কথাটা কী ভাবে গোপন করে রেখে রাজবাড়ির লোকদের কী বোঝাবেন।

শৈলেনখুড়োর স্ত্রী এসে বলল, বৌ, রাজার বেয়ান হতে চললে, মুখে হাসি নেই কেন?

খুড়ি, রাজার বেয়ান হওয়ার দায় কি কম?

বউ যার দায় সে বহন করবে, তুমি হেসে নাও।

কথাটা এখানেই মিটে গেল।

নিস্তারিণী দেবী অত্যন্ত ভালোমানুষ কিন্তু তাঁর মধ্যে কোথায় কী শক্তি ছিল সবাই ভয় করতো, সবচেয়ে বেশি স্বয়ং রায়বাহাদুর। যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভয়। জগৎপাতা বিষ্ণুর বাহন ভয়ংকর গরুড়।

শ্বেতাঙ্গ দায়মুক্ত রায়সাহেব বিকাল বেলায় বৈঠকখানা বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলেন মাধ্যাহ্নিক নিদ্রান্তে দেওয়ানজি একখানা বৃহৎ হেলানো মোড়ার উপরে বসে পা দোলাচ্ছেন। রায়বাহাদুরকে দেখেই একবার দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে উঠলেন, আসুন, আসুন রায়বাহাদুর।

আহাহা উঠবেন না, উঠবেন না, আপনি অতিথি।

তার পরে ওদিকে সব চুকলো?

হ্যাঁ, ওঁরা অনেকক্ষণ বিদায় নিয়েছেন।

রায়বাহাদুর, আপনি এক কাণ্ডই করলেন। রাজবাড়িতে একটা সাহেব গেলে আমরা কী করবো ভেবে পাই নে আর জেলার সমস্ত সাহেব আপনার বাড়িতে এসে ভূরিভোজন করে গেল—এ কি কম ব্যাপার!

আসতেই হবে দেওয়ানজি, এ যে স্বয়ং মহারানীর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ, না এসে উপায় কী?

মহারানীর শ্রাদ্ধ করাও তো কম কথা নয়—আমরা মাতৃশ্রাদ্ধ করতেই হিমসিম খেয়ে যাই। আর মহারানী কিনা জনক জননী জননী।

চমৎকার বলেছেন। আগে জানলে শ্রাদ্ধ-বিবরণীর পুস্তিকায় ঐ কথাগুলিও বসিয়ে দিতাম, সেই সঙ্গে ইংরাজি অনুবাদটাও।

আর ইংরাজির মালিক তো আপনার ঘরেই। বাবাজি অনার নিয়ে পাস করেছে শুনেই রাজাবাহাদুর বললেন, যাও এখনই বিয়ে ঠিক করে এসো।

এই আশঙ্কাটা রায়বাহাদুর আপাতত চাপা দিতে চান। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আপনাদের বুঝি পুস্তিকা দেয়নি। আরে কে আছিস?

এই দেখুন না কেন, একসঙ্গে পাঁচখানা, যত্ন করে রেখে দিয়েছি, রাজাবাহাদুরকে গিয়ে দেখাতে হবে না।

একখানা পুস্তিকা হাতে তুলে নিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, এই যে ইংরাজি অনুবাদ সমস্ত শচীনের করা।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। শচীন ঘাড় পাতেনি। একজন জুনিয়ারকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিতে হয়েছে।

ইংরাজি পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো সাহেবকে দিয়ে বুঝি করিয়ে নিয়েছেন, এ তো দেশী লোকের ইংরাজি বলে মনে হয় না। আমি বললাম, না স্যার, আমার ছেলের লেখা। শুনে বিস্মিত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—অক্সফোর্ডের পাস বুঝি? আমি বললাম না স্যার, এবারে সে কলকাতা থেকে ইংরাজিতে অনার নিয়ে পাস করেছে। শুনে হিজ অনার অবাক। তিনি শচীনের সঙ্গে পরিচয় করতে চাইলেন। আমি বললাম, স্যার, এই মাত্র আমার খুড়িমার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কলকাতায় রওনা হয়ে গিয়েছে। বললেন ফিরে এলে আমার কাছে নিয়ে যাবেন।

তবে শচীন বাবাজি কি—

আরও শুনুন, জজসাহেব শুধোলেন, রায়বাহাদুর এই যে শ্রাধ্ করলেন এর ফল কী?

ফল এই যে মহারানীর স্বর্গবাস অক্ষয় হবে। অবশ্য নিজ পুণ্যেই তিনি স্বর্গে যাবেন, তবু আমাদের মনের সান্ত্বনার জন্যে।

ওঁরা বড় লোক, মন উদার, বলবেনই তো। কিন্তু শচীন বাবাজি কি সত্যি আপনার খুড়িমার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কলকাতা গিয়েছে?

সাহেবকে তো সত্যি কথা বলা যায় না, আসল কথা এই যে চীফ সেক্রেটারির জরুরী চিঠি—এখুনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দেবেন বোধ করি?

অসম্ভব নয়, ওঁরা সব পারেন।

পারেন বইকি, চীফ সেক্রেটারির অসাধ্য কি।

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলা যায় না, কী জানি সাহেবে সাহেবে ঠোকাঠুকি। এঁর হাতেও নমিনেশনের ভার আছে—শেষ পর্যন্ত হয়তো দুটোই ফস্কে যাবে।

কি যে বলেন, অনার পাস তো ঝুড়ি ঝুড়ি মেলে না। তা হলে শচীন বাবাজির সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। তাই তো?

এর জন্যে ভাবছেন কেন? আজই জরুরী করে লিখে দিচ্ছি। আহা, আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম। স্বয়ং রাজাবাহাদুর যখন মাথার উপরে, পড়ে মরুক গে চীফ সেক্রেটারি। আর কথাবার্তা তো সব হয়েই থাকলো, রাজাবাহাদুর যা হুকুম করবেন তা-ই হবে।

তা হলে দেখা হচ্ছে না। আচ্ছা একটা ছবি আছে কি?

আছে বইকি। শৈলেনখুড়ো দেখো তো—

শৈলেনখুড়ো এতক্ষণ নিকটে দাঁড়িয়ে মিথ্যার চৌঘুড়ি চালানোর নিপুণতা দেখছিলেন। সৎ ব্যক্তিকে অসত্যের আগুনে দগ্ধ হতেই হয়—ওতেই নাকি সত্যের পরীক্ষা।

শৈলেনখুড়ো খুঁজেপেতে একখানা ফটোগ্রাফ নিয়ে এল—শচীন ও সুশীলের একত্রে তোলা ছবি।

এটি বুঝি বাবাজি?

আর ঐ ছোটটি সুশীল, ওর কনিষ্ঠ, এই দুটিই আমার ছেলে।

আহা রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। একেবারে জোড়া কার্তিক।

এতক্ষণে দেওয়ানজি একটি সত্য কথা বললেন।

আজ্ঞে দুটিরই জন্ম কার্তিক মাসে কিনা।

হায়, রায়বাহাদুরের এ পর্যন্ত একটিও সত্যভাষণের সুযোগ মিলল না।

সংসারে সত্যভাষণের সুযোগ কত দুর্লভ।

তখন দেওয়ানজি বললেন, তাহলে এখন বাবাজির সঙ্গে দেখা হল না, আর একবার আসতে হবে।

সে কী কথা। একবার এসেছেন তাতেই আমরা কৃতার্থ। এবারে আমি যাবো।

সে অতি উত্তম, রাজাবাহাদুর খুব খুশি হবেন। সেই সময়ে দেনাপাওনা সম্বন্ধে কথাবার্তা হবে।

দেনাপাওনা আবার কি। রাজাবাহাদুর যা হুকুম করবেন তাই হবে।

রায়বাহাদুর এ ছবিখানি আমি নিয়ে যাচ্ছি।

নিশ্চয় নিশ্চয়। আর আমি যাওয়ার সময় ভোজের সময়ে সাহেবদের যে ছবি তুলেছি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। আজই দিতাম কিন্তু এখনও তৈরি হয়নি।

তবে সেই কথাই রইলো।

সন্ধ্যার পরে রাজবাড়ির লোকদের আহারাদি করিয়ে বিদায় দিলেন রায়বাহাদুর, সঙ্গে এক ঝুড়ি উৎকৃষ্ট সন্দেশ দিতে ভুললেন না। দেওয়ানজিরা হাতিতে এসেছিলেন, হাতিতেই রওনা হয়ে গেলেন।

তখন রায়বাহাদুর সুসংবাদ বহন করে গৃহিণীর উদ্দেশে প্রস্থান করলেন। নিস্তারিণী দেবী তখন নিজের ঘরে বসে সলতে পাকাচ্ছিলেন, লক্ষ্মীর প্রদীপের সলতে পাকাবার ভার আর কারো উপরে দেন না। ঘিয়ের প্রদীপটা সাজাবার ভারও স্বহস্তে রেখেছেন।

কি সুসংবাদ শুনেছ তো, এবারে তো রাজার বেয়ান হতে চললে, মা লক্ষ্মীর প্রদীপ সাজানো তোমার সার্থক হয়েছে।

গৃহিণী মুখ না তুলে সলতে পাকাতে পাকাতেই বললেন, হুঁ।

হুঁ কি? কোথায় সন্দেশ খাওয়াবে না সংক্ষেপে হুঁ? এতেও খুশি নও? ছবি নিয়ে গেল যে।

গৃহিণী আবার গম্ভীর ভাবে বললেন, ছবির সঙ্গে বিয়ে হবে নাকি?

এক রকম তাই। ঐ ছবি দেখে রাজবাড়িসুদ্ধ লোক নেচে উঠবে। দেওয়ানজি বললেন কিনা কার্তিকের মতো চেহারা, নাচেন আর কী।

তাঁরা নাচুন না নাচুন তুমি তো নাচতে শুরু করেছ।

নাচবো না! তাজপুরের রাজাবাহাদুর স্বয়ং দেওয়ান পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন এ কি কম কথা? কিন্তু ছেলেটা ঠিক এই দিনেই গেল কোথায়?

আমি কি জানি।

তাই তো ভাবছি, তুমিও জানো না, আমিও জানি না, ব্যাপার কী?

আমি কি করে জানবো? হয়তো তোমার শ্বেতাঙ্গ কুটুম্বদের তার পছন্দ নয়।

আরে পছন্দ কি আমারই—যত সব ম্লেচ্ছ! তবে কি জানো রাজত্ব চাকরিবাকরি সবই তাদের হাতে—

গৃহিণী এবারে সলতেগুলো গুছিয়ে রেখে বললেন, মহারানীর শ্রাদ্ধ কাউকে করতে কখনো শুনিনি।

শুনবে কী করে? এর আগে তো মহারানী মরেননি। তা ছাড়া শাস্ত্রে বিধান আছে।

শাস্ত্রের সব বিধানই তো মানছ, কেবল এটাই বাকি ছিল।

রায়বাহাদুর দেখলেন যে-কারণেই হোক গৃহিণীর মন ভার। হয়তো বা শচীনের হঠাৎ বেগানা হওয়াতেই এমনটি ঘটেছে। তখন উঠে পড়ে বললেন, সুশীলটা নিশ্চয় জানে, যাচ্ছি তার খোঁজে।

রায়বাহাদুর প্রস্থান করতেই গৃহিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লক্ষ্মীর প্রদীপ সাজাবার উদ্দেশ্যে গৃহান্তরে গেলেন।

এ দিকে ঝানু উকীল রায়বাহাদুরের জেরার প্যাঁচে সুশীলকে সব কথাই স্বীকার করে ফেলতে হল। এখনো সে রায়বাহাদুরের মতো সত্যভাষী হয়ে উঠতে পারেনি।

বুঝেছি ঐ অবিনাশ মাস্টারের ফুসলানিতেই ঠিক এই দিনটিতে বেটা পালিয়েছে।

তাঁর বিশ্বাস হল অবিনাশ মাস্টারকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি তাই এই ভাবে প্রতিশোধ নিল।

দাঁড়াও লোকটাকে শহর-ছাড়া করছি। স্বদেশী স্বদেশী করে লোকটা ইস্কুলের ছেলে-গুলোর মাথা খেলো—আর শেষে কিনা করলো আমার এই সর্বনাশটি। শৈলেনখুড়ো—

ডাক শুনে তিনি এলেন।

শৈলেনখুড়ো, সব শুনেছ তো?

শুনেছি বইকি, তাজপুর রাজবাড়ি থেকে শচীনের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে।

আরে সে তো এসেছেই। কিন্তু এদিকে শচীন যে বেপাত্তা।

বেপাত্তা হতে যাবে কেন? কাছেভিতেই কোথাও আছে।

কাছেও নয় ভিতেও নয়—একেবারে কলকাতায়।

বলছ কি যজ্ঞেশ!

ঠিক কথাই বলেছি, জেরার চোটে সুশীলের পেট থেকে সব টেনে বের করেছি। অবিনাশ মাস্টার ভুজুংভাজুং দিয়ে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

না, না, তিনি সৎ লোক, এমন কাজ করবেন কেন?

শৈলেনখুড়ো তোমার সরল মন, কিছু বোঝ না। ঐ সৎ লোকগুলোই সংসারে মাছের কাঁটা।

শৈলেনখুড়ো, তবু ছাড়েন না, এর মধ্যে অবিনাশবাবু আছেন মনে হয় না। হয়তো শচীনের হঠাৎ কোন কাজ পড়েছিল বলে চলে গিয়েছে।

না, না, অবিনাশ মাস্টারের ফুসলানি ছাড়া এ কিছুতেই ঘটতে পারে না। এখন জজ ম্যাজিস্ট্রেট আমার হাতের মুঠোর মধ্যে, এবারে তাড়াতে হবে ঐ সৎ লোকটিকে। দেখি তার সুরেন বাঁড়ুজ্জে বাবা কেমন করে তাকে বাঁচায়। শোনো খুড়ো, কালকেই তুমি কলকাতায় চলে যাও, একেবারে পাকড়াও করে নিয়ে এসো।

আরে তুমি তো বললে পাকড়াও করে নিয়ে এসো, কিন্তু কলকাতা তো একটুখানি জায়গা নয়—কোথায় আছে কেমন করে জানবো?

সে তার পুরানো মেসেই উঠেছে, সেখানে খোঁজ করলেই নিশ্চয় পাবে। নাঃ, আর দেরি নয়, কাল সকালেই রওনা হয়ে যাও।

শৈলেনখুড়ো 'সৎ ও সত্যভাষী' নয়—বিষণ্ণ মনে প্রস্থান করলো।

সেদিন নিস্তারিণী দেবীর লক্ষ্মীর প্রদীপ শুধু ঘিয়ে জ্বলল না, তার সঙ্গে মিশল তাঁর চোখের জল। লক্ষ্মীর আসনের কাছে মাথা লুটিয়ে তিনি অনেকক্ষণ পড়ে থাকলেন। স্বামী পুত্র কন্যা সংসার চার নৌকায় পা রেখে মেয়েদের সংসার-যাত্রা। তুলনায় দু'নৌকায় যাত্রা রূপক মাত্র।

বাইরে তখন ছেঁড়া কলাপাতা ভাঙা খুরি সরা নিয়ে পাড়ার কুকুরগুলোর কাড়াকাড়ি ও কলহ চলছে।

শচীন ট্রেনের কামরায় হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে একবার মা বলে ডেকে উঠল।

চার

কলকাতার মেসগুলি এক বিচিত্র ব্যাপার। ধর্মশালা, রেলের প্ল্যাটফর্ম ও সস্তাদামের হোটেল মিলিয়ে নিলে কতকটা কাছাকাছি যায় বটে। ওরই মধ্যে নবনির্মিত হ্যারিসন রোডের উপরে, তখনো তার নাম নূতন সড়ক, শচীনদের মেসটা অপেক্ষাকৃত ভালো অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেম্বারের সংখ্যা অগণ্য নয়, ইচ্ছা করলে একটা সম্পূর্ণ ঘরের মালিক হওয়া যায় আর খাদ্যটা অখাদ্য নয়। মেসটা গোপালের মেস নামে পাড়ায় পরিচিত, গোপাল এর মালিক, লাভ ক্ষতি সমস্তই তার। তবে ক্ষতির কথা ওঠে না, ক্ষতি কখনো হয়নি, একমাত্র জীবিকার উপায় বলে প্রাণপণ যত্নে মেসটি সে চালায়। আরও এক কথা।

কলকাতার মেসগুলোর স্থায়ী বাসিন্দা ঠাকুর, চাকর; মেম্বারবাবুরা কলের জল, আসেন যান, কেউ দু'বছর, কেউ তিন চার বছর, কারো বছর পার হয় না। মেসের মেম্বারদের ঠিকুজি-কুলুজি গোপালের মুখস্থ, আর তার মধ্যে যারা কৃতী, তাদের নিয়ে গোপালের গৌরবের অন্ত নাই।

এখন মহারানীর মৃত্যু উপলক্ষে বেশ কয়েক দিন স্কুল-কলেজ বন্ধ, মেম্বারদের অধিকাংশই দেশে গিয়েছে—কাজকর্ম কম। এই অবসরে সকালবেলায় ঠাকুর-চাকরদের সে বলছিল তিন নম্বরের শচীনবাবু বি এ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন। এমন যে হবে আমি আগেই জানতাম, পড়াশোনায় যেমন শিক্ষা সহবতেও তেমনি, আর হবেই না কেন, বড় ঘরের ছেলে, বাপ রায়বাহাদুর, সরকারী উকীল।

ঠিক সেই সময়ে কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে শচীনের প্রবেশ।

এই যে বাবু, আপনার কথাই হচ্ছিল—এই এলেন বুঝি?

হ্যাঁ গোপাল, আজ ট্রেনখানা ঠিক সময়ে এসে পড়েছে। তা তোমাদের সব ভালো তো?

গোপাল একটি প্রমাণসই প্রণাম করে বলল, বাবু, আপনার আশীর্বাদে সব মঙ্গল।

আমায় জায়গা দেবে কোথায় হে?

কেন, আপনার তিন নম্বর ঘর ঠিক আছে, ও ঘর কাউকে বিলি করিনি, জানি আপনি এম এ পড়তে আসবেন।

তবে চলো।

চার বছরের পরিচিত ঘরটির মধ্যে এসে শচীন দু'দিন পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সে বরাবর একা একটি ঘর নিয়ে থাকে।

দাঁড়ান বাবু, আপনার চেয়ারখানা এনে দি, পাছে আর কেউ ব্যবহার করে ভেঙে ফেলে, সরিয়ে রেখেছিলাম।

অভ্যস্ত চেয়ারখানিতে বসে ভারি আরাম অনুভব করলো, ইতিমধ্যে গোপাল ধূমায়মান চা নিয়ে এসেছে। চা পান করতে করতে দেখল তার ব্যবহারের তক্তপোশ আলমারি যথাযথ আছে।

গোপাল বলল, বাবু, ঠাকুর-চাকরেরা সকলে আপনার পরীক্ষার ফল জেনেছে, টাকা-পয়সা, ধুতি-চাদর দাবি করবে, যা দেবেন আমার হাত দিয়ে দেবেন।

বেশ তাই হবে, তুমিই তো বরাবর আমার মুরুব্বি।

গোপাল এক গাল হেসে ফেলল। হাসলে দেখা যায় নীচের পাটির দুটো দাঁত নেই। তার দাঁত পড়বার বয়স নয়, তবে যখন গাছ থেকে পড়বার বয়স ছিল তখন অভাব ঘটেছিল এই দন্ত দুটির।

ওর সঙ্গীরা বলে, গোপালদাদা বাঁধিয়ে নাও না কেন?

আরে ভাই যে-কয়টা আছে তাদেরই খাওয়ার যোগাতে পারি না। দুটো গিয়েছে বালাই গিয়েছে, আরও কয়টা যায় তো বাঁচি।

সকলে বলে এটা তোমার মনের কথা নয়।

গোপাল বলে, না, পেটের কথা।

চা খাওয়ার পরে পথশ্রমের ক্লান্তিতে শচীন ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল পাশের ঘরের তুমুল বিতর্কে।

এই দেখো না কেন বঙ্গবাসী কী লিখেছে?

আরে বঙ্গবাসী তো লিখবেই—কাগজখানা বরাবর সরকারের খোশামুদে। আমি হিতবাদী আর সঞ্জীবনী মানতে রাজী আছি।

দেখো নবীন, হিতবাদীর মাথার ঠিক নেই, এক একদিন এক এক রকম লেখে। আর সঞ্জীবনী তো ব্রাহ্মদের কাগজ, দেবদেবীই মানে না, তার আবার মহারানী।

তবে কি তুমি ভাবো ইংলিশম্যান নিন্দা করবে?

আহা ইংলিশম্যানের কথা উঠছে কেন, আমাদের অমর্তবাজার কী বলে দেখাও।

ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘর থেকে একজন মেম্বার অমৃতবাজার পত্রিকা হাতে ঢুকল—চমৎকার লিখেছে—'ট্রাভেস্টি অব এ হিন্দু রিচুয়্যাল বাই এ সাইকোফ্যান্ট রায়বাহাদুর অ্যাট দিনাজশাহী টাউন।"

কণ্ঠস্বরে শচীন বুঝল এরা সবাই নূতন মেম্বার, যার মধ্যে একজনের নাম নবীন, বিতর্কের বিষয় মহারানীর শ্রাদ্ধ।

নবীনের কণ্ঠস্বরে শোনা গেল, এই রায়বাহাদুরগুলোই দেশের কাঁটা।

কেন, তাদের দোষটা কি শুনি?

কত বলবো। এই দেখো না এক বেটা ঘটা করে মহারানীর শ্রাদ্ধ করে বসলো। লোকটাকে একঘরে করা উচিত।

কে কাকে একঘরে করে দেখো। এখন তার পিছনে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে খোদ ভারত সরকার।

ভারত সরকারের নিকুচি করি।

দেখো বীরেন, তুমি নিকুচি করো আর যাই করো ভারত সরকারের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারো না।

কেন?

এই দেখো না কেন, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, খাঁ সাহেব, খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি গোটাকতক শব্দ উপহার দিয়ে গোরুর বেহদ্দ খাটিয়ে নিচ্ছে।

নবীন বলল, আমি সরকার হলে আরও গোটাকতক শব্দ সৃষ্টি করতাম বাবুসাহেব, বাবুবাহাদুর, মিঞাসাহেব, মিঞাবাহাদুর—আর গোরুগুলোকে জোয়ালে জুড়ে দিতাম।

গৃহান্তরে বসে শচীন বুঝলো, বীরেন ও নবীনের চাপে তৃতীয় ব্যক্তি ক্রমেই কোণঠাসা হচ্ছে।

বীরেন, চলো আমরা প্রতিবাদ করে খানকতক চিঠি পাঠাই, অমৃতবাজার নিশ্চয় ছাপবে।

ওহে নবীন, শতং বদ, মা লিখ।

তোমরা প্রতিবাদ করগে, আমি সমর্থনে চিঠি পাঠাবো।

তাহলে তোমার ডেপুটিগিরি নিশ্চিত।

দেখো, ব্যক্তিগত বিষয়কে এর মধ্যে টেনে এনো না।

তোমরাই টেনেছ, রায়সাহেব, রায়বাহাদুরের প্রসঙ্গ তুলেছিল কারা?

ওগুলো তো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নয়।

তুমি কি রায়সাহেব?

আমার ফাদার।

তা হলে তোমার সমর্থনপত্র বের হলে নিশ্চয় তিনি রায়বাহাদুর হবেন।

তবে রে, বাপ তুলে কথা!

একশ বার তুলবো।

ড্যাম ফুল রাস্কেল।

তবে রে—

প্রচণ্ড ঘুষির শব্দে শচীন বুঝলো ভাবী রায়বাহাদুরের পিতা আহত হলেন। তার অনেকক্ষণ থেকে ইচ্ছা হচ্ছিল ওদের বিবাদ থামিয়ে দেয়—কিন্তু পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে এ কীর্তি তার পিতার তাই অগ্রসর হতে সাহস পায়নি। পিতার সম্বন্ধে তার মনোভাব যাই হোক অপরের মুখে নিন্দা তার আদৌ ভালো লাগছিল না। কিন্তু আর বসে থাকা চলে না, চেয়ার ভাঙা, কাগজ ছেঁড়া, কিল-চড়ের শব্দে সে বুঝলো পাশের ঘরে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশেব ঘরে ঢুকে পড়ে সে সকলকে শান্ত করলো, তারাও অচেনা লোক দেখে লজ্জিত হয়ে ক্ষান্ত হল; ক্ষান্ত হল তবে কোন মীমাংসা হল না। মীমাংসার জন্যে লোকে কদাচিৎ তর্ক করে।

বিকালবেলায় বেড়াবার উদ্দেশ্যে গোলদীঘির দিকে চলল শচীন। গোলদীঘির কাছে আসতেই একটা বাড়ির গায়ে লেপটানো খবরের কাগজ চোখে পড়ল তার, দেখতে পেলো মোটা মোটা অক্ষরে পাতাজোড়া হেডলাইন "রায়বাহাদুরের বাহাদুরি, মহারানীর শ্রাদ্ধ করে বাজিমাত।" অন্তত কলম দুই সংবাদ। সেদিকে আর না তাকিয়ে এগিয়ে চলল, সামনেই আর এক খণ্ড খবরের কাগজ "মহারানীর শ্রাদ্ধ না দেশের শ্রাদ্ধ" তার পরে আর এক খণ্ড খবরের কাগজ "শ্বেতাঙ্গ কুটুম্ব ভোজন", তারপরে আর এক খণ্ড "আদ্যশ্রাদ্ধে আমিষ ব্যবস্থা, হিন্দুধর্মের শ্রাদ্ধ।" শচীন বুঝলো শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়িয়েছে, আর কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে এসে দীঘির ধারে একখানি বেঞ্চিতে বসে পড়লো, বুঝলো দিনাজশাহী শহরের ক্ষুদ্র পল্বলে যে-আবর্ত উঠেছিল তার ঢেউয়ের আঘাত কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে। অনেকক্ষণ মুহ্যমান হয়ে বসে থাকবার পরে তার মনে হল পিতার এই সর্বব্যাপী নিন্দার সময়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ানো তার কর্তব্য, নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে পালিয়ে চলে আসা ভীরুতা। তার মনে হল পিতা সুখের আশায় শ্রাদ্ধ করেছিলেন আর সে সত্যরক্ষার আশায় পালিয়ে এসেছে। দুয়েরই এক বংশে জন্ম। তবু একটু তফাত আছে। সুখ সুয়োরানীর ছেলে, সত্য দুয়োরানীর।

এমন সময়ে বেঞ্চিখানার এক পাশে দু'জন প্রবীণ ব্যক্তি এসে বসলো, তাদের হাতে একখানা ইংরাজি খবরের কাগজ।

এই যে দেয়ালে দেয়ালে নিন্দার ঢেউ এ নিছক ব্যক্তিগত আক্রোশ।

তা বইকি।

ভদ্রলোক এমন কী অন্যায় করেছে? তোমরা হাতে কালো ফিতে বাঁধছো, সভা করে শোক-দেখানো অশ্রুপাত করছ, লম্বা লম্বা শোকপ্রস্তাব পাস করিয়ে নিচ্ছ, এসব কি আন্তরিক? ভদ্রলোক মফস্বলের লোক, শাস্ত্রের অনুরোধে একটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছেন এমন কি দোষ হয়েছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, মশাই, আমি তো সকলকে সকাল থেকে এই কথাটিই বোঝাতে চেষ্টা করছি। তারা বলে, মশাই খবরের কাগজগুলো কি আপনার চেয়ে কম বোঝে!

প্রথম ব্যক্তি বলল, বেশ, খবরের কাগজের কথাই যদি উঠল, তবে শুনুন ইংলিশম্যান কি লিখেছে। বাবা, এ তোমাদের ছেঁড়া কলাপাতা নয়—দস্তুরমতো প্রথম থাকের সংবাদপত্র, বিলেত পর্যন্ত এর দৌড়, নিন শুনুন।

সে ইংলিশম্যানের সংবাদ ও মন্তব্য পাঠ শুরু করলো। তাতে রায়বাহাদুরের কাজকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, বলা হয়েছে তিনি একটা গ্রহণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন দেশের সম্মুখে, সুরেন বাঁড়ুজ্জের দলের উচিত তাঁর পদধূলি গ্রহণ করা। আর সরকারের উচিত এই সব খবরের কাগজ বন্ধ করে দিয়ে সগুষ্টি সম্পাদকদের সরাসরি জেলে নিয়ে ভরা।

শচীন এ পর্যন্ত সহ্য করেছিল বরঞ্চ ভালই মনে হয়েছিল, দেখলো পিতার সমর্থনেরও অভাব নেই। তার পরে ভদ্রলোকটি যখন সংবাদপত্রখানির মন্তব্য পড়তে শুরু করলো তখন ধাক্কা খেলো শচীনের মন। মন্তব্যে দেশের আপামর জনসাধারণকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার গুহাবাসী মনুষ্যেতর জীব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা আট-দশটা বিয়ে করে, বিধবাকে পুড়িয়ে মারে, বিবাহ দেওয়ার ভয়ে সন্তানকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে, দেশের স্ত্রীলোকগণ অসতী, পুরুষগুলো বর্বর। এরা পুতুল পুজো করে, শিখা রাখে, পৈতে ধারণ করে, এদের রাক্ষস বললেও হয়, পিশাচ বললেও হয়। ইংরাজি শিক্ষা আলো জ্বালবার চেষ্টা করছে, আর হাজার হাজার বর্বর ফুঁ দিয়ে তা নেভাতে সচেষ্ট। তবে ভরসার কথা এই যে দেশে রায়বাহাদুরের মতো দু-এক জন তত্ত্বজ্ঞানী রাজভক্ত পুরুষ আছে। সরকারের উচিত তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

দেয়ালের লিখন দেখে শচীনের মন পিতার প্রতি অনুকূল হয়ে উঠেছিল এমন সময়ে ইংলিশম্যানের মন্তব্যে আবার উল্টো ধাক্কা লাগলো। ওরা যদি শুধু পিতাকে সমর্থন করতো সহ্য করতো শচীন, কিন্তু এই উপলক্ষে দেশের কুৎসা ও গালাগালি তার মন বিরূপ করে তুলল। পিতৃভক্তি কারও চেয়ে তার কম নয়, তবে পাল্লার আর এক দিকে দেশের জন্য বেদনাবোধ প্রবল। এতক্ষণ যদিও দু'দিকে সমান সমান চলছিল, ইংলিশম্যানের মন্তব্যে বেদনাবোধের পাল্লা ভারী হয়ে মাটিতে এসে ঠেকল। সেই ভারী পাল্লার ভার বহন করে মেসে ফিরে এল সে।

ঘরে ঢুকতেই দেখল শৈলেনখুড়ো বসে আছেন। প্রণাম করে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো, দাদা আপনি হঠাৎ, হাইকোর্টে কোনও কাজ আছে বুঝি?

কাজ আছে তবে হাইকোর্টে নয়, হাইয়েস্ট কোর্টে। এই বলে শচীনের গৃহত্যাগের পর থেকে যা যা ঘটেছে সমস্ত উল্লেখ করলো। বললো, আমার উপরে তোমার বাবার হুকুম তোমাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়ার।

তদুত্তরে শচীন বলল, নিন, চা খান।

তোমার গোপাল এতগুলি গোরুর পাল চরাচ্ছে আর সে কি জানে না শচীনের দাদু এলে তাকে চা দিতে হবে, ওসব হয়ে গিয়েছে।

তখন শচীন ধীর ভাবে বলল, শৈলেনদাদা, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

কেন বাপু, বাপের কাজের বিচারক কি ছেলে?

সাধারণ ক্ষেত্রে তা নয়।

এ ক্ষেত্রে বিশেষ কী?

এক দিকে বাপ এক দিকে দেশ।

দেশের মধ্যে তোমার বাপের কাজের সমর্থনকারীও আছে।

তারা হয় ইংরেজ নয় মনে মনে ইংরেজ।

আর যারা বিরুদ্ধ সবাই বুঝি খাঁটি দেশী! ভায়া, তারা পারলে মহারানীর শ্রাদ্ধ করে তবে হয় সাহস নেই, নয় টাকা নেই।

বাবার এ শ্রাদ্ধ তো লোক-দেখানো।

লোক দেখাবার উদ্দেশ্যেই তো সমস্ত ক্রিয়াকর্ম, নইলে মনে মনে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেই তো শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

দেখো, তোমার বাবার বিশ্বাস এ সব অবিনাশ মাস্টারের শিক্ষার জন্য।

তিনি তো কুশিক্ষা দেন না।

কিন্তু ভেবে দেখেছ কি রায়বাহাদুর রেগে গেলে তাঁর টেঁকা ভার হবে?

অন্যত্র তাঁর চাকুরির অভাব হবে না। যাক, তর্ক করে আপনার সঙ্গে পারবো না শৈলেনদাদা, আর আপনার সঙ্গে আমার তর্ক করবার সম্বন্ধও নয়। এই বলে সে চুপ করলো।

তাহলে তুমি ফিরছ না, এখন তাজপুরের রাজার মেয়ের বিয়ের কী হবে?

রাজার মেয়ের পাত্রের অভাব হবে না।

তুমি কি অপাত্র?

ফুটো পাত্র দাদা—বলে হেসে উঠল।

তা হলে আর থেকে কী করবো, কালকে সকালের ট্রেনেই রওনা হয়ে যাই। আবার বিকালে কেন?

মায়ের জন্য একটা জপের মালা কিনে দেবো।

পাঁচ

মহারানীর শ্রাদ্ধের লোষ্ট্রক্ষেপে দিনাজশাহী শহরের ক্ষুদ্র পল্বলে যে তরঙ্গ-বলয় উঠেছিল তা ক্রমে বিস্তারিত হতে হতে কলকাতার সংবাদপত্রসমূহে অভিনন্দিত ও অতিনিন্দিত হয়ে অবশেষে কলকাতার বাড়ির দেয়ালগুলো লম্বিত হল। অবশেষে রয়টারের কল্যাণে বিলাতের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় মর্মরিত হল—আর সৌভাগ্যের শেষ চন্দ্রকলা রূপে দেখা দিল বিলাতের ভারত সচিবের অফিস থেকে ইস্ত্রি করা চিঠির কাগজে দরাজ

প্রশস্তিপত্র। অবশ্য তার আগেই এসেছে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত শ্বেতাঙ্গ সমাজের ধন্যবাদের চিঠি। রায়বাহাদুরের স্ফীতকায় নথির উপরে নৈবেদ্যের চূড়ায় সন্দেশটির মতো ভারতসচিবের পত্রখানি। তাঁর পরিচিত অপরিচিত আত্মীয়স্বজন সকলকেই সেগুলো পড়তে হয়েছে। আর সেই স্ফীতোদর নথির তাড়াটি শিবের কাঁধে নিত্য বিরাজিত ঝুলির মতো রায়বাহাদুরের হাতে সর্বদা বিরাজমান। দেখেছেন ভারতসচিব কী লিখেছেন—আর এই দেখুন বিলাতের শ্রেষ্ঠ কাগজ টাইমস কী লেখে, আর এই দেখুন মর্নিং পোস্টের মন্তব্য প্রভৃতি শুনতে শুনতে লোকের কানের পোকা বেরিয়ে গিয়েছে, পারতপক্ষে কেউ আর তাঁর কাছে ধরা দেয় না। এ গেল বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গের ব্যাপারটা একটু অন্য রকম।

অন্তরঙ্গ মহল বড়ো খুশী নয়—বরঞ্চ বলা উচিত অখুশি। উকীল মোক্তার ডাক্তার মাস্টার নিয়ে মফস্বল শহর; সেই সঙ্গে আছে জমিদার, মহাজন, দোকানদার প্রভৃতি; উপরের তলায় সাদা কালো সরকারী কর্মচারী। কালোর দল মনে মনে অখুশি, বাইরে খুশির ভান, সাদার দলের সত্যকার মনোভাব দেবা ন জানন্তি, তবে তারা সবাই ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখে রায়বাহাদুরের নথিটি স্ফীততর হতে সাহায্য করেছে। উকীলবাবুরাই সব চেয়ে অখুশি কারণ তারা সতীর্থ। প্রথমে কানাকানি তার পরে ফিসফিস তার পরে ইঙ্গিত তার পরে মানবভাষায় প্রকাশ।

অল বেঙ্গল লোন অফিস শহরের একটি নামকরা ব্যাঙ্ক। সকালবেলায় দশটা পর্যন্ত, বিকালবেলায় চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত খোলা। শহরের সব ব্যাঙ্কেরই এই রকম কাজের সময়। এই ব্যাঙ্কের দোতলায় উকীলবাবুদের একটি দলের বৈঠক হয়ে থাকে সন্ধ্যাবেলায়। প্রত্যেকে কাছারি থেকে ফিরবার পথে এখানে আসে, দিনের রোজগারের মোটা অংশ জমা করে দেয়—সামান্য দু'চার টাকা নিয়ে বাড়ি যায়, গৃহিণীকে বলে, নাঃ, আর চলে না, রোজগার বলতে নেই, এই নাও যেমন করে পারো চালাও—এই বলে পকেটের তলানি পদ্মহস্তে সমর্পণ করে। বলা বাহুল্য, পাসবুক ব্যাঙ্কের জিম্মাতেই থাকে, কেন না আজকালকার গৃহিণীদের অনেকেই লেখাপড়া জানে। টাকা আছে এই বোধেই তৃপ্তি। শাক ভাত নুন যাই খাও না কেন ব্যাঙ্কে জমার অঙ্ক স্মরণ করলে তা অমৃত সমান।

প্রবীণ উকীল তারাচরণবাবু এই বৈঠকের আড্ডাধারী। লোকটা অস্পষ্ট কর্মা ও স্পষ্ট বক্তা।

সে বলল, দেখো বাপু তোমাদের ঐ স্পিরিট জিনিসটা আমি বুঝি না। এদিকে এত চোটপাট কার্যকালে সব উবে যায়।

খুদু মৈত্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি, বয়সে নয় আকারে, তার মুখগহ্বর কেউ কখনো সন্দেশবিরহিত অবস্থায় দেখেনি—সে বলল, যা বলেছেন, স্পিরিটের ধর্মই ঐ, কলেজে কেমিস্ট্রি পড়বার সময়ে দেখেছি কিনা। বোতলের ছিপি খুললেই অর্ধেক হাওয়া হয়ে যায়।

তবেই বোঝো, ইস্পিরিটের ছিপিটা খুলো না, যা করবে খুব সাবধানে। রায়বাহাদুরের পিছনে আছেন জজ ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশসাহেব স্টোপার সাহেব।

ধীরেন উকীল ঘাড়েমোড়ে প্রকাণ্ড একটি বস্তু, বলল, তার উপরে আবার এসেছে ভারতসচিবের প্রশংসাপত্র।

নিকুচি করি ভারতসচিবের—বলল অশ্বিনী রায়, লোকটা কংগ্রেস ঘেঁষা।

তারাচরণবাবু, নিকুচি করো আর নেই করো মনে মনে করো আর বড় জোর এই ঘরের মধ্যে।

ভবানীগোবিন্দবাবু সদাশিব প্রকৃতির লোক, বলল, আমি কদিন থেকে তোমাদের কথাবার্তা শুনছি. এখনো বুঝতে পারলাম না, কী করতে চাও তোমরা

এই যে রায়বাহাদুর অশাস্ত্রীয় কাণ্ডটি করলেন এর বিহিত হওয়া আবশ্যক—বক্তা অক্ষয় ফৌজদার, পেশা লোন অফিসের ম্যানেজার। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, আদালতের পোশাকের তলে নামাবলীখানি গায়ে দিতে ভোলেন না।

তারাচরণবাবুর আজ বড়ো মনোকষ্ট, আদালতের রোজগার বাহান্ন টাকা জমা দিয়েছে, তিনটে টাকা পকেটে। এত টাকা একসঙ্গে কখনো নিয়ে বাড়ি যায়নি—বলল, আমি শাস্ত্রফাস্ত্র বুঝি না, লোকটাকে জব্দ করতে হবে।

অশ্বিনী রায় পার্শ্ববর্তীর হাত থেকে নস্যির ডিবে নেয়, কখনো সে নিজে নস্য বাবদ খরচ করে না, বলল, আসুন, লোকটাকে একঘরে করা যাক।

আর অমনি তোমাদের ওকালতির সনদগুলো বাতিল হোক।

দেখুন তারাচরণবাবু, হিন্দুধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করতে কুইন্স প্রোক্লেমেশনে নিষেধ আছে।

অশ্বিনীভায়া, কুইন্স প্রোক্লেমেশনের ভরসায় তোমরা কংগ্রেস করো, তবেই হয়েছে।

খুদু মৈত্র এতক্ষণে সন্দেশের তালটা বন্ধ করেছে। এ বারে বলল, কুইন্সের সঙ্গে ওটাও গেছে সহমরণে। ও সবে কিছু হবে না। আপনি বলুন তারাচরণবাবু—আপনি প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

তারাচরণবাবু খুশী হয়ে উঠে বলল, তবে শোনো, কর্তব্য আমি আগেই স্থির করে রেখেছি। এই বলে সে আরম্ভ করলো, রায়বাহাদুর মহারানীর শ্রাদ্ধ করে আমাদের উপরে একহাত নিয়েছেন, জজ ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতার ইংরেজি কাগজে মায় ভারতসচিব সকলেই তার গুণগ্রাহী, কোনদিন বা সি আই ই উপাধি পান, এখন আমাদের কর্তব্য তাঁর উপরে প্রতিশোধ নিয়ে তাঁর যজ্ঞ পণ্ড করা, এই তো!

ফৌজদার বলল, শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্মের উপরে তিনি আঘাত করেছেন, ম্লেচ্ছের শ্রাদ্ধে শাস্ত্র ও মুনিঋষিগণ অপমানিত।

দেখো ফৌজদার, তোমার নামাবলীখানা ছাড়ো তো। মফস্বল আদালতের উকীলের মুখে ধর্মশাস্ত্র মুনিঋষি মানায় না। আমাদের চেষ্টায় প্রত্যহ ধর্মশাস্ত্র সত্য গলায় দড়ি দিয়ে বটগাছে ঝুলছে—আবার ধর্মশাস্ত্র! যে লোকটার ফাঁসি হওয়া উচিত তাকে সত্যবাদী ধর্মপুত্র বলে সওয়াল করছি। রামের জমি শ্যামকে পাইয়ে দিচ্ছি আবার ধর্মধর্ম করা কেন?

আহা, সেটা হল ব্যবসা।

তবে সেই কথাই হোক। রায়বাহাদুরকে অপদস্থ করাও ব্যবসার অঙ্গ।

কিন্তু রায়বাহাদুরের উপরে শোধ নিতে গেলে সাহেবগুলোর কোপে পড়তে হবে যে।

যাতে সেটা না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

খুদু মৈত্র বলল, সে তো বুঝলাম, কিন্তু উপায় কী?

উপায় অবশ্যই আছে। খবর রাখো কি যে তাজপুরের রাজকন্যার সঙ্গে শচীনের বিবাহ প্রস্তাব এসেছে?

বীরেন উকীলের বস্তুপিণ্ড একটু নড়েচড়ে উঠে বলল, তাজপুরের রাজবাড়ির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবো না, তারা আমার দু'পুরুষের মক্কেল।

তবে এর মধ্যে এলে কেন, বাড়িতে গিয়ে বিছানায় গড়াও গিয়ে।

ফৌজদার বলল, ধর্মসঙ্গত, কেননা, হিন্দুধর্মবিদ্বেষীর ঘরে কন্যাদানের বিরোধিতা শাস্ত্রসম্মত।

ভবানীগোবিন্দ বলল, ফৌজদারের আমাদের ধর্মবুদ্ধি বেশ স্থিতিস্থাপক।

হতেই হবে, শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু দায়ী মোৎদায়ী রাজি কী করবে কাজী।

তারাচরণবাবু পকেটে হাত দিয়ে দেখলো মাত্র তিনটি টাকা বর্তমান, তাও রাখবার উপায় নেই, ঘরে ফিরেই গৃহিণীর হাতে সমর্পণ করতে হবে। গার্হস্থ্যবিধির এই অবিচারে লোকটা চরাচরের উপরে রুষ্ট হয়ে গিয়েছিল—বলল, দায়ী রাজি হতে পারে মোৎদায়ী রাজি নয়।

কেমন, কেমন—অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল।

শচীন শ্রাদ্ধের দিনেই গৃহত্যাগ করেছে।

তাই নাকি?

কিছুই জানো না দেখছি?

কেন, কেন? আবার অনেকে বলে উঠল।

ওটা শ্মশান-বৈরাগ্য, তাজপুরের নাম শুনেই এসে জুটবে।

সেটি হবে না, সে অবিনাশমাস্টারের ছাত্র।

খুদু মৈত্র বলল, তবে অবিনাশবাবুকেও আমাদের সঙ্গে নেওয়া দরকার।

সে চেষ্টা কোরো না, সে উকীল নয়, মাস্টার, যা বলে তা বিশ্বাস করে।

আর আমাদের!

আমাদের বিশ্বাস মক্কেলের ফিজের উপরে নির্ভর করে।

এখন কর্তব্য?

এখন কর্তব্য, কথাটা তাজপুরের রাজবাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে, অবশ্য দু'চার পোঁচ রঙ চড়াতে হবে।

তারাচরণবাবু, এরকম অন্যায়ের মধ্যে আমি নেই।

তবে এলেন কেন?

তোমরা সবাই যে জন্য এসেছ। বাড়তি টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে।

ফৌজদার আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, আমি রাজি আছি, তবে হিন্দুধর্মের মুখ চেয়ে।

এ খুব স্বাভাবিক, ধর্মের নামে যত অধর্ম হয়েছে এমন আর কী সে?

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

তারাচরণবাবু বলল, বেড়াল ধরেছে যে। আমার সঙ্গে দেওয়ানজির অনেকদিনের বন্ধুত্ব, আমার উপরে ভার ছেড়ে দিন।

সকলেরই ভাবটা একটা ঘোঁট পাকিয়ে উঠে রায়বাহাদুর শায়েস্তা হয় তবে প্রত্যক্ষভাবে নিজে জড়িয়ে না পড়লেই হয়।

তবে সেই কথাই রইলো তারাচরণবাবু, একটা ব্যবস্থা করুন---আমরা সকলে পিছনে আছি—এটি ফৌজদারের উক্তি।

ভবানীগোবিন্দ নির্বিবাদী লোক, সে বলল, আমি এর মধ্যে নেই, তবে এ কথাও বলছি আমি কোন কথা প্রকাশ করব না।

তাহলেই যথেষ্ট। এসব কথা যেন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়। এখন কর্তব্য মন্ত্রগুপ্তি।

তা আর বলতে, বিশেষ হিন্দুশাস্ত্রের রক্ষার জন্য যখন এই উদ্যম।

রাত হওয়ায় সকলেই উঠে পড়লো। তারাচরণ আরও একটি টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখলো; একসঙ্গে তিন-তিনটে টাকা গৃহিণীর হাতে তুলে দেওয়া কিছু নয়।

ফৌজদার লাঠি ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল, লোকটার একখানা পা বিকল। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে রায়বাহাদুরের বাড়ির দিকে চলল—বোধ করি হিন্দুধর্মের মুখ চেয়েই। এসব কথা শুনলে রায়বাহাদুর কী খুশিই না হবেন তার উপরে।

ছয়

শচীন যখন ওভারটুন হলের বাইরে এসে দাঁড়ালো তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে—এটাই তার কাম্য ছিল কেউ যাতে তাকে না চিনতে পারে। কলকাতায় তার চেনা লোকের অভাব নেই, কলেজের চেনা লোক, জেলার চেনা লোক আর কত কী? দুটো কমলালেবু কিনে নিয়ে খেতে খেতে হ্যারিসন রোড ধরে পশ্চিম দিকে চলল—এদিকটায় চেনা লোক পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

সকালবেলাতেই সভার বিজ্ঞাপন দেখে বুঝেছিল লোকসমাগম কম হবে না, বক্তা সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শশধর তর্কচূড়ামণি। তিনজনেই বাগ্মী। বলা বাহুল্য সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে সবার উপরে, তিনি বক্তৃতা করবেন জানলে লোক ঠেলে উপস্থিত হয়।

সুরেন্দ্রবাবু বললেন, এই রায়বাহাদুরের দলকে দেশ থেকে তাড়াতে না পারলে দেশের উন্নতি নেই। তার পরে তিনি যে সংবাদ দিলেন সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দু-এক বছরের মধ্যে অখণ্ড বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হবে, এক রকম সব স্থির হয়ে গিয়েছে; এই সব রায়সাহেব রায়বাহাদুর এই দুষ্কর্মের সহায়, তাদের আপনারা একঘরে করুন। অমনি শেম্ শেম্ ধ্বনি উঠলো, সঙ্গে চটপটাপট করতালি।

কাব্যবিশারদ বিদূষক প্রকৃতির লোক। সে বলল, আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানি লোকটা মাতৃশ্রাদ্ধ করে না আর ঢালাও খরচ করে মহারানীর মাতৃশ্রাদ্ধ। বোধ হয় সি আই ই তার লক্ষ্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি দিনাজশাহী শহরে কি ঘোল ছিল না, যার মাথায় ঘোল ঢেলে দেওয়া উচিত ছিল তার বাড়িতে শহরের নিমন্ত্রিতগণ গাণ্ডেপিণ্ডে ভূরিভোজন করে এল। সাহেবগুলোর কথা ধরি না, বেটারা নিজ দেশে খেতে পায় না বলে এদেশে এসেছে, সুযোগ

পেলেই খায়। আমরা আরও বিশ্বস্তসূত্রে জানি রায়বাহাদুর তার ছেলেকে ডেপুটি বানাবার মতলবেই এই কাণ্ডটি করেছে। শেম্ শেম্ ধ্বনি।

শচীন মাথা নিচু করে বসে রইলো পাছে কোনো চেনা লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়।

তার পরে উঠলেন শশধর তর্কচূড়ামণি। মুণ্ডিত মস্তকে সুদীর্ঘ শিখাটি পাখার হাওয়ায় ফরফর করে উড়তে লাগলো। তিনি ধর্মের ধুয়া তুললেন। হঠাৎ গর্জন করে বলে উঠলেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

একে ধর্ম, তায় গীতা, তায় গর্জন, গায়ের নামাবলী খসে পড়লো, কাছা খুলে গেল, কাঠের পাটাতনের উপরে তিনি এমন দাপাদাপি শুরু করলেন যে সে এক কাণ্ড। কয়েকটি শিশু প্রবীণদের সঙ্গে এসেছিল, তারা ভয়ে কেঁদে উঠল।

সুরেন্দ্রবাবু ফিস ফিস করে বললেন, তর্কচূড়ামণি মশাই এবার থামুন, সভা ভেঙে যাবে।

কখনোই থামবো না, দক্ষযজ্ঞ নাশ না করে থামে কোন্ শালা।

কাব্যবিশারদ বলল, ক'জন এখানে আছে?

সবাই শালা।

সভাস্থ লোক বলে উঠল, মুখ সামলে।

কেন মহারানীর শ্রাদ্ধের ভোজ খাওয়ার সময়ে তো মুখ সামলে খাননি।

· হট্টগোল হয়ে সভা ভেঙে গেল, বাঙালীর সভা স্বাভাবিক নিয়মে ভাঙে না, হয় বজ্রপাত নয় পুলিশের উৎপাত নয় অমনি আর কিছু। সভা জনশূন্য হয়ে গেল তবু তর্কচূড়ামণি কাঠের পাটাতনের উপরে দাপাদাপি করছেন।

কাব্যবিশারদ বলল, আর কেন, চলুন।

যত সব, শালা শাস্ত্রবাক্য কেউ শুনতে চায় না।

শচীন ভয়ে ভয়ে মেসে ঢুকলো। না, তখনো কেউ ফেরেনি। তারপর চোরের মতো ঢুকলো নিজের ঘরে। ঘর খোলা ছিল, খোলাই থাকতো, চাবি থাকতো গোপালের কাছে। অন্ধকারে কে একজন লোক।

কে?

শচীন, আমি।

মাস্টারমশাই! তা আলো জ্বালেননি কেন?

বাবা, কলকাতার সব জায়গাতেই আলো, অন্ধকারেরই অভাব, বেশ লাগছিল।

গোপাল চা দিয়েছিল?

দেবে না! শচীনবাবুর মাস্টারমশায়ের খাতির কত। তার বিশ্বাস আমার জন্যেই তুমি প্রথম হয়েছ।

কথাটা কি মিথ্যা?

প্রত্যক্ষত সত্য নয়।

সে কথা যাক। আপনি বলেছিলেন দু-চার দিনের মধ্যে আসবেন, এ যে দু-চার মাস হতে চলল।

চার নয়, তবে দু'মাস হয়েছে বটে। একটা ইস্কুলের হেডমাস্টারের পক্ষে ইচ্ছা করলেই আসা সম্ভব হয় না।

ওখানকার খবর কী?

কেন তুমি কি চিঠিপত্র পাও না?

কে দেবে চিঠিপত্র। বাবা শৈলেনদাদাকে পাঠিয়েছিলেন, আমি যাইনি, তার পর থেকে সব বন্ধ। মার চিঠি লেখা বড় আসে না আর সুশীলটা সারাদিন কী করে বেড়ায় জানি না, কাজেই সব অন্ধকার।

অবিনাশবাবু সংক্ষেপে বললেন, সমস্ত ভালো। বিস্তারিত বলতে হলে অনেক বলতে হয়। সে-সব কথা অবিনাশবাবু শচীনকে বলতে চান না।

লোন অফিসের সেই আড্ডার পরে তারাচরণবাবু দেওয়ানজিকে কি বলেছিলেন তিনিই জানেন। দেওয়ানজি প্রায়ই বিষয়কর্ম উপলক্ষে মাঝে মাঝে সদরে আসতেন। তারাচরণ-বাবুর মন্ত্রণার ফল দেখা দিতে বিলম্ব হল না। ভূরিভোজনে রত শ্বেতাঙ্গ সমাজের একখানা ছবি রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন রায়বাহাদুর, সেখানা ফিরে এলো। তার পরে পাঠালেন বড় এক হাঁড়ি রাঘবশাহী সন্দেশ, হাঁড়ি ফিরে এলো। শুধু তাই নয়, তার পিঠ পিঠ এসে পৌঁছল শচীন ও সুশীলের যে ছবিখানা দেওয়ানজি এত আগ্রহভরে নিয়ে গিয়েছিল। রায়বাহাদুর বুঝলেন এ দান ফস্কে গেল। তখন তাঁর মনে পড়লো অক্ষয় ফৌজদারের মন্ত্রভেদ। তিনি ভাবলেন, রোসো, বেটাদের শিক্ষা দিতে হচ্ছে। তিনি একদিন সেজেগুজে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, হুজুর, মহারানীর শ্রাদ্ধ করেছিলাম বলে শহরের একদল লোক আমার উপরে নির্যাতন শুরু করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, অন্য দল তো আপনার সঙ্গে আছে।

অবশ্যই আছে। তবে কিনা যারা নির্যাতন করছে তারাই শহরের মাথা।

এ তো বড় অন্যায়। আচ্ছা আমি দেখছি। রায়বাহাদুর নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলেন।

এখন ইংরেজ জাতটার মস্ত গুণ (দোষ?) এই যে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে তাদের জুড়ি নেই। নইলে তারা ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের অধিবাসী হয়ে দু'শো বছর ধরে পৃথিবীর মাথার উপরে ছড়ি ঘোরাতে সমর্থ হতো না।

সাহেব প্রথমে দেখেছিল মহারানীর শ্রাদ্ধে শহরের লোকের সমর্থন আছে। তার পরে দেখলো কলকাতার দেশী কাগজগুলো ক্ষেপে উঠেছে, এখন আবার শহরের লোকও ক্ষেপলো। অবশ্য ভারতসচিব প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছেন, কিন্তু হলে কী হয় তারাই তো men on the spot! ইংরাজের man on the spot-এর উপরে অটুট বিশ্বাস। কাজেই সাহেব স্থির করলো রায়বাহাদুরকে খুশী করতে গিয়ে শহরের মাথাগুলোকে চটানো উচিত হবে না। রায়বাহাদুর আরও দু-চার বার হাঁটাহাঁটি করে সাহেবের মনোভাব বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হল।

সেদিনের লোন অফিসের আড্ডায় তারাচরণবাবুর মুখে হাসি ধরে না। প্রথম কারণ আজ সারাদিনের রোজগার ব্যাঙ্কের অঙ্গীভূত হয়ে পকেটে মাত্র শোয়া বারো আনা পয়সা অবশিষ্ট ছিল, সেটাও আবার এক মক্কেলের স্ট্যাম্প পেপার কেনা বাবদ, কালকে আবার নূতন করে আদায় করলেই হবে। আজ এই কটা পয়সা গৃহিণীর হাতে তুলে দিলেই হবে। বাজার খারাপ, মক্কেল বলতে নেই, বটতলা খাঁ খাঁ করছে' দ্বিতীয় কারণ তাঁর পরামর্শে সুফল পাওয়া গিয়েছে, তাজপুরের রাজবাড়ির সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে। হাঁ হাঁ বাবা, এমনি বলাই বলেছিলাম।

সবই মিথ্যা বুঝি।

মিথ্যাও নয় সত্যও নয়—সত্য-মিথ্যায় গোঁজামিল দিয়ে বলতে হয়—এখানে ধরলে সত্য, ওখানে ধরলে মিথ্যা, নাও এখন কোথায় ধরবে।

এমন সময়ে অক্ষয় ফৌজদার খোঁড়া পায়ের পরিপূরক স্বরূপ লাঠি ঠক ঠক করে প্রবেশ করতেই সকলে মুখ বন্ধ করলো।

এখন শচীনের কথার জবাব দিতে গেলে এত কথা বলতে হয়—সমস্তই পিতৃনিন্দা। অবিনাশবাবু জানতেন শচীনের বাপের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির অভাব ছিল না, কেবল শ্বেতাঙ্গ তোষণ সহ্য করতে পারতো না, যার চরম রূপ মহারানীর শ্রাদ্ধ।

এখন বলো কলকাতার খবর কী?

সে তো কাগজেই দেখতে পাচ্ছেন, মুখে বলে আর লাভ কী। মেসে থাকি চোরের মতো।

মেস বদলালেই পারো।

সর্বত্রই এক অবস্থা, এটা তবু পুরানো আড্ডা, ছেলেরা মুখে কিছু বলে না।

কিছুদিন চুপ করে থাকলেই সমস্ত মিটে যাবে।

তা বটে, স্যার, 'আজিকার সুখদুঃখ কার মনে রবে!'

দেখো তো কেমন মনের কথা বলেছেন রবিবাবু। আচ্ছা শচীন তাঁকে কখনো দেখেছ?

বাপ রে, শুনেছি তিনি বেজায় বড়লোক আর অহঙ্কারটাও সেই মাপের।

দূর থেকে কত রকম কথাই শোনা যায়। কালকে নিয়ে যাবো তোমাকে সতীশ মুখুজ্জের ডন সোসাইটিতে।

সেখানে রবি ঠাকুর আসেন নাকি?

কখনো কখনো।

শচীনের ডাকে গোপাল এসে দাঁড়ালে শচীন বলল, গোপাল, মাস্টারমশাইয়ের কিন্তু মাছ-মাংস চলে না।

সে একগাল হেসে বলল, উনি কি নূতন এলেন, গোপাল কিছু ভোলে না, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না দাদাবাবু।

সাত

পান্তির মাঠের উত্তরদিকে ছোট একটি দোতলা বাড়িতে 'ডন' (Dawn) পত্রিকার অফিস। নীচের তলায় লাইব্রেরি ও অফিস, উপরতলায় প্রশস্ত একটি কক্ষে মেঝেতে ফরাশ বিছানো, সন্ধ্যাবেলায় সভা-সমিতি বসে থাকে। আজ বৃহস্পতিবার সভা বসবার দিন।

শচীনকে নিয়ে অবিনাশবাবু যখন পৌঁছলেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সভার কাজ আরম্ভ হয়েছে। একদিকে স্বতন্ত্রভাবে সতীশ মুখুজ্জে আসীন, অন্য সভ্য সকলেই তরুণ কলেজের ছাত্র।

আসুন আসুন অবিনাশবাবু, এ বারে অনেকদিন পরে, বক্তা সতীশ মুখুজ্জে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ছুটিছাটা মেলে না, বুঝতেই পারছেন ইস্কুলের ব্যাপার। আপনাদের আলোচনা চলুক, আমরা এ দিকে বসছি।

কি বলছিলে বিনয় বলো?

দেখুন আমাদের সমাজ যদি জীবিত থাকতো এমনটি কখনো ঘটতে পারতো না।

রাধাকুমুদ, তোমার কী মত?

কাজটাকে আমরা কেউ সমর্থন করি না, তবে বিনয়বাবুর মতকেও সমর্থন করতে পারছি না।

কেন, রাধাকুমুদবাবু?

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ কখন জীবিত ছিল? চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে সমাজ নিশ্চয় জীবিত ছিল বলে মানবেন। তখন কি তিনি গ্রীক কন্যার পাণিগ্রহণ করেননি? আপনি হয়তো বলে বসবেন ওটাও মৃত সমাজের লক্ষণ।

না, তা আমি বলি নে।

তবে এই ব্যাপারটাকেই বা মৃত সমাজের লক্ষণ মনে করছেন কেন?

এ যে রাজতোষণ।

সেটাও কি তাই ছিল না? গ্রীক ক্ষত্রপকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়েই চন্দ্রগুপ্ত তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

কী বলো প্রফুল্ল?

আজ্ঞে আমি যতদূর বুঝি আমাদের সমাজ অত্যন্ত জীবিত। এই যে জাতিভেদ প্রথাকে গাল না দিয়ে বিদেশীরা জলগ্রহণ করে না সেটা কি সত্যই এত দূষণীয়? ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মধ্যে কিছু কিছু আর নিম্নবর্ণের মধ্যে ততোধিক অসবর্ণ বিবাহ নিরন্তর চলছে না কী? প্রথমে কয়েকদিন নিন্দা হয় তারপরে সকলে সহ্য করে নেয়—এই সহিষ্ণুতাই তো জীবনের লক্ষণ।

তুমি কি বলো রবি?

তরুণ রবি অত্যন্ত লাজুক, এদিকে মেধার অন্ত নাই, তবে সভাস্থলে কথা বলে না। আজ কি ভাগ্য একটি বাক্য ব্যবহার করলো—আমার মনে হয় প্রফুল্লবাবুর কথাটা ঠিক।

সতীশবাবু হেসে উঠে বললেন, বিনয়, আজ তোমার অদৃষ্ট মন্দ, রবি অবধি তোমার প্রতিবাদ করলো, যে রবির মুখে কথা ফুটতে চায় না।

রাধাকুমুদ হাসতে হাসতে বললো, রবির কথা ফুটবে কী করে? আর এক রবি যে সমস্ত কথা কেড়ে নিয়েছে।

কেবল আমার নয়, তোমাব আমার সকলেরই।

সতীশবাবু আবার হেসে উঠে বললেন, আজ রবির হল কি, সভাস্থলে একদিনে দুটি বাক্য।

এমন সময়ে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পেলো, নীচে থেকে কে একজন এসে জানিয়ে গেল রবি ঠাকুর আসছেন।

অবিনাশবাবু শচীনের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, তোমার ভাগ্য ভালো।

রবি ঠাকুরের প্রবেশ।

উপস্থিত সকলের কাছেই রবি ঠাকুর পরিচিত, শচীন কেবল ছবিতে মাত্র দেখেছে তাঁকে। তাঁকে দেখে প্রথম নজরেই তার মনে হল ছবিতে মানুষে কত প্রভেদ। এমন বলশালী দেহে এমন লাবণ্য। সোনার চশমার রঙে মুখের রঙে এমন মিল, আর শান্ত অচঞ্চল চোখ দুটিতে শরৎকালের স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। ওষ্ঠাধর প্রসন্ন অনেক হাসির স্মৃতিতে মণ্ডিত। পরনে কুঞ্চিত ঢাকাই ধুতি, গায়ে গরদের ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি, তার উপরে গরদের চাদর, হাতে মোটা মাথা বাঁকানো মোটা মনক্কা বেতের লাঠি। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলো।

বসুন বসুন বলে তিনি একান্তে বসে পড়লেন।

তারপরে আজ কী আলোচনা হচ্ছিল সতীশবাবু?

বাংলা দেশে আজ আলোচনার বিষয় তো একটাই, সেই মহারানীর শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধটা তা হলে সারা দেশময় গড়াচ্ছে, এ না হলে আর বাংলাদেশ।

তারপরে গম্ভীর ভাবে বললেন, দেখুন সতীশবাবু, সমস্ত দেশটাই চণ্ডীমণ্ডপে পরিণত হতে চলল, ছোট কথা, দলাদলি, ঘোঁট পাকানো—এ ছাড়া আর কথা নেই। তার ঢিলে হয়ে গিয়ে দেশময় বেসুর বাজতে শুরু করেছে।

সকলেই নীরব।

একজন রায়বাহাদুর মহারানীর শ্রাদ্ধ করেছেন, তিনি তো যথার্থ শ্রদ্ধাবশেও করে থাকতে পারেন, অনেকেরই খুব সম্ভব ইচ্ছা ছিল তবে হয়তো সাহসে কুলোয়নি। তা ছাড়া সতীশবাবু, আমাদের শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান তর্পণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতরকার ভাবটি অত্যন্ত উদার। কেবল জ্ঞাতির উদ্দেশে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা নয়—জ্ঞাত অজ্ঞাত পরিচিত অপরিচিত যেখানে যে কেউ মৃত সকলের উদ্দেশেই পিণ্ডদান তর্পণ করবার বিধি আছে। এমনটি আর কোন দেশে আছে বলে জানি নে।

বিনয় কিছু মুখর। সে বলে উঠল, রায়বাহাদুর লোকটা অত্যন্ত খোশামুদে, ওর শ্রাদ্ধ একটা ভড়ং, আরও কিছু বাগানো মতলব।

এ সমস্ত তোমার অনুমান নয় কি। দেখো আমার অনেক বয়স হল, দেখেছি যে এ দেশে কারো কোন খুঁত পেলে লোকে আর ছাড়তে চায় না। বুড়োরাই এই কার্যে পুরোধা, এখন তোমরা তরুণরাও যদি সেই যূপকাষ্ঠের বলিতে পরিণত হও তবে তো দেশের আশাভরসা দেখি না, অথচ সামনে দারুণ দুঃসময়।

ইঙ্গিতটা আর কেউ না বুঝুক সতীশবাবু বুঝতে পারলেন, বললেন, কথাটা মিথ্যা নয়, কবিরা ইতিমধ্যেই কুর্জন শব্দের সঙ্গে দুর্জন শব্দের মিল দিতে শুরু করেছে।

দুর্জন নয় মশায়, একেবারে দুশোজন। লোকটা একটা কিছু বিপর্যয় না করে ছাড়বে না।

তার পরে আবেগের সঙ্গে বললেন, করুক করুক, আঘাতে আমাদের প্রয়োজন আছে। ক্যানিং, রিপনের চেয়ে ডালহৌসি কার্জনে আমাদের বেশি দরকার, এরা আমাদের শত্রুবেশী মিত্র।

অবিনাশবাবুকে চোখে পড়তেই বলে উঠলেন, এই যে অবিনাশবাবু, নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখবার অভ্যাস আপনার এখনো গেল না (অবিনাশবাবু একটু আড়ালে বসেছিলেন)। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে পাকড়াও করে বোলপুরে টেনে নিয়ে যাই, তা আপনি কিছুতেই ধরা দিলেন না।

যোগ্যতর লোকের আপনার অভাব হবে না।

বুঝেছি আপনি অযোগ্যদের নিয়ে থাকতে চান।

নিজেও যে অযোগ্য।

এই কথাটি যে বোঝে তাকে কি আর অযোগ্য বলা সম্ভব?

তারপরে শচীনকে দেখিয়ে শুধালেন, এটি কে, চেলা নাকি?

এ সেই রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

এতক্ষণ তারই সম্মুখে পিতৃনিন্দা হচ্ছিল বুঝে সভ্যগণ নিজেদের লজ্জিত বোধ করলো।

রবি ঠাকুর সস্নেহে বললেন, দুঃখ করো না বাবা, এ বাংলাদেশ, এখানে যখন জন্মেছ অনেক দুঃখ সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বলে নিজেকে প্রস্তুত করে তোলো। আজ উঠি।

সকলে রবিবাবুকে অনুসরণ করে নীচের তলায় গেলে সেই অবসরে শচীন দ্রুতপদে কলঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। দুর্জয় প্রতিরোধ শক্তি সত্ত্বেও চোখের জল আর বাঁধন মানছিল না। গৃহ পরিত্যাগের পরে পিতৃনিন্দা ছাড়া আর কিছু তার কানে প্রবেশ করেনি— এই প্রথম ব্যতিক্রম। রবিবাবুর ব্যাখ্যায় শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি এমন এক উচ্চ স্তরে উন্নীত হল, সে-সব আর পৃথিবীর কুয়াশা না হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হল, মেঘের মতোই শান্তিবারি সিঞ্চন করলো তার হৃদয়ে। তার ইচ্ছা করছিল রবিবাবুর পায়ের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে প্রাণভরে একবার কাঁদে।

মেসের কাছে এসে শচীনের মনটা খারাপ হয়ে গেল, মনে পড়লো আজ সকালেই মেসের মেম্বরগণের স্বাক্ষরিত এক পত্র পেয়েছে শচীনের মতো দেশদ্রোহীর পুত্রের এখানে থাকা চলবে না, কালকে রাতে তারা সভা করে সিদ্ধান্ত করেছে। বিষয়টা অবিনাশবাবুকে বলেনি, ভেবেছিল সুযোগমতো বলবে। কিন্তু ডন সোসাইটির সভা, বিশেষ রবি ঠাকুরের বক্তৃতায় সমস্ত ভুলিয়ে দিয়েছিল, এখন মেসের কাছে এসে সমস্ত মনে পড়ে মনটা তিক্ত হয়ে গেল। অবশ্য পত্রবাহককে মুখে জানিয়ে দিয়েছিল শীঘ্রই অন্যত্র উঠে যাবে। মেসে প্রবেশের আগে অবিনাশবাবুকে সব কথা বলল। তিনি বললেন, বেশ তো অন্যত্র উঠে গেলেই চলবে। আমার জানা ভদ্র মেস একাধিক আছে। সহজ ভাবে সমস্যাকে গ্রহণ করায় শচীনের মনটা হাল্কা হয়ে গেল।

মেসে ঢুকতেই গোপালকে দেখতে পেয়ে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন, কী গোপাল, সব যে চুপচাপ আর ঘরগুলোও অন্ধকার, বাবুরা সব গেল কোথায়?

গোপাল মৃদুহাস্যে বলল, বাবুরা সব চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে, হঠাৎ গেল কেন আর গেলই বা কোথায়?

কোথায় গেল কে খোঁজ রাখে, তবে কেন গেল জানি।

তা-ই না হয় বলো।

আজ সকালবেলায় বাবুরা সবাই দাদাবাবুকে মেস ছাড়বার লুটিশ দিয়েছিল, তাই না জানতে পেয়ে আমিও তাদের লুটিশ দিলাম—যাঁর এখানে পোষাবে না তিনি অন্যত্র যান।

শচীন অবাক হয়ে গিয়েছিল, অবিনাশবাবুই কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। বললেন, তোমার লুটিশ পেয়েই অমনি তারা চলে গেল!

অমনি কী কেউ যায় বাবু গোপালের মেস ছেড়ে যেখানে তিন-চার-মাস টাকা বাকি রাখলেও কেউ তাগিদ করে না!

তবে?

তবে আর কি, ঐ যে হ্যারাসবাবু···

দাঁড়াও দাঁড়াও আগে শুনে নি, হ্যারাসবাবু আবার কে?

ঐ যে মোটা হানো বাবুটি সকালবেলাতে উঠেই পুঁথি খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করেন—হ্যারাস, হ্যারাস···

শচীন বলল, ও বুঝেছি, where as...

তা হবে, আমি তো হ্যারাস ছাড়া আর কিছু বুঝি না। বুঝলেন না মাস্টারবাবু, ঐ বাবু আজ সাত বচ্ছর ওকালতি পড়ছে, পড়া আর শেষ হয় না, এতদিনে একটা লোক জজ হয়ে যায়—আর তার হ্যারাস হ্যারাস আর শেষ হয় না। তা সেই বাবুটি তেড়ে আমার মুখের উপরে বলল তোমার রাইট নেই আমাদের মেস ছেড়ে যেতে বলতে।

আমি বললাম, আপনাদেরই বা কোন্ রাইট আছে শচীনবাবুকে মেস ছেড়ে যাওয়ার লুটিশ দিতে, মেস তো আমার। তা হ্যারাসবাবু কি বলল জানেন?

কী বলল?

বলল শচীনবাবুর বাবা মহারানীর শ্রাদ্ধ করেছিল।

আমি বললাম, আর আপনি যে আজ সাত বচ্ছর ধরে হ্যারাস হ্যারাস করে টাকাগুলোর ছেরাদ্দ করছেন তার কি হয়!

কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! টাকা দিই, যত দিন খুশি থাকবো।

আমি একটু হেসে বললাম, আজ্ঞে তাই বা দেন কোথায়? আপনার সাত মাস বাকি, আর আপনার দলের কারোরই তিন-চার মাসের কম নয়।

তখন ঐ যে বাবুটি যিনি অম্বলের ওষুধের ব্যবসা করেন, সারাদিন ধরে বড়ি পাকান, তিনি বললেন, কি এতবড় কথা, দাও তো হে যতীন, লোকটাকে একটা শক্ত ধারায় ফেলে, আসুক ঘুরে শ্রীঘর।

তাই না শুনে যতীনবাবু, মোটা একখানা পুঁথি খুলে হ্যারাস, হ্যারাস করতে লাগলো।

তখন?

তার আগে শুনুন বাবু, এমন যে হবে আমি জানতাম। তাই পথের মোড়ে যে পুলিশটা দাঁড়ায় তাকে আগেই দুটো টাকা খাইয়ে রেখেছিলাম, বলেছিলাম ভাই, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, একবার শুধু মেসের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে খৈনি টিপতে শুরু কোরো, তাতেই আমার কাজ হবে। হলও তাই। লাল পাগড়ি দেখবামাত্র বাবুরা সুড়সুড় স'রে পড়লো, সকলের আগে হ্যারাসবাবু।

হ্যারাসবাবু বললেন, ভেবো না আমি পালাচ্ছি, আমি যাচ্ছি টুন্নি আনতে।

অবিনাশবাবু বললেন, কিছু ভেবো না, সবাই ফিরে আসবে, জিনিসপত্র রেখে গিয়েছে।

কেউ আর ফিরবে না বাবু, যা ওদের মেসের বাকি সে দামে ওদের জিনিসপত্র তিনবার কেনা যায়।

তবে তোমার এতগুলো টাকা মারা গেল।

এ কথা শুনে অবিনাশবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, মাস্টারবাবু, দুষ্টু গোরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো। লোকগুলোর আস্পর্দা দেখুন, শচীনদাদাবাবুকে দেয় মেস ছাড়বার লুটিশ! দাদাবাবু আমাব মেসের নক্ষ্মী। আর দাদাবাবুর অপরাধ কী? না তাঁর বাবা মহারানীর শ্রাদ্ধ করেছেন। বেশ করেছেন। তোদের টাকার জোর থাকে তোরাও ফের কর না। আসল কথা কী জানেন মাস্টারবাবু?

কী কথা বলো তো?

শচীনবাবু থাকাতে ওঁদের অসুবিধা হচ্ছিল।

অসুবিধা কিসের?

দাদাবাবু থাকাতে এখানে মদটা গাঁজাটা চলতো না, তলে তলে অনেকদিন থেকে ওঁকে তাড়াবার মতলব আঁটছিল। এই বারে সুযোগ মিলেছে। তবে কি জানেন ওদের গোড়ায় ভুল হয়ে গিয়েছে, গোপালকে ওরা চিনতে পারেনি। বসুন, চা নিয়ে আসি।

কিন্তু গোপাল, এতগুলো ভদ্রলোক রাতের বেলায় কোথায় থাকবে ভেবে দেখলে না।

ওদের রাতে থাকবার জায়গা সব স্থির আছে, তবে সে কথা আপনার সমুখে আর বলতে চাই নে।

কিন্তু তোমার এতগুলো টাকা তো মারা গেল।

মাস্টারবাবু, আপনার বাপ মায়ের আশীর্বাদে দেশে গোপালের পঞ্চাশ বিঘা জমি আছে। ছেলেদের বলেছি তোরা তা-ই নিয়ে থাক, আমি কলকাতায় মেস চালাই, দূরে দূরে থাকলে বাপ বেটায় ঝগড়া বিবাদ বাধবে না। তাই আপনাদের মতো লোকের শ্রীচরণ আঁকড়ে পড়ে আছি। আমি কি টাকার জন্যে মেস চালাই! পাঁচটা ভদ্রলোকের মুখ দেখতে পাবো, ভদ্রলোকের কথা শুনতে পাবো ভরসায় গোপালের মেসের ব্যবসা। যাই আমি চা নিয়ে আসি।

সে রাতে শচীনের ঘুম আসতে দেরি হয়। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, বিচিত্র সংসার। আজ বিকালবেলায় একজন মনীষীর কাছে পেলো সান্ত্বনা, আর রাতের বেলায় এক অশিক্ষিতের কাছে পেলো সহানুভূতি। সংসার ভূমণ্ডলের দুই মেরুতে একই আবহাওয়া। রবি ঠাকুরের ঐ কথাটা তার মনে গেঁথে বসে গিয়েছে, বাবা বাংলাদেশে যখন জন্মেছ

অনেক দুঃখ পাওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবু তো এ দেশে রবি ঠাকুরের মতো লোক আছে, আবার গোপালের মতোও।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন জাগলো দেখলো অবিনাশবাবু অনেকক্ষণ উঠেছেন, তার নিদ্রাভঙ্গের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

অপ্রস্তুত হয়ে শচীন বলল, উঠতে দেরি হয়ে গেল। আপনাকে চা দিয়েছে তো?

সে সব হয়ে গিয়েছে।

হাতে ওখানা কী, টেলিগ্রাম নাকি?

হ্যাঁ, ভোরে উঠেই পেলাম। সহকারী প্রধান শিক্ষক রমেশবাবু পাঠিয়েছেন।

ব্যাপার কী?

স্কুলে নাকি কি গণ্ডগোল হয়েছে। আমাকে চলে আসতে লিখেছে, দশটার ট্রেনেই রওনা হব ভাবছি।

হঠাৎ এমন কী ঘটতে পারে?

এখন অনেক কিছুই ঘটবার সম্ভাবনা। রবি ঠাকুরের কথা মনে নেই! বাংলাদেশে যখন জন্ম হয়েছে দুঃখ পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই শচীন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরবেলা উঠেই যে তার নূতন দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে ভাবেনি।

দশটার গাড়িতে অবিনাশবাবুকে তুলে দিয়ে শচীন বলল স্কুলে কী ঘটেছে যেন জানতে পায়।

অবিনাশবাবু বললেন, অবশ্যই জানতে পাবে, চিঠিতে না হোক খবরের কাগজে তো বটেই, যদি সত্যি তেমন গুরুতর কিছু হয়ে থাকে।

আট

অবিনাশবাবু শহরে ফিরে দেখলেন লোকেশ্বর হাইস্কুল নিয়ে একটা সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা সামান্য আর অবিশ্বাস্য, কিন্তু হলে কী হয় পিছনে একজন সদাগরী সাহেব আছে। শহরের পাইকারি কেরোসিন ডিপোর ম্যানেজার মিঃ ক্যালেন নামে এক সদাগরী সাহেব। সদাগরী সাহেবদের প্রতাপ ইংরেজ জজ ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে কম নয়, এক হিসাবে বেশি। তাদের দায়িত্ব নেই—অথচ সাদা চামড়ার সুপারিশে প্রতাপ প্রবল। জজ ম্যাজিস্ট্রেটকে তবু খানিকটা আইনের গণ্ডী মেনে চলতে হয়, তাদের সদাগরী বেরাদারগণ একেবারে বেপরোয়া।

দিন তিনেক আগে স্কুল ছুটি হয়ে গেলে লোকেশ্বর স্কুলের চার-পাঁচ জন ছাত্র গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরছিল। সাধারণত যেমন হয়ে থাকে ছেলেরা পাশাপাশি চলছিল পথের অনেকটা জায়গা জুড়ে। এমন সময়ে কেরোসিন ডিপোর দুই জন চাপরাসী পিছন থেকে এসে ছেলেদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে পথ করে নেয়। ছেলেরা আপত্তি করে, আপত্তি থেকে বচসা, বচসা থেকে কিল ঘুষি, চাপরাসীরা পালিয়ে এসে সাহেবকে নালিশ করলো। লোকেশ্বর স্কুলের পনের-কুড়ি জন ছাত্র তাদের ধরে মেরেছে, তারা সবিনয়ে পথ

চেয়েছিল, ছেলেরা অকারণে তাদের উপর মারধোর করেছে। ক্যালেন সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠল, কী এত বড় কথা! সাহেবের চাপরাসীর উপরে হস্তক্ষেপ সে তো খাস সাহেবের গায়ে হাত তুলবার মতোই। সাহেব তখনই খসখস করে হেডমাস্টারের নামে চিঠি লিখে পাঠালো—এই সব স্বদেশী গুণ্ডা ছাত্রদের তখনই তাঁর কাছে নিয়ে এসে হেডমাস্টার যেন বেত্রাঘাত করে তাদের সাজা দেয়। সাহেবদের ধারণা ছিল এই বেসরকারী স্কুলটি শহরের স্বদেশীওয়ালাদের প্রধান আড্ডা। সহকারী হেডমাস্টার রমেশ আচার্য দেখলেন এ এক সঙ্কট। তিনি লিখে জানালেন হেডমাস্টার অনুপস্থিত, তিনি এলে সাহেবের চিঠি তাঁর হাতে দেবেন। কেরোসিন তেলের সাহেব এই চিঠি পেয়ে কেরোসিন তেলের মতো জ্বলে উঠলো, তখনই দ্বিতীয় চিঠি লিখে পাঠালো, হেডমাস্টার কার হুকুমে স্কুলে অনুপস্থিত? সাহেবের হাতে কলম চলে ভালো। রমেশবাবু জানালেন হেডমাস্টার স্কুলের প্রেসিডেন্ট রায়বাহাদুর যজ্ঞেশ রায়কে জানিয়ে কলকাতা গিয়েছেন। এমন সময়ে অবিনাশবাবু এসে পৌঁছলেন।

তিনি সাহেবকে লিখলেন—প্রিয় মহাশয়, আপনার দুখানি পত্রই আমার হস্তগত হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রের উত্তর দান অনাবশ্যক মনে করি, কেননা বিষয়টা আপনার অধিকার বহির্ভূত। আপনার প্রথম পত্র সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ছাত্র পনের-কুড়ি জন নয়, চার-পাঁচ জন মাত্র। তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরছিল, এমন সময়ে আপনার দুইজন চাপরাসী এসে তাদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়, কোনও প্রয়োজন ছিল না, কারণ দু'জনের যাওয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল। ছেলেরা এই অভদ্র ব্যবহারে আপত্তি করে। তখন চাপরাসীরা ছেলেদের মারে, ছেলেরা তখন উল্টে মারে। আমার বিবেচনায় তারা অন্যায় করেনি, কাজেই শাস্তি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আর উঠলেও আমার ছাত্রদের সম্বন্ধে হুকুম করবার অধিকার আপনার নেই। আপনার উচিত চাপরাসীদের সতর্ক করে দেওয়া। ধন্যবাদান্তে শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী।

এই চিঠি পাওয়া মাত্র কেরোসিনের ডিপো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কী, এত বড় কথা! তিনি রায়বাহাদুরকে চিঠি লিখে হুকুম করলেন, লোকেশ্বর স্কুলের হেডমাস্টারটি অত্যন্ত বেয়াদব। তাকে নিয়ে এখনই আমার কাছে উপস্থিত হলে বাধিত হব।

যজ্ঞেশ রায় রায়বাহাদুর হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যত্ববর্জিত নন। তিনি বুঝলেন এ অন্যায় হুকুম তামিল করা অনুচিত। তিনি লিখে জানিয়ে দিলেন জরুরী সরকারী কাজে তাঁকে এখনই কাছারি রওনা হতে হচ্ছে; পরে সময়মতো তাঁর অনুরোধ সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

কী, সময় মতো বিবেচনা! রায়বাহাদুরও দেখছি বেয়াদব। তিনি তখনই বগি হাঁকিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সব বৃত্তান্ত শুনে বললেন, মিঃ ক্যালেন কাজটা তুমি অবিবেচকের মতো করেছ। এ নিয়ে মামলা-মোকর্দমা উপস্থিত হলে তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে, তখন উকীলদের জেরায় তুমি জেরবার হয়ে যাবে। যা হয়েছে হয়েছে, এখন চুপ করে যাও, আর উচ্চবাচ্য কোরো না।

কি, কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হবে!

ম্যাজিস্ট্রেটটি একটু রঙ্গপরায়ণ, তা ছাড়া নিজেদের মধ্যে অপ্রিয় সত্য বলতে কুণ্ঠিত হয় না, বলল, প্রয়োজন হলে করতে হবে বইকি। ভাবতে পারো বৃটিশ রাজত্ব কতদিন চুরি করে গড়ে উঠেছে!

কই, ইতিহাসে তো এমন লিখে না।

সেটা ঐতিহাসিকদের কৃতিত্ব। আমরা কাজে যা ভুল করি ঐতিহাসিকরা লিখে তা শুধরে নেয়।

তোমার রায়বাহাদুরটি অত্যন্ত বেয়াদব।

দুঃখিত, তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। রায়বাহাদুর সজ্জন ও ন্যায়পরায়ণ। মিঃ ক্যালেন, তোমাকে আরও একটা কথা গোপনে জানাচ্ছি। শহরের কেরোসিন ডিপোর জন্য অনেক উচ্চতর টেন্ডার দিয়ে একজন দরখাস্ত করেছে।

কী, ইংরেজ হয়ে এমন বে-ইমানি করবে।

ইংরেজ কোথায়? মারোয়াড়ি।

ঐ নেটিভকে দেবে?

মনে হচ্ছে দিতে হবে, সরকারের এখন টাকার বড় দরকার। তা ছাড়া ঐ যে বঙ্গভঙ্গের ধুয়ো উঠেছে, দেশের টেম্পার এখন ভালো নয়। মারোয়াড়ীকে দিলে তবু লোক কিছুদিনের জন্য খুশী হবে।

এমন ভাবে চললে বৃটিশ রাজত্বের কী পরিণাম হবে ভেবেছ—এই বলে মিঃ ক্যালেন একটি প্রমাণ মাপের দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলো—হয়তো বৃটিশ রাজত্বের জন্যই।

এই ইংরাজ জাতটা বড় বিচিত্র। তারা হাজারটা কিল গোপনে হজম করতে রাজী, কিন্তু আধখানা কিল জানাজানি হয়ে গেলে পৃথিবী তোলপাড় করে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়, সকলকে বুঝিয়ে দেয় বিশ্বসভ্যতা অতলে তলিয়ে গেল। আর মজা এই যে সকলে সেই ভাবেই বোঝে, বারে বারে ঠকে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে আর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না, তবে যথাসময়ে আবার ঠিক জড়িয়ে পড়ে।

ম্যাজিস্ট্রেট পরামর্শ দিয়েছিল কিল হজম করতে কিন্তু কেরোসিন ডিপোর সাহেবের গরহজম হয়ে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। যত্রতত্র সে বলে বেড়াতে লাগলো "এই বাঙালী জাতটাকে সে ডেকিয়া লইবে, ইহাদের জুলুম সে সহ্য করিবে না।" চাপরাসী আরদালির কাছে বাংলা ভাষা সে "উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছে।"

এদিকে আবার আধখানা কিলকে দশখানা করে প্রচার করতে বাঙালী জাতটার জুড়ি নেই। শহরে ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়ে গেল চাপরাসী নয় স্বয়ং সাহেব ছেলেদের হাতে মার খেয়েছে। কেউ বলল, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কুঠি থেকে সাহেবকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে নেটিভের হাতে কিল খেয়ে নালিশ করতে এসেছ, এই সঙ্গে জড়িয়ে গেল মারোয়াড়ীর কেরোসিন ডিপো পাওয়ার কাহিনী, ম্যাজিস্ট্রেট ক্যালেন সাহেবকে শহর থেকে তাড়াতে চান তাই কেরোসিন ডিপো মারোয়াড়ীকে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে স্কুলের ছেলেরা এক কাণ্ড করে বসলো, অধিকাংশই লোকেশ্বর স্কুলের ছাত্র। হোলির দিনে তারা ক্যালেন সাহেবের সঙ বের করলো। একটা ছেলেকে যথাসাধ্য সাহেব সাজিয়ে ছড়া কেটে গান বাঁধলো, ক্যালেন সাহেব খেলেন ঢিল, একসঙ্গে পাটকেল ঢিল। হোলি হো হোলি হো।

ক্যালেন সাহেবের চাপরাসীরা ছেলেদের জব্দ করবার সুযোগ খুঁজছিল। যথেষ্ট কারণ ছিল তাদের। জজ ম্যাজিস্ট্রেটের চাপরাসীরা তাদের সঙ্গে আর কথা বলে না, খৈনি দিতে

গেলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইস্কুলের ছেলেদের কাছে যারা ঠকে এসেছে তাদের সঙ্গে কথা বলা অপমান। ক্যালেনের চাপরাসীরা দেখলো এই সঙ। তারা গায়ে জামায় খানিকটা লাল রঙ মেখে সাহেবের কাছে এসে কেঁদে পড়লো, হুজুর, ছেলেরা খুন করে ফেলেছে। সাহেব রেগে উঠে বলল, শালা লোগোকো কান পাকড়কে নিকাল দো। তারা পালালো, ভাবলো সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, নইলে এমন সুযোগ ছেড়ে দেয়। ক্যালেনেরও রাগবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তার মেমসাহেব এক পার্টিতে গিয়েছিল, অন্য মেমসাহেবরা কেউ কথা বলল না, যারা দু-একটা কথা বলল সে-সব এমনি বাঁকা যে না বলবার চেয়েও খারাপ। ক্যালেনের মেম এসে সাহেবের উপরে পড়লো, সেদিনেই আবার ক্যালেন কলকাতা থেকে খবর পেয়েছিল যে শেঠ কৃপারাম কেরোসিনের ডিপো বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে—শীঘ্রই আসবে। স্বভাবতই ক্যালেনের রাগ গিয়ে পড়লো চাপরাসীদের উপরে। জলের মতো রাগেরও গতি নিম্নদিকে। পরদিন সাহেব সপরিবারে শহর ত্যাগ করে কলকাতা চলে গেল।

এই ঘটনায় শহরের সাহেব মহলে চাঞ্চল্য দেখা দিল, ক্যালেন কিল চুরির কৌশল না জানায় একটা কেলেঙ্কারি করে বসলো। সেই অনুপাতে দেশী মহলে চাঞ্চল্য দেখা দিল তবে সেটা বিজয়োল্লাসে। ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুরকে ডাকিয়ে এনে বললেন, রায়বাহাদুর, ছেলেরা বাড়াবাড়ি করছে, হেডমাস্টারকে বলে দেবেন যাতে আর বাড়াবাড়ি না করে।

রায়বাহাদুর অবিনাশবাবুর উপরে খুশি নন, তাঁর শিক্ষার ফলেই শচীন গৃহত্যাগ করেছে। প্রথমে তিনি হাঁড়ির একটা ভাত টিপে দেখবার উদ্দেশ্যে সুশীলকে বললেন, তোর ও ইস্কুলে পড়া হবে না। সে সোজা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, হয় এই ইস্কুলে পড়ব নয় পড়া ছেড়ে দেব। তাঁর ভয় হল পাছে এটাও পালায়। তাই তিনি ছেলেকে আর না ঘাঁটিয়ে মাস্টারদের উপরে গিয়ে পড়লেন। এখানেও রাগের গতি নিম্নদিকে হল, মাস্টাররা স্কুলের নিম্নতম ধাপ।

পরদিন সকালবেলায় অবিনাশবাবুর পদত্যাগপত্র রায়বাহাদুরের হাতে এল, সেই সঙ্গে আর পনেরোখানি পদত্যাগপত্র। স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা ষোলো জন। সে দিন ছেলেরা কেউ স্কুলে এলো না। রায়বাহাদুর দেখলেন স্কুল ভেঙে যায়। তিনি সন্ধ্যাবেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে সমস্ত অবগত করালেন।

সাহেব মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে রেখে বললেন, রায়বাহাদুর আপনি সরলচিত্ত ব্যক্তি, কিছুই tactfully manage করতে পারেন না দেখছি। সাহেব তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে স্কুলের সমস্ত শিক্ষকের বেতন শতকরা দশ টাকা বাড়িয়ে দিলেন আর কমিয়ে দিলেন ছাত্রদের বেতন এক টাকা করে। তবে সাহেবের tact-এর ফলে স্কুল আবার জাঁকিয়ে উঠল, কিন্তু চাপা পড়লো না শহরের দেশী মহলে উল্লাস।

রায়বাহাদুর দুই গালে চড় খেয়ে অবিনাশবাবুকে তাড়াবার পন্থা চিন্তা করতে লাগলেন। গৃহিণী আদ্যন্ত শুনে বললেন, হল তো, এবারে বাহাদুরিটা ছাড়ো, রায়বাহাদুর পদবীটা তো প্রাণ থাকতে ছাড়তে পারবে না জানি। রায়বাহাদুর ঘোরতর ক্রোধের ভান করে গৃহত্যাগ করলেন, ভাবটা এই যে এর যথোচিত উত্তর তাঁর জানা আছে, তবে কিনা স্ত্রীলোকের উপরে ইত্যাদি ইত্যাদি।

নয়

ব্যাপারটা এতদিন কানাকানিতে ছিল এবারে মুখে মুখে রটে গেল; বাংলা সংবাদপত্রগুলো যথাসম্ভব শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার নীতি অবলম্বন করে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ ও মন্তব্যে কাঁথার উপরে নকশা তুলতে লাগলো। ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলোর দোমনা ভাব; একদল সরাসরি সরকারকে সমর্থন জানালো আর একদল ব্যবসায়িক লাভক্ষতির হিসাব করে আপত্তি করলো আর জনসাধারণ মানে হিন্দু-মুসলমানের অধিকাংশ কথাটা অবিশ্বাস করলো তবে রাজনীতিক ও সাহিত্যিকগণ সভা-সমিতিতে সরকারের মতলবের ব্যাখ্যা শুরু করে দিল। বড়লাট কার্জনের সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গ ও আসাম সফরের উদ্দেশ্য যে সরল নয়, বড় বড় ভোজ খাওয়া, স্থানে স্থানে দরবার করা, রাজা মহারাজা ও নবাবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ—এ সব যে ঘোড়ার আড়াই চাল, বাদুড়ে তাগ করে পেঁচা মারা উদ্দেশ্য এ সব প্রচার করতে শুরু করলো। প্রথমে কেউ বড় কান দিল না, অবশেষে কান দিতে বাধ্য হল। কানের কাছে নিরন্তর ঢাক বাজতে আরম্ভ করলে না শুনে উপায় থাকে না।

সরকার পক্ষ থেকে জানানো হল, না, না, এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক প্যাঁচ নেই। বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম এত বড় অঞ্চল একজন ছোটলাট সুশাসন করে উঠতে পারছে না, সুশাসনের উদ্দেশ্যে একে দ্বিখণ্ডিত করা উচিত। দুই বঙ্গের রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম তিনটি ডিভিশনের সঙ্গে আসাম জুড়ে দিয়ে হবে নূতন পূর্ববঙ্গ আর প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগের সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত হয়ে হবে নূতন পশ্চিমবঙ্গ, তাহলেই সুশাসনের রথ গড়গড় করে চলতে থাকবে, এতদিন যে ভাবে চলছে তা চলা নয়, গায়ের জোরে টেনে নিয়ে যাওয়া।

দেশী মহল পরিকল্পনাটার ভিন্ন ব্যাখ্যা করলো, তারা বলল সুশাসন উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য গভীর; বাঙালী সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে তাকে দুর্বল করে ফেলে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চল গঠন করবার মতলব আছে এর মধ্যে। আর এক মতলব হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নিস্তেজ করে ফেলবার চেষ্টা। ঐ যে এক সরকারী চাকুরে আনন্দমঠ নামে একখানা উপন্যাস লিখে গিয়েছে, আর এক সন্ন্যাসী গেরুয়ার আড়াল রচনা করে লোকগুলোকে খেপিয়ে তুলছে সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। স্বদেশীঅলারা টীকাভাষ্য করে বুঝিয়ে দিল যে, বাপু হে, রূপকথার রাক্ষসীর প্রাণ ছিল ভোমরা-ভুমরির মধ্যে। বাঙালীর প্রাণ তার গানের মধ্যে, সেটাকে দুর্বল করে না ফেলতে পারলে এ দেশ শাসন করা যাবে না বলে সরকারের বিশ্বাস। সুশাসনের অছিলায় কোনরকমে সেটাকে চাপাচুপি দিতে হবে, শুকিয়ে যায় উত্তম—অন্তত ধারাটা ক্ষীণ হয়ে আসুক, যথা লাভ। বাংলা দেশ গানের গঙ্গোত্রী। সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তৃতায় জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল, সকলে একযোগে গেয়ে উঠল—বন্দেমাতরম্। সুজলাং সুফলাং মাতরম্। সকলের উপর টহলরাম গঙ্গারামের কণ্ঠ।

সরকারী মুখপত্র বলল, তোমরা এখনি কেন বৃথা উত্তেজিত হচ্ছ, এখনো কিছু স্থির হয়নি। মুখপত্রের কথা নিতান্তই মৌখিক। তলে তলে সব ব্যবস্থা হতে লাগল আর বড়লাটের সফরও চলল জেলায় জেলায়। পূর্ববঙ্গের এক রাজাকে প্রলোভন দেখানো হল,

বঙ্গভঙ্গ স্বীকার করে নিন, আপনাকে মহারাজা করে দেওয়া হবে। তিনি সবিনয়ে জানালেন যে তাঁর প্রজারা চিরকাল তাঁকে মহারাজা বলে, বড়লাট আর নূতন কী দিলেন। কিন্তু ঢাকার নবাব পূর্ব্ববঙ্গের নেতা হওয়ার আশায় টোপ গিললেন, তিনি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে।

দেশময় যখন এই উত্তেজনা রায়বাহাদুর দেখলেন জল তো বেশ ঘোলা হয়ে এসেছে, এবারে ছিপ ফেলে অবিনাশ মাস্টারকে টেনে তুলতে পারলেই হয়। সুযোগও মিলে গেল। দুর্জনের কখনো সুযোগের অভাব হয় না।

ইতিমধ্যে এক সরকারী সার্কুলার প্রচারিত হল যার মুখ্য বক্তব্য বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি ছাত্রগণকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে হবে। উত্তেজনায় লেখাপড়ার ক্ষতি করে, আর হিন্দুশাস্ত্রেই তো আছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। রাজনৈতিক সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে তাদের যোগদান নিষিদ্ধ। এসব কাজে ছাত্রদের লিপ্ত দেখলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর শিক্ষকদের মধ্যে যারা অবাঞ্ছিত তাদের সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। এই রকম আরো সদুক্তি ও সদুপদেশ বহন করে সরকারী সার্কুলার প্রকাশিত হল। রায়বাহাদুর দেখলেন ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এবারে অবিনাশ মাস্টারের সঙ্গে বোঝাবুঝির পথ সুগম হল।

রায়বাহাদুর লোক খারাপ নন তবে তাঁর উপরে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে অদৃষ্ট। শচীনের গৃহত্যাগ, সুশীলের ঘাড় বাঁকানো, স্কুল ছাড়তে অস্বীকার, অবিনাশমাস্টারকে স্কুল ছাড়া করতে গিয়ে অপ্রস্তুতের একশেষ এবং শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ধিক্কার ও ধমক সমস্তর জন্যই যে অবিনাশ মাস্টার দায়ী এ বিষয়ে তাঁর মনে বিশ্বাস এমনি পাকা হয়ে গিয়েছিল কোথাও এতটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সর্বোপরি তাজপুরের বিবাহ ভেঙে যাওয়ার জন্যও অবিনাশ মাস্টারের ইঙ্গিত দায়ী—যদিচ অক্ষয় ফৌজদার ষড়যন্ত্রকারীদের নাম স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু হলে কী হয়। সন্দেহের স্বভাব বরফের মতো, একবার জমতে শুরু করলে চারদিকের জল টেনে নিয়ে শক্ত ও অধিকতর ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তরল জল তুষারে কঠিন। রায়বাহাদুরের হৃদয় এখন কঠিন লোষ্ট্র—যার একমাত্র লক্ষ্য অবিনাশ মাস্টারের মস্তিষ্ক। তবে কিনা বিধাতা সুবিবেচক, সুযোগ আপনি এসে জুটলো রায়বাহাদুরের হাতের কাছে।

এই সার্কুলারে বিপরীত ফল ফললো। জেলায় জেলায় গ্রামে গঞ্জে প্রায় সর্বত্র বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলোতে ছাত্রদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল, দিনাজশাহী শহরও বাদ গেল না। শহরের একমাত্র বেসরকারী স্কুল লোকেশ্বর হাইস্কুলের ছাত্ররা এই-সব দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা কিছু-একটা করতে চায়, ঠিক কি করবে, কি করলে সময়োচিত হয় বুঝতে পারলো না। অবিনাশবাবু সামগ্রিক উত্তেজনাবিরোধী, তিনি চাইতেন না যে সকলে মিলে গোলমাল শুরু করে। তিনি সত্যই স্বদেশীভাবাপন্ন ব্যক্তি, তাই বেছে বেছে যোগ্য ছাত্রদের দীক্ষা দিতেন, যেমন শচীনকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সকলে মিলে হল্লা করে এ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির অঙ্ক ভারী হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। অবিনাশবাবুর চরিত্রের এই ভারসাম্য সকলে বুঝতো না, অনেকে ভাবতো তিনি দুই দিক রক্ষা করে চলবার পক্ষপাতী। তাঁকে একমাত্র বুঝতো জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ডোভার

সাহেব, তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তাই যখন রায়বাহাদুরের আনাড়ি হস্তক্ষেপে স্কুলটি ভেঙে যাওয়ার মতো হয়েছিল, তিনি রক্ষা করেছিলেন স্কুলটিকে। রায়বাহাদুরকে উপদেশ দিয়েছিলেন এসব বিষয়ে tactful হওয়া আবশ্যক। এমন সময়ে ডোভার সাহেব বদলি হয়ে অন্যত্র কমিশনার হয়ে চলে গেলেন, তাঁর স্থলে এলো ঝানু আই সি এস মিঃ ক্রোজেট। এ রকম রদবদ্দল অনেক জেলাতেই হল, বিশেষ যে সব জেলা উত্তেজনার কেন্দ্র। অনেকেই বুঝলো সরকার এ বারে উদাসীনতা নীতি পরিত্যাগ করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঘটনাচক্রে মিঃ ক্রোজেট যেদিন শহরে এসে পৌঁছালো লোকেশ্বর স্কুলের ছাত্ররা বের করলো এক শোভাযাত্রা—যার একমাত্র ধ্বনি বন্দেমাতরম্। ক্রোজেট স্থির সিদ্ধান্ত করলো এ তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত অপমান। সে অবিনাশবাবুকে ডাকিয়ে এনে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নিল। অবিনাশবাবু ইচ্ছা করলে ছাত্রদের উপরে দোষ চাপিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন, কিন্তু সে প্রকৃতির লোক তিনি নন। তাঁর অজ্ঞাতসারে যে শোভাযাত্রা ঘটেছে তার দায়িত্ব নিজের উপরে নিলেন।

ছাত্ররা ঘটনা জানতে পেরে অবিনাশবাবুর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, বলল, আমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব বুঝিয়ে বলবো।

অবিনাশবাবু বললেন, না, এমন কাজ করো না, সাহেব হয় ভাববে আমি তোমাদের শিখিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, নয় ভাববে ছাত্রদের উপরে আমার কর্তৃত্ব নেই। তোমরা স্কুলে ফিরে যাও।

আপনি?

আমি অন্যত্র যাবো।

শহর ছেড়ে?

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, শহর না ছাড়লে আর অন্যত্র যাওয়া সম্ভব কী ভাবে।

কিন্তু অবিনাশবাবুকে শহর ছাড়তে হল না। তাঁর পদত্যাগ সংবাদ শুনবামাত্র একদল যুবক, অনেকেই নতুন নাম লেখানো উকীল, অনেকেই এখনো কাজে ঢোকেনি, তবে সকলেই তাঁর ছাত্র, এসে বলল, মাস্টারমশাই, আপনি অন্যত্র যেতে পারবেন না।

অবিনাশবাবু বললেন, এখানে থেকে কি করবো?

তারা বলল, যেমন পড়াচ্ছিলেন তেমনি পড়াবেন।

স্কুল যে গেল।

আবার স্কুল হবে। নবীন মহাজন তার আটচালাখানা ছেড়ে দিতে রাজি আছে।

মাস্টার?

কেন, আমরা আছি।

বক্তারা অনেকেই এম এ বি এল, অনেকে বি এ পাস।

অবিনাশবাবু একজনকে লক্ষ করে বললেন, ওহে অতুল, তুমি কেবল ওকালতিতে ঢুকেছ, পশার হচ্ছে বলে শুনেছি, ম্যাজিস্ট্রেট যদি তোমার সনদ কেড়ে নেয়?

সনদ কেড়ে নেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে নয়, হাইকোর্টের হাতে। আর হাইকোর্ট যদি বিমুখ হয় তবে তো বেঁচে গেলাম, আপনার স্কুলের মাস্টারিটা মারছে কে।

না হে অতুল, পাগলামি কোরো না।

মাস্টারমশাই, আজ দেশময় পাগলামির হাওয়া বইছে, না হয় একটু পাগল হলামই বা।

যুবকদের কথা অন্যথা হল না।

পরদিন শহরের লোকে দেখল নবীন মহাজনের বড় আটচালা ঘরখানার খুঁটিতে সাইনবোর্ড ঝুলছে—"দিনাজশাহী স্বদেশী বিদ্যালয়—প্রধান শিক্ষক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী।"

অবিনাশবাবুর সহকর্মীদের মধ্যে দুজন এসে জুটলো, আর দশজন পূর্বোক্ত যুবক দলের। আর ছাত্র! লোকেশ্বর স্কুল ভেঙে ছাত্র এসে জুটলো, আরও কিছু ছাত্র জুটলো এই প্রথম যাদের স্কুলে প্রবেশ। অবিনাশবাবুকে নিয়ে শিক্ষকগণ সিদ্ধান্ত করলো সরকারী সাহায্য নেওয়া হবে না, তা হলে আর ম্যাজিস্ট্রেটের ছড়ি ঘোরানো চলবে না। আর একটি কথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছি—ছাত্রদের তালিকায় প্রথম নাম সুশীল রায়, রায়বাহাদুরের পুত্র, সে এখন এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র।

অগ্নিগর্ভ রায়বাহাদুর বললেন, সুশীল, ও স্কুলে পড়া তোমার চলবে না।

সে খুশি হয়ে বলল, ভালই হল। দাদা তো এম এ পাস করে রিপন কলেজে প্রোফেসারি করছে, বারে বারে যেতে লিখছে, এবার যাবো।

কেন, লোকেশ্বর স্কুল কী করলো?

লোকেশ্বর স্কুল তো ভেঙে গিয়েছে।

তবে সরকারী স্কুলে ভর্তি হও।

আজকার দিনে কেউ সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়! ছিঃ—এই বলে সে প্রস্থান করলো।

নিরুদ্দিষ্ট আসামীর উদ্দেশ্যে রায়বাহাদুর বললেন, ছেলে আমার স্বদেশী হয়েছে। আর হবেই বা না কেন? নৌকার আগের গলুই যে দিকে যাবে পিছন গলুই-এর সে দিকে না গিয়ে উপায় কী!

গৃহিণী এতক্ষণ নীরবে বসে সব শুনছিলেন, এবারে স্বামীকে প্রস্থানোদ্যত দেখে বললেন, হাঁ গো। এক কাজ করো না।

রায়বাহাদুর ভাবলেন গৃহিণী বোধ করি কোন মুশকিল আসানের পন্থা নির্দেশ করবেন, তিনি চেপে বসলেন, কী বলছ?

গৃহিণী মধুর হেসে বললেন, ম্যাজিস্ট্রেটের চটিজোড়া নিয়ে এসে পূজো করো।

এই জন্যে বসানো।

ম্যাজিস্ট্রেটরা তো চটিজুতো পরে না।

গৃহিণী গালে হাত দিয়ে নৈরাশ্যের সুরে বললেন, ওমা, তবে রায়বাহাদুররা পূজো করবে কী।

বরঞ্চ, তোমরা এক কাজ কর, অবিনাশমাস্টারের চটিজুতো এনে মাথায় করে রাখো।

পেলে রাখি বইকি। তাঁর জুতো মাথায় রাখার সৌভাগ্য করে কী এসেছি!

ওরে আমার সৌভাগ্যবতী! বলে নিষ্প্রভ রায়বাহাদুর প্রস্থান করলেন।

সেদিন কাছারি যাওয়ার পথে নজরে পড়লো নূতন বিদ্যালয়টি। রায়বাহাদুর দেখলেন মোটা অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড দিনাজশাহী স্বদেশী বিদ্যালয়—প্রধান শিক্ষক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী। ইস্, আবার বন্দেমাতরম্ লেখা একটা নিশানও উড়িয়েছে দেখছি! কিন্তু একি, প্রকাণ্ড আটচালাখানা উপচে পড়ছে ছাত্রের দল। আর ঐ যুবকগুলো বুঝি মাস্টার। অ'রে বেতন দেবে কোত্থেকে, দুদিনে সব ভেঙে যাবে।

বাড়ি থেকে কাছারি অনেকটা পথ—এটা তাঁর ঘুমোবার সময়। ঘুমের ঝোঁকে মাঝে মাঝে গাড়ির দেয়ালে মাথা ঠুকে যায়। ঘুমের মধ্যে সুখস্বপ্ন দেখছিলেন অবিনাশ মাস্টারকে আসামীর কাঠগড়ায় চাপিয়েছেন, এমন সময়ে জোরে মাথা ঠুকে গেল গাড়ির কাঠরায়। ইস্ বলে জেগে উঠে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন আর মনস্তত্ত্বের কোন্ নিগূঢ় নিয়মে উপচীয়মান সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল অবিনাশবাবুর উপরে। লোকটা যে বিষ ছড়িয়েছে তা এ বার অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছেছে। লোকটা তাঁর শত্রু, কাজেই দেশের শত্রু। এমন লোককে তাড়াতে না পারলে তাঁর রায়বাহাদুরি বৃথা। তিনি কোচম্যানকে বলে দিলেন আগে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে চল। মনে মনে বললেন, সেলাম বাজিয়ে আসা যাক আগে।

দশ

ম্যাজিস্ট্রেট এজলাসে বসেছিলেন, রায়বাহাদুরকে দেখতে পেয়ে খাসকামরায় এসে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। রায়বাহাদুর এসে সেলাম করে দাঁড়ালে বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞাসা করলেন, রায়বাহাদুর, শহরে এসব কী হচ্ছে?

রায়বাহাদুর বললেন, হুজুর, আমি একা কী করব।

রায়বাহাদুর আগেই বুঝেছিলেন যে ক্রোজেট সাহেব আগের ম্যাজিস্ট্রেট ডোভার সাহেব নন। ডোভারকে হুজুর বলে সম্বোধন করলে তিনি বলেছিলেন, রায়বাহাদুর আপনি উচ্চ পদাধিকারী, তায় প্রবীণ, আপনার মুখে হুজুর শব্দ মানায় না, চাপরাসী আর্দালিরা বলে আলাদা কথা, আপনি স্যার বলবেন। আর ঘরে ঢুকতেই ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে বলতেন বসুন। ক্রোজেট সাহেব হুজুর বলে সম্বোধিত না হলে বিরক্ত হন, আর কখনও বসতে বলেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে হয়।

রায়বাহাদুরের কথা শুনে ক্রোজেট বলল, কেন শহরে তো আরো চারজন রায়বাহাদুর আছে, রায়সাহেবের সংখ্যাও পাঁচ-সাতজন।

হুজুরের কথা ঠিক, কিন্তু সকলে তো এক ভাবের লোক নয়।

কেন, তারা কি স্বদেশী ভাবের?

ঠিক তা নয়, তবে উদাসীন।

উদাসীন থাকবে বলে তো আমরা রায়বাহাদুর রায়সাহেব উপাধি দিই না। মনে রাখবেন সাধারণ গোয়েন্দা দিয়ে যা হয় না, তাই করবার ভার আপনাদের উপর। ভুলবেন না যে আপনারা বেসরকারী ভদ্র গোয়েন্দা।

ক্রোজেটের কথাগুলো অনেকাংশে সত্য হলেও এমন স্পষ্টাক্ষরে কেউ কখনও বলে

না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে দিয়ে রায়বাহাদুর ভাবলেন ডোভার ছিল সহানুভূতিপরায়ণ সজ্জন আর ইনি নখদন্তে সক্রিয়।

এই যে শহরের বুকের উপরে রাতারাতি একটা স্কুল গজিয়ে উঠল তার কি করছেন?

আমি কী করব হুজুর। একজন তার আটচালাখানা দিল, আর লোকেশ্বর স্কুলের ছাত্ররা এসে ভর্তি হল।

আর শিক্ষক?

অধিকাংশই ছোকরা উকীল।

তাদের সনদ বাতিল করে দেওয়া যায় না?

সেটা হুজুর হাইকোর্টের হাত।

আর কালকে যে ব্যান্ড্ ম্যাটরম্ বলে প্রসেশন বার করলো?

হুজুর, নূতন স্কুল তো সরকারী সাহায্যপ্রার্থী নয়, ওদের বাধা দেবার কোন আইন দেখি না।

ক্রোজেট সজোরে জানু চাপড়ে বলে উঠল, আপনারা সবাই তলে তলে স্বদেশী। আপনি ওদের নিষেধ করে দেবেন।

কি নিষেধ করতে হবে বুঝতে না পেরে রায়বাহাদুর বলল, হুজুর আমার কথা কেউ শুনবে না।

কেন? আপনি তো সিনিয়র রায়বাহাদুর।

না হুজুর, দু'জন আমার সিনিয়র, তবে না শুনবার আসল কারণ হচ্ছে হুজুর নিশ্চয় জানেন যে আমি মহারানীর শ্রাদ্ধ করেছিলাম, সবাই চটে গিয়েছে।

কেন, রাজারানীর শ্রাদ্ধ করবার অধিকার তো শাস্ত্রে আছে, আর তা ছাড়া তারাও তো করতে পারতো। ওসব যাক। আপনি রায়সাহেব আর রায়বাহাদুরদের সতর্ক করে দেবেন সরকারী খেতাবের মর্যাদা যদি রক্ষা না করে তবে তাদের সকলকে স্পেশাল কনস্টেবল করে পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড় করিয়ে দেব।

যে আজ্ঞা হুজুর।

যে আজ্ঞা নয়—ঐ হেডমাস্টার অবিনাশ চক্রবর্তী লোকটা কেমন?

অবিনাশ মাস্টারের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ হাতের কাছে এসে উপস্থিত কিন্তু সাহেবের ব্যবহারে রায়বাহাদুরের মন এমন বিকল হয়ে গিয়েছিল যে অবিনাশমাস্টারের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করতে পারলো না, শুধু বললো, লোকটি ঠাণ্ডা মেজাজের।

বরফও ঠাণ্ডা, তাই বলে ছুঁড়ে মারলে কম লাগে না, তবে লোকটাকে বলে দেবেন আমি বরফ গলাবার মন্তর জানি। আচ্ছা লোকটাকে স্পেশাল কনস্টেবল করে দিলে কেমন হয়?

তাতে সরকারের সুনাম হবে না।

কেন?

লোকটা যেমন লম্বা তেমনি রোগা।

সরকারী ম্যানুয়েলে এমন কোনো আইন আছে যে স্পেশাল কনস্টেবলকে আপনার মতো গাবদা-গোবদা আর আহাম্মুক হতে হবে?

ক্রোজেটের বাক্যে রায়বাহাদুরের মনে নানারকম ভাববিপর্যয় উপস্থিত হচ্ছিল। একে তো ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকে পা টনটন করছে, তার উপরে ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা। রায়বাহাদুরগিরি এ কী ঝকমারি।

হঠাৎ গর্জন করে ক্রোজেট বলে উঠল, শহরের লোক সবাই বড়্মাশ আছে, সবাই হারামজাড আছে—আর তলে তলে সবাই স্বডেশী।

রায়বাহাদুর মনে মনে বললেন, তুমি এ ভাবে চললে যারা এখনো নয় তারও স্বদেশী হয়ে উঠবে।

দেখো এক কাজ করো, অবিনাশ লোকটাকে বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে।

বেশ, বলবো হুজুর সেলাম পাঠিয়েছেন।

সেলাম পাঠাবো কি। যখন পাঠাবো চাপরাশি পাঠাবো, কান পাকড়ে নিয়ে আসবে।

রায়বাহাদুর মনে মনে বললেন, সাহেবের পো, অবিনাশ মাস্টারকে চেনো নি। ঐ যে বললে বরফ শীতল হলেও ছুঁড়ে মারলে কম লাগে না। একবার হোক মোলাকাত, তখন বুঝতে পারবে দেশে মানুষ আছে, সবাই রায়বাহাদুর নয়। ক্রোজেটের এক সাক্ষাৎকারেই তিনি অবিনাশবাবুর গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছেন।

কার্জন স্বমূর্তি ধারণ করবার পরেই দেশের যাবতীয় শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী প্রভুর ভাবমূর্তি ধারণ করেছে। ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষা ও মেজাজ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক। মিঃ ক্রোজেট একটি আণুবীক্ষণিক কার্জন।

রায়বাহাদুর বাইরে এসে একটি বটগাছের স্নিগ্ধছায়ার দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। উত্তপ্ত মেজাজ ও বিধ্বস্ত অবস্থাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যেই সর্বত্র আদালতের চৌহদ্দির মধ্যে বড় বড় বটগাছ লাগানো বিধি। শীতল বাতাসে মাথা ঠাণ্ডা হতেই রায়বাহাদুরের মনে পড়ে গেল—যাক, খুব বেঁচে গিয়েছি, সুশীল যে স্বদেশী স্কুলে ভর্তি হয়েছে এ কথা এখনও কানে ওঠেনি মিঃ ক্রোজেটের।

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের আহ্বানে অবিনাশবাবু এসে তাঁর খাস কামরায় প্রবেশ করে 'গুডমর্নিং স্যার' বলে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন; শুনেছিলেন লোকটা কাউকে বসতে বলে না। ক্রোজেট একবার কটমট করে তাকিয়ে বিনা ভূমিকায় শুধালো, আপনি স্বডেশী আছেন?

অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন, আপনার মতোই আমিও স্বদেশী।

ক্রোজেট রেগে উঠে বললো, কি, আমি স্বডেশী!

আপনি নিশ্চয় স্বদেশকে ভালবাসেন?

নিশ্চয়।

আমিও তেমনই ভালবাসি আমার স্বদেশকে।

ম্যাজিস্ট্রেট দেখলো লোকটা শক্ত, বেশি চাপ দেওয়া চলবে না।

আপনি কেন নূতন স্কুল বসিয়েছেন?

আমি কিছুই বসাইনি। শহরের লোকে একটি স্কুলের প্রয়োজন অনুভব করে বসিয়েছে।

তার জন্যে অনুমতি আবশ্যক জানো?

জানি। যথাস্থান থেকে যথারীতি অনুমতি নেওয়া হয়েছে।

জানো আমি এ স্কুল ভেঙে দিতে পারি?

জানি না। তবে আপনি জেলার প্রধান কর্মচারী, ভালো মন্দ দুই-ই করতে পারেন। ভালোটাই করুন না কেন?

বেশ তাই করবো, স্কুলে সরকারী সাহায্য দেব।

ধন্যবাদ, কিন্তু সরকারী সাহায্য আমরা নেবো না, তাতে অনেক ঝামেলা।

সরকারী সাহায্য না পেলে চালাতে পারবেন স্কুল?

আশা তো করছি।

জানেন আপনাকে জেলা থেকে বহিষ্কৃত করতে পারি?

জানি; তবে আপনিও এটুকু জেনে রাখুন যেখানেই যাবো আমাকে ঘিরে নূতন স্কুল উঠবে।

ম্যাজিস্ট্রেট এই স্পর্ধার যথাযোগ্য উত্তর না পেয়ে বলল, এখন যেতে পারেন।

অবিনাশবাবু থ্যাঙ্কস্ জানিয়ে বিদায় নিলেন এবং স্কুলে এসে শিক্ষকদের সমস্ত বিষয় জানালেন।

সকলে বলল সাবধান হয়ে চলতে হবে। কিন্তু সাবধান হওয়ার সময় পাওয়া গেল না, দু'দিনের মাথায় এক রাত্রে স্কুলটি আগুন লেগে পুড়ে গেল। কয়েকজন পাহারাওয়ালাকে পালিয়ে যেতে কেউ কেউ দেখেছিল।

নবীন মহাজন পরদিন অবিনাশবাবুকে বলল, চিন্তা কী মাস্টারবাবু, আমি দশ-দিনের মধ্যে নতুন ঘর তুলে দিচ্ছি। এখন শীতকাল, আমার আমবাগানটার ছায়ায় স্কুল চালান।

যুবক শিক্ষকের দল বলল, না, আর চালাঘর নয়, পাকাবাড়ি তুলতে হবে। তুমি বরঞ্চ জায়গাটা স্কুলকে দান করো। তোমার নামে স্কুল করে দেব।

নবীন মহাজন বলল, না বাবুরা তা হবে না। নাম ঐ স্বদেশী বিদ্যালয় রাখতে হবে। আমি দুদিনের মধ্যে লেখাপড়া করে জমিটা দিয়ে দিচ্ছি।

শেষ পর্যন্ত মাঝামাঝি রফা হল, পাকাবাড়ি উঠলে স্কুলের নাম হবে নবীন স্বদেশী বিদ্যালয়। সকলে স্কুলের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে লাগলো। তখন দেশে স্বদেশীর হাওয়া দিয়েছে—অত্যল্প কালের মধ্যে আশাতীত টাকা উঠল।

একদিন শৈলেনখুড়োকে ডেকে রায়বাহাদুর তার হাতে পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, যাও, স্কুলের বাড়িটার জন্য অবিনাশ মাস্টারের হাতে দিয়ে এসো। কিন্তু আমার নাম কোরো না।

শৈলেনখুড়ো বলল, আমি গেলেই তো বুঝতে পারবে।

যার বুঝবার বুঝুক, মোট কথা এই যে পাকা খাতায় যেন আমার নামটা না ওঠে।

রায়বাহাদুরের এই অযাচিত দানের মূলে স্কুল বা অবিনাশের প্রতি আগ্রহ বা শ্রদ্ধা নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি বিরক্তি ও রাগেই তাঁর টাকার খনির মুখ খুলেছিল।

মাস দুয়েকের মধ্যে নতুন পাকাবাড়ি উঠল, ছাত্র-সংখ্যাও বাড়লো।

তখন একজনের মাথায় হঠাৎ বুদ্ধির চমক খেলে গেল—সে বলল, শহরে কলেজ নেই, এই সঙ্গে একটা কলেজ স্থাপন করলে মন্দ হয় না।

টাকা?

নিতে জানলেই টাকা আসে, লোকে দেবে, এই দেখুন না কেন এই কদিনের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা তো উঠে গেল, এমন কি বেনামা দানেও তো পাঁচশো টাকা পাওয়া গিয়েছে— বলে সকলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসলো।

অবিনাশবাবু বললেন, কলেজ করতে হলে আশু মুখুজ্জের অনুমতি আবশ্যক হবে।

আশুবাবু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার আর হাইকোর্টের জজ।

অতুল বলল, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি রওনা হচ্ছি।

অবিনাশবাবু বললেন, অমনি শচীনকেও সঙ্গে নিয়ো।

নিশ্চয়।

সেই রাতেই অতুল আর জন দুই যুবক কলকাতা রওনা হয়ে গেল।

এগারো

আশুবাবুর খোলা দরজা, প্রবেশে কারো বাধা ছিল না। দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরে তাঁর বসবার জায়গা। যুবকেরা ঢুকে প্রণাম করে দেখতে পেলো—অত সকালেই চার-পাঁচজন লোক আশুবাবুকে ঘিরে উপবিষ্ট।

আশুবাবু যুবকদের দেখে বললেন, বলো খবর কী?

হঠাৎ অতুলকে চোখে পড়তে বললেন, তোমার বাড়ি তো দিনাজশাহীতে?

আজ্ঞে সেখানেই ওকালতি করব ভাবছি।

সনদ পেয়েছ?

আপনার আশীর্বাদে পেয়েছি।

হাঁ হে, তোমাদের ওখানকার স্বদেশী স্কুলটা নাকি পুড়ে গিয়েছে?

আজ্ঞে হঠাৎ।

আরে হঠাৎ নয়—কাজটা বেটা ক্রোজেটের, স্বদেশী ওর চক্ষুশূল। আরে শচীন যে! রিপন কলেজে ঢুকেছ, বেশ বেশ।

বিস্মিত শচীন বলল, স্যার আমাকে চিনলেন কি করে?

বেশ কথা। তুমি বি এ-তে ফার্স্ট, এম এ-তে ফার্স্ট; তোমাকে চিনবো না! কে কবে কেমন পাস করলো সমস্ত আশু মুখুজ্জের নখাগ্রে। আসো না কেন?

স্যার ভয় করে।

সশব্দে হেসে উঠে বললেন, বাঙালী ছাত্ররা আশু মুখুজ্জেকে ভয় করে এই প্রথম শোনা গেল। ভয় করবে বেটা সাহেবরা। আমি শহরে মহকুমায় কলেজ স্থাপন করে এত বি এ এম এ পাস করাবো যে তাদের চাকুরির চাহিদা মেটাতে না পেরে বেটারা দেশ ছেড়ে পালাবে। এখনো ওরা চেনেনি আশু মুখুজ্জেকে। তোমাদের স্কুলের পাকা বাড়ি তো উঠেছে।

স্যার কেমন করে জানলেন?

দেখো বাপু, বিশ্ববিদ্যালয় চালাই—ওটা এক বিশ্ব, খবর না রাখলে চলবে কেন। খবর রাখা আর মন্ত্রগুপ্তি, এই হচ্ছে শাসনের মূল রহস্য। দেখো এক কাজ করো না কেন, ঐ স্কুলের সঙ্গে একটা কলেজ স্থাপন করো না কেন; তোমাদের শহরে তো কলেজ নেই।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি আপনার কাছে, অনুমতি আবশ্যক।

ঢালাও অনুমতি, লেগে যাও, স্বদেশী হাওয়ায় এখন লোকের টাকার খনি আলগা হয়েছে, লেগে যাও, হয়ে যাবে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল, কিছুক্ষণ ইংরাজিতে কথা বলতে কাদের যেন আসতে অনুমতি দিলেন। তার পরে বললেন, ওরে রামচরণ খোলা বারান্দায় আমার জলচৌকি, তেলধুতি আর তেল নিয়ে আয় আর খান দুই চেয়ার দিতে ভুলিস নে।

দরবারিদের একজন বলল, স্যার আজ রবিবার, এত সকালেই?

যুবকরা বলল, স্যার আমরা তবে আসি।

আসবে কি হে। একটু দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে যাও। দু বেটা সাহেব আসছে আমার কাছে কিছু সুবিধা আদায় করতে। এমন অবস্থা করবো যে বেটারা পালাবার পথ পাবে না। ভেবো না কটুকাটব্য করবো, মোটেই না। ঐ যে তোমাদের রবিঠাকুর 'স্বদেশীসমাজ' নাকি লিখেছে না, তারই একটু নমুনা দেখিয়ে দেব।

ভিতর থেকে তেলধুতি পরে খালি গায়ে বিরাট রোমশ বপু নিয়ে জলচৌকির উপরে এসে বসলেন আশুবাবু আর রামচরণ সশব্দে তাঁর গায়ে তেল মর্দন করতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে কে একজন দুখানা কার্ড নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

আশুবাবু বললেন, নিয়ে এসে চেয়ারে বসা।

দুজন ইংরেজ ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হতেই আশুবাবু বললেন, গুডমর্নিং, বসুন।

তারা গুডমর্নিং বলে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখে বলে উঠল, আমরা অসময়ে এসে পড়েছি।

বিলক্ষণ! আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করবার এই আমার সবচেয়ে সুসময়। হাইকোর্টের কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ—আর আমার সময় কোথায়। ওরে রামচরণ, ভাল করে তেলটা মাখা।

তা হোক, তা হোক, আমরা আর একসময় আসবো—বলে গুডমর্নিং জানিয়ে রক্তিম মুখ অধিকতর রক্তিম করে সাহেবরা প্রস্থান করল।

অতুল বলল, স্যার, ওরা হয়তো অসভ্য ভাবল।

আশুবাবু ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা স্বদেশী করবে তবেই হয়েছে। আহারে বিহারে আচারে ব্যবহারে পোশাকে পরিচ্ছদে তোমরা পরানুকরণ করবে তবে স্বদেশীটা রইল কোথায়। আমাদের দেশে স্নানটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠান, নদীর ঘাটে হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষ স্নান করে, আর ওরা স্নান করতে হলে চোরাকুঠুরিতে ঢোকে। যে দেশের যে রীতি। ভালো না লাগে বেটারা এ দেশ ছেড়ে চলে যাক, কে ঠেকাচ্ছে। আমি বিদ্যাসাগরী স্বদেশী, বিদ্যাসাগর লাটসাহেবের বাড়িতেও যেতেন চটি চাদর পরে, তাতে তাঁর সম্মান কমেছিল না বেড়েছিল। স্বদেশীতে ও বেল্লাপনা ছেড়ে দাও।

কেন স্যার, রবি ঠাকুরও তো ব্রাহ্ম, তিনি তো ধুতি চাদর ছাড়া পরেন না।

কে বললে রবি ঠাকুর ব্রাহ্ম। পীরিলি বলে জাতে ঠেকা হয়ে আছে, নইলে দেবেন ঠাকুর হিন্দুর বাবা, উপনিষদ ছাড়া এক পা চলেন না।

রাগ করলেন স্যার?

রাগ নয় বাবা, বড় দুঃখে বলনাম। আমাদের মনটা হয়ে গিয়েছে বিদেশী, মাঝে মাঝে মুখে স্বদেশী স্বদেশী বললেই কি স্বদেশী করা হবে।

ছেলেরা বলল, আপনি যে রকম আদেশ করবেন তা-ই করব।

তবে যাও, কলেজ বিল্ডিং তৈরি হলে একখানা দরখাস্ত নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি নিজে প্রিন্সিপাল স্থির করে দেবো। অবিনাশবাবুকে প্রিন্সিপাল করা চলবে না, নিয়মে বাধবে, উনি থাকবেন স্কুলের হেডমাস্টার আর কলেজের রেক্টার। ওঁকে ছেড়ো না, ওঁর জুড়ি নেই বাংলাদেশে। শচীন, তুমি যেন ওখানে গিয়ে জুটো না, তোমার কর্মস্থল কলকাতায়। আর অতুল, তুমি হীরের টুকরো, তোমার ওখানে বেশি দিন থাকা চলবে না, শীগগিরই ওকালতির পসার নিয়ে কলকাতায় আসতে হবে। যাও, বুঝলে তো।

যুবকেরা প্রণাম করে প্রস্থান করতে উদ্যত, এমন সময়ে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

কী খবর পাঁচকড়িবাবু?

আজ্ঞে পাঁচকড়ি তো সুসংবাদ ছাড়া আসে না। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ করা স্থির হয়ে গেছে—আজকার গেজেটের খবর।

ওরে কে আছিস, পাঁচকড়িবাবু আর ছেলেদের জন্য সন্দেশ নিয়ে আয়। সত্যি সুসংবাদ। এ বারে ফাটল ধরলো ব্যাটাদের রাজত্বে। বাবারা মিষ্টিমুখ না করে যেয়ো না।

বারো

"অলবেঙ্গল লোন অফিসের" প্রধান আড্ডাধারী তারাচরণ উকীল একজন গীতোক্ত নিষ্কাম পুরুষ। তিনি অর্থোপার্জন করেন, ভোগ করেন না; পরের অপকার করেন, কার অপকার হল তাকিয়ে দেখেন না; তাঁর শত্রুমিত্র কেহ নাই, সকলের সম্বন্ধেই তিনি নির্বিকার। যেদিন আদালতে ১৫২ টাকা সাড়ে তেরো আনা রোজগার হল, বাড়ি ফিরবার আগে দেড়শো টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দু'টাকা সাড়ে তেরো আনা নিয়ে গিয়ে গিন্নীর হাতে দেন, বলেন আর ব্যবসা চলল না, যতসব ছোকরা উকীল এসে বসেছে, দু টাকা ফিসে সেসন কেস করে বুড়োদের আর কেউ ঘেঁষতে চায় না, আমি তো তবু দু'টাকা সাড়ে তেরো আনা পেয়েছি অথচ যে ডাকসাইটে উকীল ভবানীগোবিন্দবাবু তার আজ অদ্যভোক্ষ্য ধনুর্গুণঃ—বলে গিন্নীর মুখের কাছে হাতখানা নেড়ে দিয়ে দ্রুত চলে যান কাছারির পোশাক ছাড়তে।

তাঁর পাশে বসেছিল হরিপদ উকীল, স্বভাবচরিত্রে তিনি তারাচরণবাবুর বিপরীত। লোকটা ভোগ করে অপরের খরচায়; পরোপকার করে প্রত্যুপকারের দ্বিগুণ আশা দেখান। আজকার আড্ডায় এই দু'টি মাত্র সভ্য উপস্থিত ছিল।

তারাচরণবাবু বললেন, হরিপদ, এই দেখো শহরে আর এক নতুন উৎপাত এসে জুটলো।

হ্যাঁ, একটা সার্কাসের দল এসে জুটেছে।

আরে সার্কাস কোথায়। তবে এক হিসাবে সার্কাস বইকি। আর ঐ যে দেখতে দেখতে স্বদেশী ইস্কুলের পাশে এক স্বদেশী কলেজ খাড়া হতে চলল।

মন্দ কী।

মন্দ নয়। বছরে বছরে কতকগুলো ি এ পয়দা হবে, তারাই আবার তিন-চাব বছর পরে উকীল হয়ে বসবে। পারবে হরিপদ ছোকরা উকীলদের সঙ্গে পাল্লা দিতে, ওরা দু-মাইল পথ হেঁটে এগিয়ে গিয়ে মক্কেল ধরে।

ছোকরার দল নাকি আশু মুখুজ্জেকে গিয়ে ধরেছিল, তিনি নাকি আশীর্বাদ করেছেন।

তিনি তো আশীর্বাদ করেই খালাস, নিজে তো হাইকোর্টের জজ হয়ে বসেছেন, তাঁর তো রোজগারের চিন্তা নেই।

হরিপদ বলল, কিন্তু দাদা, ছোকরার দল হঠাৎ এত টাকা পেলো কোথায়?

ওরা নাকি বলেছে কলকাতার কোন বড়লোক ওদের সাহায্য করেছে।

আরে বাপু আসল কথা ঢাকবার জন্যে ঐ রকম একটা কিছু না বলে উপায় কি?

আসল কথাটা শুনবার আশায় আগ্রহভরে হরিপদ তাকালো বক্তার মুখের দিকে।

শুনবে? তবে আরো এগিয়ে এসো।

তখন গলা যতদূর সম্ভব খাটো করে তারাচরণবাবু বললেন, এসব স্বদেশী ডাকাতির টাকা। শুনেছ তো, এবারে ভুলে যাও, দুই কান কোরো না, ওরা বাবা কাঁচাখেকো দেবতা।

বলাবাহুল্য তখনো স্বদেশী ডাকাতি আরম্ভ হয়নি, সম্ভাবনাটা ছিল তারাচরণবাবুর কল্পনায়।

অর্থোপার্জনের যে এমন সহজ একটা উপায় আছে জেনে হরিপদর চোখ দুটো চকচক করে উঠল, ভাবটা এই যে বিধাতা উপায়ের কতই না পথ খুলে রেখেছেন, আর হতভাগ্য হরিপদ মক্কেল চুষে খাওয়া ছাড়া আর কিছু জানে না।

বলেন কী দাদা!

না, কিছুই বলিনি। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার ইচ্ছায় তারাচরণবাবু বললেন, এ বারে পদ্মায়, শহরের নীচেই পদ্মা, যেমন চর পড়ছে গরমের সময়ে বোধ করি এ পার ও পার একশা হয়ে যাবে, বর্ষায় আর জল আসবে না, কি বলো?

পদ্মায় জল না এলে তারাচরণবাবুর কোন ব্যক্তিগত ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবে যে সার্বিক অপকার হবে তাতেই তার আনন্দ। এই হচ্ছে নিরাসক্ত অপকারীর লক্ষণ।

কী, উঠলে নাকি?

হাঁ দাদা, আজ তাড়া আছে, উঠি।

চলো তবে আমিও বের হই—আজ তো আর কেউ এল না।

তারপরে একটু থেমে বলল, আর আসবেই বা কেন? কারো কিছু রোজগার আছে কি?

পথে বের হয়ে তারাচরণবাবু বললেন, আরে শুনেছ, এ দিকে যে অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে।

বর কোথাকার?

বর যেখানকার খুশি হোক, এই বাজারে মাস্টার হয়ে বিয়ের টাকা জোটায় কোত্থেকে ভেবেছ!

ছাত্ররা কেউ ধারধোর দিয়ে থাকবে।

ছাত্ররা সব রাজপুত্র আর কি।

তবে?

ঐ যে বললাম সেই টাকার ভাগ।

কিন্তু অবিনাশবাবু কি—

নাঃ, অবিনাশবাবু বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছেন! এই বলে মুখ এমন ভয়ানক বিকৃত করে উঠলেন যে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও চোখ এড়ালো না হরিপদর।

বুঝলে হে হরিপদ, ভিতরে ভিতরে সবাই সমান। "উপরে মালা ঠকঠক, ভিতরে বোতল ঢকঢক।" ওকালতি করলেই হয় না, চারদিকে চোখ কান খোলা রাখতে হয়। নাও, এখন চলো।

তারাচরণবাবু সন্ধানী লোক, তাঁর বিবৃত দুটি সংবাদই সত্য, কলেজ স্থাপনা ও অবিনাশবাবুর মেয়ের পাত্রানুসন্ধান।

আশুতোষের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে যুবকেরা ফিরে এসে কলেজবাড়ি তৈরির কাজে হাত দিল, দেখলো আশুবাবুর কথা মিথ্যে নয়, শহরে কলেজ হবে, স্বয়ং আশু মুখুজ্জে তার পৃষ্ঠপোষক শুনে টাকা দিতে কেউ দ্বিধা করলো না, অনেকের কাছেই আশাতিরিক্ত পাওয়া গেল—তখন স্বদেশীর হাওয়া।

আগামী ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কায়েম হবে, সেদিন কাজকর্ম বন্ধ। আগের দিন কলেজ তৈরির কাজ শেষ করতে হবে, ১৭ই অক্টোবর হবে আনুষ্ঠানিক গৃহপ্রবেশ—প্রথম স্বদেশী কলেজ। জোর কাজ চলছে, অনেক সময়ে রাতের বেলাতেও। শহরের অধিকাংশ লোকে খুশি।

মিঃ ক্রোজেট বলল, রায়বাহাদুর, শহরে নাকি একটা স্বদেশী কলেজ হচ্ছে?

তাই তো শুনছি হুজুর।

টাকা দিচ্ছে কে?

লোকেরা।

পিস্! লোকেরা এত টাকা পায় কোথায়? নিশ্চয় তারা ইনকাম ট্যাক্স দেয় না, নয় চুরি করে।

তা তো জানি নে, তবে শুনছি আশু মুখুজ্জে নাকি উৎসাহ দিয়েছেন।

সেই লোকটা যাকে তোমরা বেঙ্গল টাইগার বলে থাকো?

তারপরে হাতে পাইপটা নাচাতে নাচাতে বলল, জানো রায়বাহাদুর, আমি খুব ভালো টাইগার শুট করতে পারি।

রায়বাহাদুর মনে মনে চান, যাও না একবার। মুখে চুপ করে থাকে।

হুম্ খবরটা নিতে হচ্ছে। এত টাকা আসে কোথা থেকে। খবরটা নিয়ো রায়বাহাদুর।

আচ্ছা হুজুর, বলে সেলাম করে বিদায় নেন রায়বাহাদুর।

তারাচরণবাবুর দ্বিতীয় সংবাদটাও মিথ্যা নয়—সত্যই অবিনাশবাবুর কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান চলছে। স্বভাব-অপকারীর সংবাদ প্রায় মিথ্যা হয় না।

স্বদেশী স্কুলের শিক্ষকদের সকলেই অবিনাশবাবুর ছাত্র, অন্তঃপুরে তাদের অবাধ প্রবেশ।

একদিন অবিনাশবাবুর স্ত্রী বললেন, বাবা অতুল, রুক্মিণীর বয়স চোদ্দো হল, ওঁর তো হুঁশ নেই, দিবারাত্রি স্কুল নিয়ে পড়ে আছেন।

অতুল বলল, মা, আমরা থাকতে মাস্টারমশাই কেন এ চিন্তা করতে যাবেন। আপনি চিন্তিত হবেন না, রুক্মিণীর এমন বর জুটিয়ে দেব, যাকে বলে বর।

তোমরাই ভরসা বাবা, স্বভাবত সংক্ষেপভাষিণী অবিনাশবাবুর স্ত্রী বললেন।

যুবকেরা নিজেদের মধ্যে স্থির করলো কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে প্রথম যে দিন বিবাহের দিন পাওয়া যাবে সেই দিনের রুক্মিণীর বিয়ে দিতে হবে।

একজন হেসে বলল, প্রথম স্বদেশী বিয়ে।

টাকার চিন্তা যেন মাস্টার মশাইকে না করতে হয়।

পরে যখন কথাটা নবীন মহাজনের কানে গেল সে বলেছিল, মাস্টারবাবুর মেয়ের বিয়ে আর আপনারা ভাবছেন টাকার জন্যে। বলি এই বুড়ো নবীন আছে কি করতে?

অতুল মনে মনে ভাবলো মহাজন শব্দের সার্থকতা এখনো দু-এক ক্ষেত্রে আছে তা হলে।

সকলে পাত্রের সন্ধানে চোখ কান খুলে রাখলো।

তেরো

১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ সাল। কলকাতা শহরে, সমগ্র বাংলাদেশের শহরে, বন্দরে, গ্রামে গঞ্জে পল্লীতে পল্লীতে হাটে বাজারে প্রান্তরে কান্তারে পথে ঘাটে সর্বত্র স্তম্ভিত নীরবতা। দোকান-পাট বন্ধ, যানবাহন স্থগিত, স্কুলে কলেজে ছাত্র নাই, টোলে চতুষ্পাঠীতে পড়ুয়া নাই, পথে ফিরিওয়ালা নাই, গৃহস্থবাড়িতে উনুনে আগুন নাই—অরন্ধন; শিশু ও রোগী ছাড়া সকলের উপবাস বিধেয়। কেবল নদীর ঘাটে ঘাটে কাতারে কাতারে স্নানার্থী নরনারী, ধনী দরিদ্রে অভিন্ন হাজার হাজার।

সমস্ত দেশে এমন বিধান কার আদেশে বিহিত হল। সেখানে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার ছিল না, তারের সংবাদ নয়, ডাকের সংবাদ নয়, তবে কোথা থেকে এলো সর্বব্যাপী আদেশ! মানুষের মন যখন একই ভাবতরঙ্গে আন্দোলিত হয়; একই ভাবনায় ভাবিত হয়, একই উত্তেজনায় উত্তেজিত হয় তখন বিদ্যুৎ-তরঙ্গে একই ক্রিয়া কাজ করে। বাংলাদেশ আজ একই বেদনায় ব্যথিত।

কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে হাজারে হাজারে নরনারী স্নান সমাপন করে উঠছে, উঠছে, উঠছে, আর পরস্পরের হাতে "ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই" বলে হলদে রঙের রাখী বেঁধে দিচ্ছে। কে জোগান দিল এত অসংখ্য রাখী। তার পরে সকলে রাখীর গোছা নিয়ে পথে পথে চলল, পরিচিত অপরিচিত যাকে পেলে বেঁধে দিল

রাখী, মন্ত্রোচ্চারণ করলো ভাই ভাই এক ঠাঁই। আজ উচ্চনীচ বিচার নাই, বিচার নাই হিন্দু-মুসলমান। বড় মসজিদে ঢুকে রাখী বাঁধল, গীর্জায় ঢুকে বাঁধল রাখী, ভিক্ষুককে কাছে টেনে নিয়ে বেঁধে দিল রাখী। আর গেরুয়া উষ্ণীষধারী গায়কের দল—সম্মুখে পিছনে গান করে চলেছে, "বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।"

কলকাতার দৃশ্য বাংলাদেশের সর্বত্র। শহরে গ্রামে গঞ্জে নদীর ঘাটে ব্রতের স্নান আর রাখীবন্ধন। যেখানে নদী নাই, বাংলার কোথায় আর নদী নাই, পুকুরে দীঘিতে স্নানের বিধান, স্নান আর রাখীবন্ধন, রাখীবন্ধন আর গেরুয়া উষ্ণীষধারীর রাখী-সঙ্গীত। সমস্ত আজ এক মন্ত্র, এক তন্ত্র, এক সংহতি।

এক দল গান করছে, আর এক দল গেরুয়া ঝুলিতে চাঁদা সাধছে। সাধতে বড় হচ্ছে না, যে যা পারে অকাতরে ফেলে দিচ্ছে ঝুলিতে, ভিক্ষুকের পাইপয়সা থেকে মধ্যবিত্তের টাকা আর ধনীর মোহর একত্রে শব্দিত হচ্ছে। পথ এবং সভাস্থলে সর্বত্র চাঁদা সংগ্রহ। বাগবাজারে পশুপতি বোসের বাড়ির একটা সভাতেই উঠল সত্তর হাজার টাকা।

সকালবেলায় স্নান, গান আর চাঁদাসংগ্রহ, বিকালে সভার আয়োজন। উত্তর কলকাতায় পশুপতি বোসের বাড়ির হাতার মধ্যে সভা, প্রধান বক্তা রবি ঠাকুর। মধ্য কলকাতায় আপার সার্কুলার রোডে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাবী মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠার সভা, প্রধান বক্তা আনন্দমোহন বসু—আর পশ্চিম কলকাতার সভা টাউন হলে। প্রধান বক্তা সুরেন বাঁড়ুজ্জে, বিপিন পাল, আর রাসবিহারী ঘোষ।

সভায় এত লোক যে বিরাট হলের মধ্যে আর ধরে না, সভাস্থল উপচে পড়ে বাইরে সিঁড়ির উপরে ও রাস্তায় জমে গেল বৃহত্তর সভা, অধিকতর লোকসঙ্গম। শেষ পর্যন্ত বাইরের সভাটাই জমল বেশি। সুরেন বাঁড়ুজ্জের পল্লবিত ইংরাজী আর কজনে বুঝবে, কজনে বুঝবে রাসবিহারী ঘোষে সূক্ষ্ম যুক্তিজাল, আর বিপিন পালের বাংলা ইংরাজীর প্রায় দোসর। সমস্তই সাধারণের অনধিগম্য। সবাই যখন ভাবছে বাইরের সভায় কে বক্তৃতা করবে, কোথা থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল টহলরাম গঙ্গারাম। গোলদীঘির নিয়মিত বক্তা হিসাবে লোকটা অনেকের কাছেই পরিচিত।

টহলরাম গঙ্গারাম খাস পেশবাটী আদমি, ডেরা ইসমাইল খাঁর অধিবাসী, লম্বায় সাড়ে ছয় ফুট, চেয়ারের তিন ফুটের সঙ্গে মিলে দাঁড়ায় প্রায় দশ ফুট, সকলেরই চোখে দৃশ্যমান। এই বিরাট মূর্তি দেখতে পেয়ে সকলে হাততালি দিয়ে উঠল—বলল টহলরাম গঙ্গারামজী। তার হিন্দীর সঙ্গে মেশানো ভাঙা ভাঙা বাংলা বিশেষ বাংলা গালাগালি আর প্রয়োজনস্থলে দু-চারটি ইংরাজী সকলের বিশেষ রুচিকর হল, সবাই চেঁচিয়ে বলল, শুরু কর দিজিয়ে। টহলরাম গঙ্গারাম শুরু করল।

ভাই বেরাদার সব, তোমরা বিলায়েত দেশটার শুধু নামটাই শুনেছ, আমি আঁখ সে দেখে এসেছি ঐ শালালোগোকো মুল্লুক। দুনিয়ায় যদি দোজোখ থাকে তবে সে ঐ বিলায়েত মুল্লুক, আমাদের হিন্দুস্থানে ছে ঋতু, আর শালাদের দেশে দো ঋতু, বর্ষাৎ আর জাড়। আর সব শালা বিলায়েতি আদমি—সব শালা শয়তান।

এমন রুচিকর উক্তি লোকের হৃদ্য না হয়ে পারে না, তারা বারে বারে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগলো।

আরে বেরাদার, আমি আই সি এস পরীক্ষায় পাস করেছিলাম, কিন্তু শালাদের সম্বন্ধে সচ বাৎ বলতাম যেমন এখন বলছি, তাও আবার নিজের কামরায় বসে নয়—লন্ডন শহরে হাইড পার্ক বলে এক ময়দান আছে, আমাদের গড়ের ময়দান সে ভি বড়া, সেখানে বলতাম, তাই শালারা আমাকে ফেল করিয়ে দিল। বহুৎ কিয়েসে তাই তো শালাদের গাল দেওয়ার সুযোগ মিলে গিয়েছে। শালালোগ সমঝে না যাদের আই সি এস ফেল করাবে তারাই ওদের দুশমন হবে। ও দেশের বাচ্চা বুঢ্ঢা সবভি দুশমন। জাত ব্যবসায় শালারা বেনে—বেনে দুশমন সব দুশমনের বুরা। ওই সব বেনে দুশমনকে তোমরা গান গেয়ে গাল দিয়ে তাড়াবে! তবেই হয়েছে। হারামজাদারা জানে পরের দেশ লুট করতে গেলে গাল খেতে হোবে, মাঝে মাঝে লাঠি ভি খেতে হোবে। ও সব জেনেশুনেই তারা হিন্দুস্থানে এসেছে। তোমরা গান গাইছ, গাল দিচ্ছ, শুনে হারামজাদারা ক্লাবে বসে হাসছে আর পেগ টানছে। ও মতলব ছোড় দো—অন্য মতলব ভাঁজো।

জনতা প্রশ্ন করলো, আর কি মতলব আছে?

শালাদের বেবশায়ে মারো লাথ।

এই বলে চেয়ারে পদাঘাত করলো। জনতা প্রশ্নের সদুত্তর পেয়ে মাটিতে পদাঘাত করলো।

কে একজন বলে উঠলো, 'মারো লাথ হবে কাৎ আসর মাত।'

সবাই হেসে উঠলো। হাসলো না কেবল টহলরাম গঙ্গারাম। সে বলল, বঙ্গাল কে আদমিকা ঐ দোষ, ভাবে কবিৎ করলেই কাম হাসিল হল। আরে ইয়ার ঐ শালার দেশে সেক্সপীয়র নামে একটা লোক কবিৎ কিয়েছে, পারবে তার সঙ্গে কবিৎ করতে, তবে! ও পথ ছোড়ো।

আর কী পথ আছে? ওরাই যে সরকার।

আরে বেরাদার যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান। আর সরকার কে? জজ ম্যাজিস্ট্রেট বড়লাট ছোটলাট। রাম কহো। আসলে সরকার আংরেজ সদাগর, জিসকো মার্চেন্ট কহা যাতা। ঐ শালারা যা ফরমায় জজ ম্যাজিস্ট্রেট ছোটলাট বড়লাট সেই মাফিক আইন বাতলায়।

কী করতে হবে বলুন।

টহলরাম গঙ্গারাম হেঁকে ওঠে, বয়কট করনে পড়ে গা, বয়কট।

বয়কট আবার কী? অনেকে শুধায়।

বয়কট জানতা নেহি! বিলায়েতি ধোতি শাড়ি কাপড়া মৎ পিনহো, বিলায়েতি নিমক শক্কর মাৎ খাও—ইসিকা নাম বয়কট। বানিয়া শালাকো বেসাতি মে মারো চোট—তব শালালোগ will beg for mercy! হাত জোড় করে বলবে বহুৎ হুয়া, খুব হুয়া। ও শালা দেশ ছোড়কে ভাগ যায়েগা—বিলায়েত কা মাল বিলায়েত মে চলা যায়েগা।

ইংরেজ তাড়াবার সহজ পন্থা শুনে শ্রোতারা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে ওঠে। সে আওয়াজ এত জোর হয় যে কী হল কী হল বলে টাউন হলের ভিতরের শ্রোতার দল বাইরে ছুটে আসে। সভার বর্ধিত আয়তন দেখে আনন্দে টহলরাম গঙ্গারাম হিন্দি বাংলা ইংরাজি

মিশিয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলে—সে বক্তৃতা নিছক শকার-বকার, ইংরেজের বাপান্ত।

সমস্ত বাংলাদেশ যখন এই ভাবে উথাল-পাথাল সিমলা শৈল অচল অটল। সেই উত্তুঙ্গ আসন থেকে বড়লাটের ফরমান চলে যায় যাবতীয় ছোটলাটের কাছে—যতক্ষণ গান গঙ্গাস্নান গলাবাজি আর গেরুয়া পাগড়ি কিছু করবার দরকার নেই, এমন কী বন্দেমাতরম্ সংগীত সম্বন্ধেও উদাসীন থাকবে, বড়লাটের আদেশের মূল সূত্র এই যে wait and see, দেখ কতদূর কী হয়। প্রয়োজন হলে যথোচিত ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা হাতে তো আছেই।

কলকাতায় বৃহৎ আকারে যা ঘটছিল তারই অনুরূপ তবে ক্ষুদ্রতর আকারে ঘটলো দিনাজশাহী শহরে। গান, গঙ্গাস্নান, গলাবাজি আর গেরুয়া পাগড়ি ধারণ। এসব স্থলে কি রকম ব্যবস্থা করবে তার একটা ব্যক্তিগত পরিকল্পনা করে রেখেছিল মিঃ ক্রোজেট। এমন সময় বড়লাটের wait and see আদেশ হাতে পৌঁছতেই লোকটা টেবিলে প্রচণ্ড এক কিল মেরে বলে উঠলো বৃটিশ সাম্রাজ্য অধঃপাতে যাক। কিন্তু আপাতত বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার অন্য কোনো উপায় না দেখে ম্যাজিস্ট্রেটগণের শেষ আশাভরসার স্থল confidential report-এর খাতাখানা খুলে বসলো আর জ্বালাময়ী লাভার স্রোত উদ্‌গীরণ করতে করতে সবেগে ছুটলো তার লেখনী।

"রায়বাহাদুর যজ্‌নেশ (যজ্ঞেশ) রায় অপদার্থ আর আস্ত একটি ভোঁদড়। দেখা করতে এসে হুজুর হুজুর করবে, কাজের কাজ কিছু নেই। দুটো খাস খবর জোগাড় করে আনতে পারে না। এ সব লোককে কেন যে উচ্চ পদবী দেওয়া হয় কলকাতার প্রভুরাই জানেন। নজর রাখতে হবে লোকটা আর উচ্চতর পদবী না পায়।···হরিপদ রায় উকীল আমার মনের মতো লোক, আসবার সময় অনেক খাস খবর নিয়ে আসে, সরকারের একান্ত অনুগত। অথচ এই লোকটা এখনো সরকারের কোনো অনুগ্রহ পায়নি। কলকাতার কর্তাদের মাপকাঠিখানাই আলাদা। হরিপদর সঙ্গে আমার মতে মেলে। শহরের যাবতীয় সোয়াডেসি (স্বদেশী) হাঙ্গামার মূলে আছে ঐ জ্যান্ত শয়তান অবিনাশমাস্টার। হরিপদ বলে লোকটাকে তাড়াতে না পারলে শহর শান্ত হবে না। আমিও তা-ই চাই। কিন্তু তার উপরে নাকি জুলুম করা চলবে না বলে হরিপদ, তাতে নাকি শহর আরো ক্ষেপে যাবে। আরে শহরের ক্ষ্যাপামিকে থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু কী করব—বড়কর্তার হুকুম wait and see! আচ্ছা দেখা যাক জুলুম না করে আর কোনো উপায় বের করা যায় কি না। উর্বরা মস্তিষ্ক ঐ হরিপদ, ও ঠিক পারবে।···God save the king।" খাতাখানা সজোরে বন্ধ করে বলে, আবদুল, শীগগির গিয়ে হরিপদ উকীলকে সেলাম দিয়ে এসো, আর তার আগে একটা ব্রান্ডি সোডা দিয়ে যেতে ভুল যেন না হয়।

চোদ্দো

পরদিনে বাংলাদেশের বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত বাংলা ইংরাজী ছোট বড় সমস্ত সংবাদপত্রে ১৬ই অক্টোবরের ঘটনা ফলাও ভাবে প্রকাশিত হল। সবচেয়ে গুরুত্ব পেল টাউন হলের সভার বিবরণ। তন্মধ্যে আবার টহলরাম গঙ্গারামের বক্তৃতা। এখানে হিতভাষী নামে বহুপ্রচার সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ উদ্ধৃত হল।

হিতভাষী

১লা কার্তিক, ১৩১২, ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫

শিমলার শীতল শৈলশিখর নিবাসী প্রভুগণ একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিবেন কি সুবে বাংলায় কি ঘটিতেছে। বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিম সীমান্ত, দক্ষিণ সীমান্ত হইতে উত্তর সীমান্ত আজ উদ্বেলিত। আগস্ট মাস হইতে ১৬ই অক্টোবরের মধ্যে অন্ততঃ দুই হাজার জনসভা, শ্রোতার সংখ্যা পাঁচ শত হইতে পঞ্চাশ হাজার এক দাবী উত্থাপন করিয়াছে—আমরা মানিব না। প্রভুদের মর্জি ও স্বার্থ মাফিক মানচিত্রের উপরে ছুরির ফলা দিয়া দাগ টানিয়া দিলেই কি রক্তের সম্বন্ধ ভিন্ন হইয়া যায়? মানুষ কি গুদামের মাল? তাহার কি হৃদয় নাই, তাহার নাড়ীর টান নাই, তাহার কি রক্তের সম্বন্ধ নাই, তাহার কি আত্মীয়তাবোধ নাই? হায়, এই মূল সত্য, এই স্থূল কথাটি যাহারা বোঝে না তাহারাই দেশের শাসক। তাহারা শক্তিমান হইতে পারে কিন্তু বিধাতার চেয়ে নিশ্চয়ই শক্তিমান নয়! কবি সত্যই বলিয়াছেন, 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, মান কি তুমি এমন শক্তিমান!' ক্ষুদ্র মানুষ যখন নিজেকে বিধাতার চেয়ে শক্তিমান মনে করে, তখন সত্যই তাহার দুঃসময়। আজ সত্যই শাসকগণের দুঃসময়, কেননা, তাহারা গায়ের জোরে বিধাতার সিংহাসন দখল করিবার হাস্যকর চেষ্টায় নিযুক্ত। মানি তাহাদের গায়ের জোর আছে—কিন্তু আমরাও দুর্বল নহি। আবার কবির ভাষায় বলি—'শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরো, হও না যতই বড়, আছেন ভগবান।' দেশবাসী নিষ্ক্রিয় ভাবে ভগবানের উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া পড়িয়া থাকিবে না। ভগবানের নির্দেশে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিবে। প্রভুগণের জুলুম বোধ করি ভালোর জন্যই, প্রভুর প্রসাদ প্রত্যাশার অপমান হইতে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে আমাদের বাধ্য করিয়াছে। এই যে আগুন জ্বলিল, অচির-কাল মধ্যে ইহা দাবানলে পরিণত হইয়া যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না সেই সাম্রাজ্যের অন্ত্যেষ্টি সৎকার করিবে। 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।' আজ হইতে পঞ্চাশ বছর কালের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। জাতির জীবনে পঞ্চাশ বছর কাল বেশি সময় নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে মুহূর্তমাত্র। এখন দেশবাসীর কর্তব্য কি? গঙ্গাস্নান রাখীবন্ধন তো হইল, ইহা শেষ নয় সূচনামাত্র। এখন সকলকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। শ্রীটহলরাম গঙ্গারাম অগ্নিময়ী ভাষায় সেই পথের নির্দেশ করিয়াছেন। বিলাতী পণ্য বিশেষ ভাবে বিলাতী কাপড়, চিনি ও নুন সম্বন্ধে বয়কট বা বর্জননীতি গ্রহণ করিলে প্রভুদের চক্ষু খুলিবে। প্রভুরা এ দেশে শাসকরূপে দেখা দিলেও আসলে বেনিয়ার জাত। বেনিয়ার বেসাতিতে হাত পড়িলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে, কারণ প্রভুরা পরাধীন জাতির কথায় কর্ণপাত না করিলেও নিজের দেশের লোকের কথা না শুনিয়া পারিবে না। যখন সে দেশের লোকে দেখিবে ভারতে আর তাহাদের তৈয়ারি বস্ত্র, শর্করা ও লবণ বিকায় না তখন প্রভুদের গলা টিপিয়া ধরিবে—আর অমনি মিহি সুর বাহির হইবে, তোমরা যাহা চাও তাহাই করিব, ভাইসব আমাদের ভোট দিতে ভুলিও না। শ্রীটহলরাম গঙ্গারামের নির্দিষ্ট পন্থাই আমাদের মুক্তির পন্থা, এখন হইতে আমাদের মূল মন্ত্র অন্তরে বন্দেমাতরম্, বাহিরে বয়কট। সমগ্র দেশে ধ্বনিত হউক বন্দেমাতরম্ ও বয়কট।

হিতভাষীতে এই জ্বালাময় প্রবন্ধ বের হলে দেশের ছোট বড় সমস্ত দেশী কাগজ ঐ সুরে সুর ধরল—মূল বক্তব্য বন্দেমাতরম্ ও বয়কট, মুখে বন্দেমাতরম্ হাতে বয়কট। সমস্ত কাগজ যখন ঐ সুর ধরল কাজেই লীডারগণও ঐ সুর ধরতে বাধ্য হলেন। লীডারগণ আসলে ফলোয়ার। যিনি যত নিপুণ ফলোয়ার তিনি তত বড় লীডার। এখন বন্দেমাতরম্ ও বয়কট জনসভার একমাত্র বক্তব্য।

একদিন রিপন কলেজে সুরেন্দ্রবাবুর খাস কামরায় শচীন ও কয়েকজন তরুণ অধ্যাপকের ডাক পড়ল। তারা প্রবেশ করলে সুরেনবাবু বললেন, তোমরা বস, অনেক কথা আছে।

রিপন কলেজ সুরেন্দ্রবাবুর কলেজ, তিনি সর্বময় কর্তা।

সুরেন্দ্রবাবু বললেন, দেখো হে শচীন এখন থেকে আমাদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে বয়কটকে স্থান দিতে হবে নইলে আর চলছে না।

শচীন সুরেন্দ্রবাবুর প্রিয় ছাত্র। রিপন কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। তারপর এম এ পরীক্ষাতেও যখন ফার্স্ট হল সুরেন্দ্রবাবু তাকে ডেকে আনিয়ে চাকুরি দিলেন। শচীনের খোলাখুলি কথা বলবার অধিকার ছিল। সে বলল, স্যার, বয়কট আরম্ভ হলেই সরকার পক্ষ থেকে জুলুম শুরু হবে, লোকে কি এতটা সইতে পারবে, শেষকালে না ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

সুরেন্দ্রবাবু বললেন, তোমার কথা একেবারে মিথ্যা নয়। ওটা আমার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল, তবে ভেবেছিলাম ততদূর যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, আন্দোলনেই সরকারের মত বদলাবে। কিন্তু লোকে যখন চাইছে—

বলে সমস্ত সম্ভাবনাকে ইঙ্গিতে রেখে দিলেন।

তারপরে বললেন, তবে কী জানো ইংরেজ জাতটা আইনের দাস, যে আইন তারা স্বহস্তে তৈরি করে শেষ পর্যন্ত তারই কাছে দাসখত লিখে দেয়। তবে লোকে যদি নিরুপদ্রব ভাবে অনুরোধ উপরোধ দ্বারা বিদেশী জিনিস কেনা থেকে খরিদ্দারকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ আইনে তাদের উপরে জুলুম করবে!

কিন্তু স্যার, শেষ পর্যন্ত এ রকম অবস্থা প্রায়ই নিরুপদ্রব থাকে না।

সে কথাও মিথ্যা নয়। বিলাতি পণ্য কাটছে না দেখলে সরকার পক্ষ লোক ঢুকিয়ে দিয়ে একটা গোলমাল বাধাবে আর তখন শুরু হয়ে যাবে জুলুম।

আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।

আমিও জানি তবে লোক যখন চাইছে—

আবার সম্ভাবনাকে ভবিতব্যের হাতে সমর্পণ।

অন্য সব তরুণ অধ্যাপক শচীনের সাহস দেখে বিস্মিত হয়, দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সমানে সমানে তর্ক, ভাবে হবেই বা না কেন, ওকে ডেকে আনিয়ে চাকুরি দিয়েছেন আর আমরা চাকুরি পেয়েছি জুতোর সুকতলার জোরে, তফাত তো হবেই।

দেখো তোমাদের মতো কয়েকজন তরুণ অধ্যাপককে চাই, তোমাদের প্রধান কাজ হবে স্বদেশী ছোকরার দল দোকানে গিয়ে যাতে উপদ্রব না করে, তাদের শান্ত রাখবার ভার তোমাদের ওপরে। কিন্তু মনে রেখো পুলিশে ধরলে আগে ধরবে তোমাদেরই, তারা চায় উপদ্রব বাধুক।

সকলে নীরব।

মনে রেখো জরিমানা জেল দু-ই হতে পারে। অবশ্য জরিমানার টাকা আমরা দেবো—আর যদি জেলে পাঠায় মাসের শেষে তোমাদের বেতন বাড়িতে ঠিক পৌঁছে যাবে।

স্যার বেতনের কথা ভাবছি না—

আরে তুমি ভাববে না জানি, তোমার বাবার একদিনের আয় তোমার সারা মাসের বেতন। আর তা ছাড়া তুমি তো বাপের ঘরের নামকাটা সেপাই। এরা তো টাকার জন্যে চাকুরি করতে এসেছে।

অধ্যাপকের দল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হল দেখে সুরেন্দ্রবাবু বললেন, লজ্জার কি আছে বাপু, আমিও তো মাসান্তে বেতন নিই। তবে ঐ কথাই ঠিক রইল। আজই যেতে হবে এমন কথা নেই তবে তৈরি থেকো। ঐ বুঝি তোমাদের ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল, আচ্ছা এসো।

বাইরে এসে শচীনের বন্ধু ও সতীর্থ ধ্রুবেশ বলল, কি হে শচীন, জেল পর্যন্ত যাবে নাকি?

আমি না গেলেও জেল যদি এগিয়ে আসে তবে আর না গিয়ে উপায় কি। তবে আপাতত ওটা হাতে রাখলাম।

হঠাৎ এ সংযম কেন?

কারণ ছাড়া কার্য হয় না।

কারণটা শুনতে পাই নাকি?

এই সে দিন একশ টাকা চাঁদা দিলে আর এর মধ্যেই ভুলে গেলে!

বুঝেছি মাস্টারমশাইয়ের মেয়ের বিয়ে।

ধ্রুবেশও অবিনাশবাবুব ছাত্র। কলকাতার ছাত্রসমাজের থেকেই মাস্টারমশায়কে চেনে। মাস্টারমশায় বলতে দিনাজশাহী শহরের হেডমাস্টার অবিনাশ চক্রবর্তী।

রুক্মিণীর জন্য পাত্রের সন্ধান চলছে, আবার টাকার সন্ধানও। ওখানকার অতুল, নৃপেন, পাত্রের সন্ধান করছে, কলকাতায় মাস্টামশায়ের ছাত্রদের টাকা সংগ্রহ করে পাঠাবার ভার আমার উপরে—অবশ্য ওরাও টাকা দেবে।

ধ্রুবেশ হঠাৎ ম্লান হেসে বলল, মাস্টারমশাই তো চিরকাল হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললেন।

দেখো ধ্রুবেশ, লক্ষ্মীকে ঠেলবার দুঃসাহস যাদের, লক্ষ্মী তাদের কৃপা করতে ভোলেন না।

সে রকম দুঃসাহস কজনের?

একজনের হলেই একশোজনের। তাই আগে রুক্মিণীর বিয়েটা হয়ে যাক, ততদিন বঙ্গজননীকে দয়া করে অপেক্ষা করতে হবে। তার পরে জেল জরিমানা দ্বীপান্তর যা হয় হবে।

একেবারে দ্বীপান্তর অবধি?

যে কাল আসছে বলা যায় কি!

তখন নিজ নিজ রেজিস্ট্রি খাতা হাতে করে নিয়ে ক্লাস-ঘর উদ্দেশ্যে চলল তারা।

পনেরো

অল বেঙ্গল লোন অফিসের আড্ডায় নিষ্কাম কর্মযোগীদের সংখ্যা আজ অল্প। উকীল তারাচরণবাবু একমনে গোঁফের একটি চুল টেনে তোলবার চেষ্টা করছে। আর খুদু মৈত্র একটি বৃহৎ সন্দেশকে মুখে পুরে দিয়ে আয়ত্তে আনবার চেষ্টায় নিযুক্ত। এমন সময়ে বীরেন চৌধুরী বিপুল দেহভার টেনে কোনও রকমে উপরে এসে উপস্থিত হতেই প্রথমে চোখে পড়লো খুদু মৈত্রের অসাধ্যসাধন প্রয়াস—বলে উঠল, ওহে খুদু মৈত্র মোর লহ আশীর্ভাষণ, সন্দেশ না বিরহিত হোক কভু তোমার বদন।

সন্দেশটা তখন আয়ত্তে এসেছে, কথা বলবার ফুরসত পেয়েছে, বলল, কবিতা লিখতে শুরু করলে কবে থেকে।

এইমাত্র।

আমি ও-সব বাল্যকালে চুকিয়ে দিয়েছি, ইস্কুলে ছাগলের উপরে কবিতা লিখেছিলাম।

বটে! তা ছাগলাদ্য কবিতাটা মনে থাকলে বলো না শুনি।

আরে মনে থাকবে না কেন, একটাই লিখেছিলাম, শোনো, ছাগল পাগল হল ধান্যক্ষেত্র দেখি, গিয়ে শেষে দেখে বাপ সর্বনাশ এ কি! যষ্টি হস্তে উপবিষ্ট প্রকাণ্ড মালিক, মনসুখে চরিতেছে অজস্র শালিক।

বাঃ বাঃ।

এই বাচালতায় বিরক্ত হয়ে তারাচরণবাবু বলে উঠল, এই তোমাদের পদ্য আওড়াবার সময় হল!

কি করবো দাদা, আজ শূন্য হাতে আদালত থেকে ফিরেছি।

তবে এত আনন্দ আসে কোত্থেকে! ও-সব এখন রাখো। আচ্ছা এই টহলরাম গঙ্গারাম লোকটা কে বলতে পারো?

কেমন করে বলবো?

এই যে একটা বয়কটের ধুয়ো তুলে দিল লোকটা, দোকানে কেনাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়লো। এই দেখো না কেন আজ কৃপারাম মারোয়াড়ীর দোকানে ঢুকতে যাচ্ছি একখানা শাড়ি কিনব বলে হঠাৎ কোথা থেকে দুই ছোকরা এসে হাত জোড় করে বিনীত ভাবে বলল, স্যার, বিলাতী কাপড় কিনবেন না। বেটাদের হাত জোড় করবার ভঙ্গি আর বিনয় দেখলে মনে হয় যেন বাপের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। আমি শুধালাম কেন বাপু।

আজ্ঞে কলকাতা থেকে হুকুম এসেছে।

আরে হুকুমটা দিল কে?

আজ্ঞে টহলরাম গঙ্গারাম, আই সি এস ফেল।

বলি সেটাও কি একটা গুণ হল নাকি?

একটি ছেলে রসিক, সে বলে উঠল, গুণ বইকি স্যার, ততদূর পৌঁছতে পারে কে, তা ছাড়া বিলাত যাওয়া তো আছেই। দেশী শাড়ি কিনুন।

দেশী শাড়ি পাবো কোথায় বাপু?

কেন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে।

শাড়ি তো নয় ছালা, পরে জলে স্নান করতে নামলে আর উঠতে হবে না, ডুবে মরবে যে।

ছোকরা বলে, মনে করবেন সে মৃত্যু দেশের জন্যে।

আমি অন্য যুক্তি দেখালাম, আরে বিলাতী শাড়ি যে সস্তা।

জানি স্যার, মনে করবেন, সে কয়টা পয়সা বঙ্গজননীর ফান্ডে যেন দান করলেন।

বঙ্গজননীর ফান্ডে নয়, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ফান্ডে।

একই কথা হল, পড়েননি ডি. এল. রায় কী বলেছেন—বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে।

আচ্ছা এ-সব যুক্তি ওরা পায় কোথা থেকে?

বীরেন চৌধুরী বলল, যেখান থেকে হুকুম এসেছে। বুঝলেন না দাদা হুকুম আর যুক্তি সমস্ত কলকাতা থেকে চোলাই হয়ে এসেছে। তা তখন কী করলেন? শাড়ি না কিনেই ফিরে এলেন?

আসতাম না, এমন সময়ে কৃপারাম বাইরে এসে হাত জোড় করে বলল, রামজী, দোহাই বিলায়েতি কুছু নাহি বেচেগা।

ছেলেরা খুশি হয়ে কৃপারাম শাহু জয় বলে চিৎকার করতে করতে অন্য দোকানের দিকে চলে গেল, আর তখনই মারোয়াড়ী বেটা ইশারা করে বলল, উকীলবাবু সন্ধ্যার পরে দোকানের খিড়কী দরজায় আসবেন। সন্ধ্যার পরে গিয়ে দেখি সদরের চেয়ে খিড়কীতে ভিড় বেশি। এই তো অবস্থা, তাই জিজ্ঞাসা করছি টহলরাম গঙ্গারাম লোকটা কে?

বীরেন চৌধুরী বলল, ওহে খুদু, তোমার সন্দেশ খাওয়ার দিনও শেষ হয়ে এল। শুধু বিলাতী কাপড় নয়, বিলাতী চিনি ও লবণের উপরেও নিষেধাজ্ঞা।

নির্বিকার খুদু মৈত্র বলল, গুড়ের সন্দেশ আরো ভালো, আর তা ছাড়া সন্দেশের দোকানেও খিড়কী দরজা আছে।

বীরেন চৌধুরী বলল, আমার সন্দেহ লোকটা মারোয়াড়ীদের এজেন্ট। বিলাতী কাপড়ের স্টক জমে গিয়েছিল, এখন হুহু করে বিক্রি হচ্ছে, নিজেই তো দেখে এসেছেন সদর দরজার চেয়ে খিড়কী দরজায় ভীড় বেশি।

আমার মনে হয় সরকারের চর, বলতে বলতে হরিপদ উকীলের প্রবেশ। শেষের দিকের আলোচনা শুনেছে সে।

তুমি যে আবার আর এক ফ্যাকড়া তুললে।

ফ্যাকড়া নয় তারাচরণবাবু এটাই আসল কথা।

বেশ বুঝিয়ে বলো।

এ তো সহজ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনটাকে সরকার রোধ করতে চায়, সবাই একরকম যোগ দিয়েছে। এখন এই বিলাতী বয়কট আরম্ভ হলে ক্ষতির আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা সরে দাঁড়াবে, বেশি দাম দিয়ে দেশী কাপড়, করকচ লবণ কিনতে হলে ক্রমে মুসলমানরাও বিগড়ে যাবে।

বীরেন চৌধুরী বলে, হিন্দুরা থাকবে তো?

আরে হিন্দু হচ্ছে ছাগলের তৃতীয় ছানা। দু'টো তো মায়ের দুধ খায়, তৃতীয়টা তাদের আনন্দ দেখে পেট ভরলো ভেবে লাফায়।

হরিপদ কিছু অসহিষ্ণু ভাবে বললো, ও সব কিছু নয়, ঐ টহলরাম লোকটার গোপনে সরকারী-""হলে যাতায়াত আছে।

বীরেন চৌধুরীর মুখ আলগা, ফস্‌ করে বলে বসলো, সে কথা তো তোমার সম্বন্ধেও লোকে বলতে আরম্ভ করেছে, যখন-তখন তুমি ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে যাতায়াত শুরু করেছো, আর সেখানেও সেই খিড়কি দরজার মহিমা।

হরিপদ কখনও রাগে না। দেবতারা মাঝে মাঝে রাগেন এমন পুরাণে পড়া গিয়েছে। রাগলে শয়তানের ব্যবসা চলে না।

আরে দাদা ম্যাজিস্ট্রেট তো বহুত দূর অস্ত। একটা ডেপুটির দেখা পেলে কৃতার্থ হই।

বীরেন চৌধুরী কম করে বলেছে, হরিপদ এখন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রধান ভরসা। উপর থেকে সরকারী নির্দেশ এসেছে, জুলুম কোরো না, তবে প্রধান প্রধান বদমায়েশগুলোর (সরকারের অসন্তোষভাজন মানেই বদমায়েস) নাম-ধাম ও কীর্তি-কলাপ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করো।

মিঃ ক্রোজেট জানে পুলিশ গোয়েন্দা প্রভৃতির গতিবিধি সীমাবদ্ধ, বিশেষ তারা চিহ্নিত ব্যক্তি, তাদের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করা যায় না। গোপনীয়তম খবর সংগ্রহের জন্য চাই 'রেস্‌পেক্‌টেবল সিটিজেন' যাদের কেউ সন্দেহ করে না অথচ তারা সন্দেহ করবে সকলকেই। ক্রোজেটের ধারণা রায়সাহেব রায়বাহাদুর এই কাজের কাবিল, কিন্তু মুশকিল এই যে ঐ পদবীর দ্বারা তারাও চিহ্নিত, তা ছাড়া এ শহরের সাহেব,—রায়বাহাদুরের দল অপদার্থ, সব চেয়ে বেশি রায়বাহাদুর যজ্‌নেশ (যজ্ঞেশ) রায়।

পুলিশের সূত্রে হরিপদ উকীলের নামটা পেয়েছিল সে। দু-চার দিন নেড়েচেড়ে দেখলো লোকটি সরকারের প্রতি ভক্তিতে আদ্যন্ত নরম।

হরিপদ জানাল, হুজুর এ শহরে সমস্ত স্বদেশী ব্যাপারের নাটের গুরু অবিনাশমাস্টার।

ক্রোজেট পাইপে খানিকটা তামাক ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বললো, হ্যাঁ শুনেছি লোকটা শয়তান।

শয়তান হলে ভাবনা ছিল না হুজুর, লোকটা দেবতাবেশী শয়তান। এ দিকে সাধুতার ভান আছে অথচ একটু বাজালেই মেকি ধরা পড়ে।

লোকটাকে তো জব্দ করা দরকার।

অবশ্যই দরকার, ও জব্দ হলেই শহর জব্দ। কিন্তু পুলিশ লাগালে উল্টো ফল হবে, শহরসুদ্ধ খেপে যাবে।

লোকটার এত প্রভাব!

তা নইলে আর শয়তান কিসের। হুজুরের বাইবেলে কি আছে শয়তানের ভয়ে ভগবান জড়সড়।

ওটা থাক্‌—বলে থামিয়ে দিল হরিপদকে। 'হিণ্ডু'র মুখে বাইবেলের আলোচনা শুনতে রাজী নয় সে, লোকটা গোঁড়া খৃস্টান।

বাবু, ঐ চেয়ারটায় বসো, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ।

সে কী কথা! আমি বসব চেয়ারে, হুজুরের পাপোশে বসবার যোগ্যতাও নেই আমার।

এই বলে ফলভারে নত বৃক্ষের মতো ঈষৎ নত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ম্যাজিস্ট্রেট ভাবে লোকটা ইডিয়ট। ভাবে এইসব লোক দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে হয়। সে জানে না হরিপদ উকীল তাকে এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচতে পারে।

তবে একটা উপায় স্থির করো।

উপায় স্থির করেই রেখেছি। সামনেই অবিনাশ মাস্টারের মেয়ের বিয়ে, এমন কাণ্ড করব যাতে তার জাত যাবে, আর যার ফলে লোকটা শহর ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না।

এখন 'জাত যাওয়া' ব্যাপারটা যেহেতু ভারতের বাইরে অবোধ্য, সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে। হরিপদ বুঝল সাহেব বোঝেনি, ইংরাজি করে বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক, অথচ সেটা তার সাধ্যের মধ্যে নয় কাজেই তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যা জুটল তাই বলে ফেলল, বলল, লোকটা Decasted হবে।

ও শব্দটাও সাহেবের অভিধানে নেই, অথচ নেটিভের কাছে বুঝিনি স্বীকার করা চলে না, তাই বলল, চমৎকার উপায়, তবে দেখো—

হ্যাঁ স্যার, সবদিক বাঁচিয়ে কাজ করবো।

কী হে হরিপদ চুপ করে গেলে যে।

চুপ না করে আর করি কী। এ দিকে দিন চলে না, আর তোমরা বলছো সাহেবতোষণ করছি, মরলে কী সাহেব আমার পিণ্ডি দেবে!

মরলে ঠিক কি করবে জানি না তবে বেঁচে থাকতেই রায়সাহেবী দিতে পারে। ঐ যে ত্রিপদীছন্দ আসছেন।

লাঠি হাতে ঠকঠক করতে করতে অক্ষয় ফৌজদার প্রবেশ করল। দুখানা পা আর লাঠির সুবাদে বীরেন চৌধুরী তার নামকরণ করেছিলো ত্রিপদীছন্দ।

ফৌজদার মশাই বসে একটু দম নিয়ে বলে উঠলো, এদিকে যে অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো।

তবে আর কী, ভাঙচি দিতে লেগে যাও। সে বারে তাজপুরের বিয়েটা ভেঙে দিলে। অবিনাশ মাস্টার তো সামান্য লোক—বললো তারাচরণ।

কোন্ শালা বলে এমন কথা।

শালা সম্বন্ধী ছেড়ে দাও, সবাই জানে।

জানুক আর নাই জানুক অবিনাশমাস্টারের পিছনে লেগো না, ঋষিতুল্য ব্যক্তি, আমাদের শহরের মঙ্গলঘট—এই বলে হরিপদ উদ্দেশে হাত তুলে প্রণাম করল।

ওহে খুদু, সন্দেশগুলো যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে চল উঠি।

চল যাই।

সবাই জানে বাড়িতে নিয়ে গেলে সন্দেশ ভাগাভাগি হয়ে যাবে তাই খুদু পথেঘাটে ও এই আড্ডায় সন্দেশের সদগতি করে থাকে।

ওরা বেরিয়ে গেলে থাকল তিনজন তারাচরণ ও হরিপদ, দুজনেই উকীল, আর রইল

অক্ষয় ফৌজদার। শুধু পায়ে নয় ব্যবসাতেও সে ত্রিপদী। সকালে জমিদারের সেরেস্তায় জমার নবিশ, দুপুরে এক স্কুলে পণ্ডিত, লোকটা কাব্যতীর্থ, সন্ধ্যায় এক ব্যাঙ্কে কেরানী, আর উপরির মধ্যে আছে যথাস্থানে মোসাহেবি। লোকটার প্রতিভা বহুমুখী।

হরিপদ শুধালো, তা পাত্র কোথাকার জানো নাকি?

জানবো না, অবশ্যই জানি, অক্ষয় ফৌজদার না জানে কী ! কার বাড়িতে হাঁড়ি চড়লো, কার বাড়িতে চড়লো না সব খোঁজ রাখি।

আরে বাপু, ভনিতা ছেড়ে কথাটা বলে ফেলো না।

আরে আমাদের নাটোরের উকীল সারদা রায়ের ছেলে অম্বিকা।

সেও তো উকীল, তবে কেবল বসেছে।

তা বসেছে বটে, তবে বাপ পঞ্চাশ বছর বসে যা জমিয়েছে তা আমরা কেউ চোখে দেখা দূরে থাক কানেও শুনিনি।

ফৌজদারে ও হরিপদতে যখন প্রশ্নোত্তর চলছিল তারাচরণ উকীল নির্বিকার ভাবে বসেছিল, নির্বিকার তবে নিষ্কাম নয়, এই ব্যাপার থেকে কিছু ঝোল টানা যায় কি না সন্ধান করছিল।

এ যে হাতের কাছেই ছিল।

হরিপদ ভায়া, যখন থাকবার হয় হাতের কাছেই থাকে, অন্ধকার বলে মনে হয় নেই।

তা আলোটা জ্বাললো কে, অবিনাশ মাস্টারের তো ছেলেপুলে নেই।

ছেলে নেই ছাত্র আছে, তারা ছেলের চেয়ে কম নয়।

মন্তব্যটাকে জোরদার করবার উদ্দেশ্যে বলল, ছাত্রঃ পুত্রাধিকঃ।

আবার সংস্কৃত কেন?

আরে উনি যে কাব্যতীর্থ, মাঝে মাঝে সংস্কৃত না ছাড়লে পাছে তোমরা ভুলে যাও।

যা বলেছ তারাচরণ ভায়া, অস্ত্রে মাঝে মাঝে শান দিতে হয়।

এ বারে হরিপদর পালা, সে বলল সারদা উকীলকে নিশ্চয় অনেক টাকা দিতে হবে, অবিনাশবাবুর তো অদ্য ভোক্ষ্য ধনুর্গুণ। দেখো আমিও শান দিলাম।

দিলে বটে তবে ধনুর্গুণ-র পরে বিসর্গটা উচ্চারণ করা উচিত ছিল, পরীক্ষার খাতায় লিখলে মস্ত একটা শূন্য দিতাম।

আশা করি সারদা উকীলের পাতে মস্ত একটা শূন্য পড়বে না।

কেন পড়বে। তার কত ছাত্র, সবাই চাঁদা তুলতে লেগে গিয়েছে, কলকাতায় ভার নিয়েছে রায়বাহাদুরের ছেলে শচীন, আর এখানে অতুল, নৃপেন ওরা সব।

অবিনাশ মাস্টারের ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

ভায়া হে, ভালো ভাগ্য নিয়ে কেউ জন্মায় না, গড়ে পিটে ভালো করে নিতে হয়, বিশেষ শিক্ষকদের।

হরিপদ বলল, তুমিও তো ভায়া শিক্ষক, দেখা যাক কত চাঁদা তোলে তোমার ছাত্ররা।

সে পথ যে বন্ধ, মেয়ে আছে কি।

মেয়ের বিয়ের না হোক তোমার শ্রাদ্ধের।

কথাটা অন্য দিকে গড়ায় দেখে তারাচরণ বলল, আর কী খবর বলো।

আমি তো বলছি তুমি কেবল বাজে কথা তুলছ। অবিনাশ মাস্টারের মস্ত ভক্ত ঐ নবীন মুদি, সে নাকি সব জিনিসের জোগান দেবে।

ধারে?

ধারে কি ভারে জ:নি না ভায়া তবে দেবে বলে শুনতে পাচ্ছি।

তারাচরণ বলল, যাক অবিনাশবাবুর একটা দুশ্চিন্তা ঘুচল।

আরে দুশ্চিন্তার স্থান কোথায়, সন্তান বলতে ঐ একটিই।

হরিপদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, এমন জানলে উকীল না হয়ে মাস্টার হতাম।

তোমাকে ছেলেরা লাঠিপেটা করতো।

জানলে কি করে? তোমাকে করেছে নাকি?

আরে অক্ষয় ফৌজদারকে ছাত্ররা দেবতার মতো ভক্তি করে।

দেখা যাক তোমার শ্রাদ্ধে কত চাঁদা তোলে তারা।

তুমি যদি আগে মরো?

আঃ, এখন চ্যাংড়ামি রাখো, রাত হয়েছে, ওঠো।

তাই তো, রাত দশটা বাজে!

তিন জনে তিন রকম চিন্তার সূত্র টেনে বাড়ি রওনা হলো।

তাজপুরের বিয়ে ভাঙানোর মধ্যে তারাচরণ ছিল কথাটা কানাকানিতে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ অবিনাশ মাস্টার সামান্য লোক, কোনও বিঘ্ন ঘটাবে না ভাবতে ভাবতে চলল তারাচরণ। তবে মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছিল একটা চিন্তা, এতটা সহজে লোকটার দায় উদ্ধার হয়ে গেল। অবশ্য তাতে তারাচরণের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবে আবার কাঁটার খোঁচা কেন! নিষ্কাম কর্মযোগীর চিন্তার ধারাই আলাদা।

অক্ষয় ফৌজদার ভাবছিল এই সময়ে অবিনাশ মাস্টারের দলে ভিড়ে পড়লে হয়তো কিছু রসদ টানা যেত। কিন্তু লোকটা যে সরকারের চোখে দাগী—না বাপু কাজ নেই।

হরিপদ ভাবলো, যাক সুতোর একটা দিক তো হাতে এল, এ বারে দেখা যাক অবিনাশ মাস্টারকে 'Decasted' করা যায় কি না। আগামী নববর্ষের সম্মান তালিকার দিকে নজর রাখবার একটা ইঙ্গিত যেন সাহেবের কথার মধ্যে ছিল।

ষোলো

অতুলদের বাড়িতে সকালেই জমায়েত। দিনটা ছিল রবিবার, স্কুল কলেজের তাড়া নেই। অতুল তো ছিল, আর ছিল নৃপেন ভূপতি রমেশ প্রভৃতি স্বদেশী স্কুল ও কলেজের তরুণ শিক্ষকগণ। সকলেরই মনটা হাল্কা, সামান্য চেষ্টাতেই যোগ্য পাত্র পাওয়া গিয়েছে রুক্মিণীর জন্য, আর বিয়ের খরচ বাবদ টাকা পয়সাও আসতে আরম্ভ করেছে। শচীন ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে হাজার টাকা পাঠিয়েছে, লিখেছে আরও পাঠাচ্ছে। এ দিকে এরাও টাকা তুলছে, যার কাছেই হাত পাতা যাচ্ছে, না করছে না কেউ।

নৃপেন বলল, দেখলে তো সৎকাজে কখনো টাকার অভাব হয় না।

ভূপতি বলল, ওটা কোনো কথা নয়, কত সৎকার্য টাকার অভাবে থেমে রয়েছে। কার্যটা সৎ হলেই চলে না, সৎ বলে লোকে বুঝলে তবেই উপুড় হাত করে। এ ক্ষেত্রে—

অতুল বাধা দিয়ে বলল, তোমাদের কচকচি রাখো। ভূপতি তোমার ঐ দোষ, সুযোগ পেলেই কচ্চায়ন শুরু করবে। আদালতে নিত্য সৎকার্যের আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে আর তর্কের বেলায় উৎসাহের অন্ত নাই।

এরা সকলেই উকীল তবে আপাতত ওকালতি মুলতুবি রেখে শিক্ষকতা করছে, স্বদেশী স্কুল কলেজে শিক্ষক পাওয়া কঠিন, সরকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে স্বদেশী স্কুল কলেজে নাম লেখালে পরে সরকারী চাকুরি পাওয়া কঠিন হবে। এদের সে ভয় ছিল না, বিকল্পে ওকালতি ব্যবসা তো আছেই।

নৃপেন বলল, কতদূর কী এগোল একবার মাস্টারমশাইকে জানানো উচিত।

অতুল বলল, কোনো লাভ নাই, পরশু জানাতে গিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট হল।

কেন?

কেন আর কি, গিয়ে দেখি তিনি কলেজের প্রিন্সিপাল রমণীবাবুর সঙ্গে সুরাট কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

দেখুন রমণীবাবু, দল থাকলেই দলাদলি অনিবার্য। কিন্তু এ যে সীমা ছাড়িয়ে সদর রাস্তায় এসে পড়ল, বিরোধীরা হাসছে, সব চেয়ে বেশি হাসছে বিদেশী সরকার।

রমণী চাটুজ্জে আশুতোষের প্রেরিত লোক। রমণীবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক হলেও কথায় পটু। বললেন, হাঁ, নরম দলে আর গরম দলে চটি ছোঁড়া-ছুঁড়ি অবধি হয়ে গিয়েছে। কী লজ্জার কথা।

আমি বলি কি নরমরা নরম পথে যাক গরমরা গরম পথে যাক—সকলেরই তো উদ্দেশ্য দেশের সেবা।

স্যার, এ আপনার মতো কথা হল, রাজনীতিকদের মতো নয়।

রমণীবাবু বয়সে ছোট তাই অবিনাশবাবুকে আপনি বলেন, স্যার বলেন, তা ছাড়া রেকটার হিসাবে তিনি পদাধিকারেও রমণীবাবুর উপরে।

স্যার, রাজনীতিকরা সকলেই দেশের পরাধীনতা মোচন চায় তবে একটু রকমফের আছে।

কী রকম?

ওরা চায় হয় আমার দল দেশ উদ্ধার করবে নয় দেশের উদ্ধৃত হয়ে কাজ নাই, অন্তত ওরা যেন না করতে পারে।

রমণীবাবুর বিশ্লেষণে অবিনাশবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। এত বয়স তবু একটাও দাঁত পড়েনি আর সবগুলিই বালকের দাঁতের মতো শুভ্র। হাসিতে মানুষকে চেনা যায়। মায়াকান্না সুবিদিত—মায়াহাসির কথা কেউ শুনেছে কি!

রমণীবাবু, আপনার বিশ্লেষণ হয়তো সত্য। কিন্তু কংগ্রেস যে যায়। কংগ্রেস দেশের একমাত্র ভরসা, গোপনে এক সুতোয় সমস্ত দেশকে গেঁথে এক করে তুলছে।

চমৎকার বলেছেন স্যার।

আরে, চমৎকার হতে বাধ্য। কারণ এ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের কথা।

হাঁ, ঐ একটা লোক জন্মে গিয়েছেন বটে। দেখুন কেমন সরকারি চাকুরির শিলনোড়ায় বাটনা বাটতে বাটতে অলক্ষ্যে আস্তে করে সরকারের গোটাকতক দাঁত নড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

সে দাঁতগুলো আবার বিষদাঁত।

আর একজন দাঁত নড়াচ্ছেন ঐ আশুতোষ মুখুজ্জে। তিনি বলেন বেটারা কেরানীসৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্কুল কলেজ বানিয়েছে; আমি হাজারে হাজারে বি এ এম এ সৃষ্টি করবো, দেখি বেটারা কত কেরানীগিরি দিতে পারে। আমাকে একদিন বললেন, বুঝলে না রমণী এরাই আমাদের স্বদেশী পল্টন, বঙ্কিমবাবু যাদের নাম দিয়েছেন সন্তান সেনা। এদের ম্যয় ভুখা হুঁ রব যে-দিন ভারত জুড়ে উঠবে বারোটা বেজে যাবে ওদের রাজগীর।

অবিনাশবাবু বললেন, এ আশুবাবুর মতোই কথা বটে।

আর একদিন বললেন, ওদের জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আমি যোগ দিইনি বলে ওরা আমার উপরে অসন্তুষ্ট। বুঝলে না যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়টাই হচ্ছে আসল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

এমন সময় চা এসে পড়াতে আলোচনায় ছেদ পড়লো, সেই সুযোগে আমি বললাম, স্যার, রুক্মিণীর বিয়ে সম্বন্ধে দু-একটা কথা ছিল। তিনি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, ওর আমি কি বুঝি, তোমরা আছ, ভিতরে আছেন তোমাদের মাসীমা, আর উপরে যিনি থাকবার আছেন তিনি। ভূপতি, উপরওয়ালার সাক্ষাৎ তো কাজের সময় পাওয়া যায় না তাই ভিতরওয়ালার কাছে গেলাম।

আরো কী বলতে যাচ্ছিল ভূপতি বাধা দিয়ে বলল, অতুল, ঐ তোমার মস্ত দোষ, তুমি ঘোরতর নাস্তিক।

তুমি তো আস্তিক, আমাদের হয়ে না হয় consult করো উপরওয়ালার সঙ্গে, দরকার হলে জানাব।

নৃপেন শুধালো, মাসীমা কী বললেন?

বললেন, বাবা ওঁর সঙ্গে এ-সব কথা বলাও যা, ঐ দরজাটার সঙ্গে কথা বলাও তাই।

না মাসীমা, আপনি বাড়িয়ে বললেন, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ওর আড়ালে কেউ আড়ি পেতে আছে, তবে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করতে পারেনি, তলা দিয়ে ছোট ছোট দুটি পা দেখা যাচ্ছে যেন।

মাসীমা হেসে উঠলেন, আমিও, আর দুড়দুড় শব্দে পা জোড়া প্রস্থান করল।

এ তোমার অন্যায় অতুল, বেচারাকে সমস্তটা শুনতে দেওয়া উচিত ছিল। যে ইংরাজকে তাড়াবার চেষ্টা করছ তার আদালতেও আসামীর সমস্ত শুনবার অধিকার আছে।

তুমি একটি আকাট মূর্খ নৃপেন, ও আমাদের সকলের চেয়ে বেশি খবর রাখে। এখান ওখান থেকে খবরের মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে ওর ঘরে আজ চালের মস্ত আড়ত।

ভূপতি আস্তিক কি না জানি না, তবে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নাস্তিক, বিবাহের বয়স হওয়া সত্ত্বেও ঘরে এখনো স্ত্রী নাস্তি। সে বলল, এই জন্যেই শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের কাছে গোপনীয় কথা বলতে নিষেধ করেছে। কি বলো অতুল?

শাস্ত্র পড়িনি ভাই, কোন্ শাস্ত্রে এমন আছে জানি না, তবে যে শাস্ত্রেই থাক ঐ মূল্যবান কথাটাও শাস্ত্রকারের হাতেব কাছে যুগিয়ে দিয়েছিল তার স্ত্রী।

কেন?

তর্ক এগোতে পারলো না, হঠাৎ এসে উপস্থিত নবীন মহাজন। এসে বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করলো, হাঁ দাদাবাবুরা, তোমরা নাকি মাস্টারবাবুর মেয়ের বিয়ের জন্যে চাঁদা তুলছ!

এদের সকলকেই বাল্যকাল থেকে, কাউকে কাউকে শৈশব থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে নবীন; তুমি বলবার অধিকার আছে; আগে তো তুই বলত, এখন বড় হয়েছে, তুইটাও বড় হয়ে তুমি হয়েছে, তবে আপনি পর্যন্ত উঠবে এমন সম্ভাবনা নেই।

অতুল বলল, আগে বসো, তার পরে বলছি।

মাস্টারমশাইয়ের অবস্থা তোমার তো অজানা নেই, খরচ পাবো কোথায়।

কেন দাদাবাবু, নবীনমুদি কি মরেছে! চাল ডাল ঘি ময়দা লবণ মশলা কি নবীনের আড়তে নেই?

আছে জানি, কিন্তু বিলিতি চিনি নুন তো চলবে না।

হায় রে কপাল! বলে কপালে করাঘাত করে বলল, নবীনমুদির দোকানে অনেকদিন ঢোকোনি মনে হচ্ছে, এক ছটাক বিলিতি মাল পাবে না।

বস্তা বস্তা চিনি নুন কী করলে?

কেন, পদ্মায় ফেলে দিলাম। সবাই পরামর্শ দিল বিলিয়ে দাও। বিলিয়ে দেব, কি সর্বনাশ ও যে বিষ, আর তাই দেব মানুষের হাতে তুলে! না হয় বিনা দামেই হল।

তাহলে লবণ চিনি বেচা বন্ধ করেছ?

কেন করবো, দেশে কি জিনিস নেই। কাশীর দোবারা চিনি, করকচ লবণ।

লোকে কিনছে?

না কিনলে তাদের খুশি। আর না কিনেই বা উপায় কি। নবীনের আড়ত থেকেই জিনিস নিয়ে চলে দশটা গ্রামের খুচরো দোকানগুলো।

বেশ, চাল চিনি লবণ সব যেন দিলে, কাপড়? বিলিতি কাপড় তো অচল।

একটুকরো বিলিতি কাপড় পাবে না, সব বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি আর শাড়ি।

বিলিতি কাপড়গুলোও কি পদ্মায় ফেলে দিলে নাকি?

পদ্মায় ফেলে দিলে তো সব তুলে নেবে, ব্রহ্মার জিহ্বায় সমর্পণ করলাম যাতে আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে। বেনারসী শাড়ি চলবে তো? তাও রাখে নবীন।

বেনারসী শাড়িও রাখো নাকি!

দাদাবাবুরা এখন বড় হয়ে এল এ, বি এ হয়েছে এখন আর নবীনমুদির দোকানে পদার্পণ করে না। ছেলেবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে ঢুকে মুঠো মুঠো চিনি বাতাসা নিয়ে পালাতে আর আজ জিজ্ঞাসা করছে বেনারসী রাখো নাকি।

এই বলে আবার সে কপালে করাঘাত করল। নবীনের দু'টি মুদ্রাদোষ, কথায় অকথায় কপালে করাঘাত, আর মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ। এক সময়ে একখানা চারচালাঘরে পাঠশালা খুলে পণ্ডিতি করতো, এই শব্দগুলো তার শেষ সাক্ষী। সেদিনকার

নবীনপণ্ডিত, নবীনমুদি হয়ে বর্তমানে নবীন মহাজন, বিত্তশালী ব্যবসায়ী। আর সেদিনকার চারচালা পাঠশালা আজ পাকা ইমারত।

একজন বলল, দেখি কতটা তোমার কাছ থেকে নেওয়া যায়।

ও সব কলেজী কথা রাখো দাদাবাবুরা, ভিক্ষে করে দেবে রুক্মিণী মায়ের বিয়ে। তার আগে যেন নবীন মহাজনের মৃত্যু হয়। ওসব খাতাফাতা রাখো। হাঁ এই বলে দিলাম, নবীনের যে কথা সেই কাজ। এখন চললাম।

অপস্রিয়মাণ নবীনের দিকে তাকিয়ে রইল, সকলেরই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

নবীনের দেহটা কুমোরের গড়া একমেটে মূর্তি, সেই দিব্য কুমোর তার মনটি গড়তে এতই মনোযোগ দিয়েছিলেন যে দেহটা দোমেটে করবার কথাটা মনেই পড়েনি।

ভূপতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, এদেরই আমরা বলি অশিক্ষিত—আর শিক্ষিত ঐ তারাচরণ আর হরিপদ উকীল। শিক্ষার মাপকাঠিখানা একবার পেলে বোঝাপড়া করতাম।

অতুল বলল, তা যখন শীঘ্র পাচ্ছ না,—কি হে ফয়জুল্লা, চিঠি না মনি অর্ডার?

ডাকপিয়ন ফয়জুল্লা হেসে বলল, বাবু দু-ই।

শচীন আরো এক হাজার টাকা পাঠিয়ে চিঠিতে জানতে চেয়েছে বিয়ের তারিখ।

তখনই শচীনকে লিখে দিল আর টাকার দরকার নেই। আর বিয়ের তারিখ ৫ই ফাল্গুন, সে যেন আগের দিন অবশ্য অবশ্য পৌঁছয়।

ভূপতি ওদের মধ্যে ইঞ্চি কয়েক প্রবীণ, সে বলল, ঐ সঙ্গে অনুরোধ করে জানিয়ে দাও শচীন যেন তোমার বাড়িতে ওঠে। রায়বাহাদুরের মনোভাব তার উপরে এখন কেমন কে জানে। তবে ঐ শেষেরটুকু আর লিখো না। তোমাদের তো আবার কাণ্ডজ্ঞান নেই।

অতুল বলল, হে আস্তিক তোমার প্রকাণ্ড জ্ঞান দেখে আমরা বিস্মিত, স্তব্ধ-মুগ্ধ স্তম্ভিত। তবে তোমার মতো আস্তিক্য বুদ্ধি না থাকা সত্ত্বেও ওটুকু যে লেখা উচিত নয় তা জানতাম।

সতেরো

আজ কদিন দিনাজশাহী নাটোর, নাটোর দিনাজশাহী করে হরিপদ উকীলের পায়ের নড়া ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। আসলে কথাটা রূপক। পায়ের নড়া কারো যদি ছিঁড়বার উপক্রম হয়ে থাকে তবে হরিপদর পক্ষীরাজ যুগলের। জনৈক মক্কেলের কাছ থেকে ফিসের বদলে এদের পেয়েছিল, আর গাড়িটা ছিল পিতামহের। এ হেন গাড়িতে এ হেন অশ্বযুগল টান লাগাতো, এক মাইল দূর থেকে শব্দ শোনা যেতো, সবাই টের পেতো হরিপদ উকীল আসছে, প্রয়োজনস্থলে সাবধান হয়ে যেতো।

প্রথম দিন নাটোর গিয়ে সারদা রায় উকীলের বাড়িতে দেখা দিল হরিপদ, পরিচয় আগেই ছিল।

অনেকদিন দেখাশোনা নাই, একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম একবার একটা সজ্জনের সঙ্গে দেখা করে যাই, উকীলের তো দুর্জন নিয়েই কারবার। বুঝতেই তো পারছেন।

সারদা রায় আপ্যায়িত হলেন।

কিছুদিন পরে এক হাঁড়ি সন্দেশ নিয়ে দেখা দিল হরিপদ।

সারদা অবাক হয়ে শুধালেন, এ কি?

হরিপদ বলল, দেখুন সংস্কৃতের মতো ভাষা হয় না, সন্দেশ শব্দটাকে দ্ব্যর্থক করে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হয়েছে; সন্দেশ মানে মিষ্টান্ন আবার সুখবরও বটে।

সুখবরটা কী হল?

সেটা বলতেই তো আসা, নইলে মশায়ের ঘরে মিষ্টান্নের কি অভাব। খুব বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি রাজার বার্থডে অনার লিস্টের জন্যে আপনার সুপারিশ হয়ে গিয়েছে।

বলেন কী! আমার নাম!

তবে আর কার জন্যে সন্দেশ আনলাম। ভাবলাম রায়মশায়কে সকলের আগে গিয়ে সুখবরটা দিয়ে আসি, সময়কালে যাতে নেকনজরে রাখেন।

কৃতার্থ রায়মশায় খাসি মেরে হরিপদকে ভূরিভোজন করালেন।

মাসখানেক পরে তখন পুত্র অম্বিকার সঙ্গে অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছে, হরিপদ আবার দেখা দিল সারদা রায়ের ভবনে, এবারে আর হাতে হাঁড়ি নয় মুখটাই হাঁড়ির মতন।

কী দত্তমশায়, মুখটা বিষণ্ণ দেখছি যেন।

হরিপদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, প্রসন্ন হওয়ার কারণ তো আর নাই।

কেন, কেন?

তখন হরিপদ সময়োচিত গাম্ভীর্য ও খেদ সহকারে ব্যক্ত করলো, আপনার পুত্রের বিবাহ অবিনাশ মাস্টারের মেয়ের সঙ্গে স্থির হয়েছে, সংবাদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়েছে, বড় গোঁসা হয়েছেন, অনারের সুপারিশটা খারিজ করে দেবেন কিনা ভাবছেন।

বিস্মিত সারদা রায় শুধালেন, কেন এতে অপরাধটা কী?

বলেন কি রায়মশায়! অবিনাশ মাস্টার পুলিশের এক নম্বর আসামী, দিনাজশাহী জেলার সমস্ত স্বদেশীর মূলে তার হাত। এখন এ হেন লোকের সঙ্গে আপনি আত্মীয়তা করতে যাচ্ছেন শুনে সাহেব ধরে নিয়েছেন আপনি ঐ দলের।

রাধেকেষ্ট! আমি স্বদেশীওয়ালা! আমার ঘরে এক টুকরো দেশী কাপড়, এক ছটাক বিলিতি চিনি নেই আর আমি স্বদেশী! হরিপদবাবু, সবাই জানে ম্যাজিস্ট্রেট আপনার হাতধরা, আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলুন এ সর্বৈব মিথ্যা, শত্রুদের রটনা!

আপনাকে বলতে হবে কেন, এমনিতেই আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি। সাহেব বড় জেদী, কিছুতেই বুঝতে চায় না।

আপনি তেমন করে ধরলে নিশ্চয় বুঝবেন—বলে সারদা রায় হরিপদর হাত দু'টো জড়িয়ে ধরলেন।

আচ্ছা দেখি কী করা যায়। তবে আপনি ঐ বিয়ের ব্যাপারে আর অগ্রসর হবেন না।

আবার অগ্রসর! পাওনা-থোওনাও এমন কিছু নেই, তবে কিনা টাউনের অনেকেই অবিনাশ মাস্টারের ছাত্র, সবাই ধরলো, ভাবলাম ব্রাহ্মণের কন্যাদায়টা উদ্ধার হয়ে যায় তো যাক।

যাক বিয়ে যখন ভেঙে দেবেন বলেই স্থির করলেন তখন আপনাকে বলি চোদ্দো বছরের মেয়ে এতদিন বিয়ে হয়নি কেন, মেয়ের সম্বন্ধেও নানারকম কথা শোনা যায়।

রাধেকেষ্ট। তাই বলো। আমি আজই জানিয়ে দিচ্ছি।

না না, আজ নয়। বিয়ের ঠিক দিন দুই আগে যে কোনো একটা ছুতো করে জানিয়ে দিলেই হবে। এখন জানালে একটা ফৌজদারি মামলা করে দিতে কতক্ষণ, সবাই আবার অবিনাশ মাস্টারের হাতধরা কিনা। এখন যেমন আছেন চুপচাপ থাকুন, না রাম না বিষ্টু, কিছু বলবার প্রয়োজন নাই।

বিয়েটা এখনই ভেঙে গেলে আর একটা বর জোটাতে কতক্ষণ। তা হলে আর অবিনাশ মাস্টার 'Decasted' হয় না। 'Decasted' হলে কেমন করে লোকটা শহর ছেড়ে পালিয়ে শহরটা নিষ্কণ্টক হয় দেখবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে, প্রায়ই হরিপদকে তাড়া দেয় কত দূর হে।

কি হে হরিপদ, তোমাকে যে আর লোন অফিসের আড্ডায় দেখা যায় না, তলে তলে কিছু একটা প্যাঁচ কষছ মনে হয়। আর যাই করো বাপু অবিনাশ মাস্টারের পিছনে লেগো না, ছেলেরা তা হলে আর আস্ত রাখবে না।

তারাচরণ ভায়া, শেষে আমার সম্বন্ধে এই রকম সন্দেহ আর সে সন্দেহ কিনা অবিনাশবাবুর বিষয়ে! তিনি স্বয়ং নরবেশী দেবতা—বলে তার উদ্দেশে নমস্কার করলো।

তবে সেইরকম ভাবেই চলো।

সে তখনই সোজা গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালো যে তার উপরে স্বদেশীওয়ালারা জুলুম করতে পারে এ সব আশঙ্কা আছে। ম্যাজিস্টেট তখনই দু'জন সাদা পোশাক পুলিশের ব্যবস্থা করে দিল। পরদিন সবাই শুধালো সঙ্গে এ দু'টো নন্দীভৃঙ্গি আবার কেন?

হরিপদ তাদের একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলত, ভাই, কাবুলির কাছে দেনা করতে হল। পাছে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে তাই একটু সাবধান হয়ে চলতে হয়, যে দিনকাল বুঝতেই পারছ।

বলা বাহুল্য তার অভাবের কথা কেউ বিশ্বাস করলো না, সবাই জানত হরিপদর অঢেল টাকা, কতক নিজের সিন্দুকে, কতক সমস্ত জেলার অসহায় নাবালক ও অনাথ বিধবাদের সিন্দুকে।

অবিনাশবাবুর ছাত্ররা, বিশেষ স্বদেশী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ স্থির করেছে বিবাহে এমন ধুমধাম করতে হবে যাতে শহরের লোকে বুঝতে পারে অবিনাশবাবু অসহায় নয় আর সরকারী মহলও জব্দ হবে। নবীন মহাজন ঢালাও হুকুম দিয়েছে, তার আড়তে যা পাওয়া যায় যত প্রয়োজন সরবরাহ হবে। তবে কর্মীরা স্থির করেছে নগদ টাকা তার কাছ থেকে নেওয়া হবে না, তাতে জুলুম বেশি হবে। আর তা ছাড়া তাদের হাতে যে টাকা আছে অন্যান্য খরচের পক্ষে তা যথেষ্ট। বিবাহের রঙিন চিঠি ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে, সেই চিঠির মুদ্রিত ইংরাজি অনুবাদ শহরের সাহেবমহলে যথারীতি বিতরিত হয়েছে। বাজনা বাদ্যি রোশনাই কিছুরই অভাব কমতি করা হয়নি।

এমন সময়ে বিবাহের আগের দিনে সারদা রায়ের পত্রে অবিনাশবাবু অবগত হলেন অম্বিকার সঙ্গে বিবাহ সম্ভব নয়, মেয়ের সম্বন্ধে নানারকম কথা তাঁর কানে এসেছে। পত্র পাঠ করে অবিনাশবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ব্যাপার শুনে অবিনাশবাবুর স্ত্রী শয্যাগ্রহণ করলেন, আর রুক্মিণী যে কোথায় লুকালো তার ঠিক নাই। অবিনাশবাবুর ডাকে অতুলরা এসে উপস্থিত হয়ে সমস্ত অবগত হল। ভূপতি তখনই বলল, আমি যাচ্ছি।

কোথায় হে?

অতুলের প্রশ্নের উত্তরে ভূপতি বলল, সারদা রায়ের মাথাটা নিয়ে আসি।

অতুলের মাথা ঠাণ্ডা, সে বলল, তাতে পাত্রের কালাশৌচ হবে, এক বছরের মতো বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।

তুমি কি এখনো ওখানে বিয়ের প্রত্যাশা করো?

না। কিন্তু ফৌজদারি বাধবে।

মরতে আমি মরবো, তোমাদের আপত্তি কী?

তাতেও তো বিয়ের সুরাহা হবে না।

তার পরে সে বলল, মাস্টারমশাই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আগামীকাল ওই লগ্নেই বিয়ে হবে। পাত্র খুঁজে বার করবার ভার আমাদের উপরে রইল।

এই বলে সকলে অতুলদের বাড়িতে ফিরে এল। এসে দেখে তখনই শচীন এসে পৌঁছেছে। সমস্ত শুনে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

এ সব পরপীড়নমূলক সংবাদ আমাদের সমাজে প্রায়ই চাপা থাকে না। অনেকের কানেই গেল। হরিপদ যথাসময়ে জেনেছে। এ সংবাদে সে যে কারোর চেয়ে কম মুহ্যমান নয় এই সত্য প্রচারের জন্য, আসলে মনের আনন্দ চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে দিনে চার বার কুইনিন মিকশ্চার খেতে শুরু করলো। ম্যালেরিয়া জ্বর ঠেকাতে ও মুখটা বিষণ্ণ করে তুলতে ও ওষুধটার জুড়ি নেই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কপালে করাঘাত করতে লাগলো, এমন সর্বনাশও নাকি মানুষের হয়!

এমন সময় শচীনের মা নিস্তারিণী দেবী অতুলদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। অনেক দিন পর মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ, শচীন ভক্তিভরে প্রণাম করল।

বাবা আমি এইমাত্র শুনলাম তুমি এসেছ, আমি তো শৈলেনখুড়োকে তোমার কাছে পাঠাতে যাচ্ছিলাম।

কেন মা?

সমস্ত ঘটনা তো শুনেছ। তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।

কি কাজ মা?

রুক্মিণীকে তোমায় বিয়ে করতে হবে।

শচীন তার মাকে ভালোভাবেই জানতো, তাই জানতো যে এমন অনুরোধ একমাত্র তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব। তবু প্রথমটা তার মুখে কথা সরল না।

তাকে নীরব দেখে বললেন, কি বাবা পারবে না?

শচীন বলল, না মা, তা নয়, আমি ভাবছি বাবা—

বাধা দিয়ে নিস্তারিণী দেবী বললেন, না বাবা, এ ব্যাপারে তোমার বাবার কথা ভাববার নয়, একমাত্র ভাববার বিষয় রুক্মিণী। মনে করো রুক্মিণীর বদলে তোমার বোন মলিনার যদি এমন ঘটতো।

শচীন পুনরায় মায়ের পদধূলি গ্রহণ করে বলল, মা, তোমার আদেশ কখনো লঙ্ঘন করিনি—রুক্মিণীকে আমি বিয়ে করবো।

মা ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, মাতা পুত্র কারো চোখ শুষ্ক ছিল না।

গৃহান্তর থেকে অতুলরা মাতা-পুত্রের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিল, তাদেরও চোখ ছলছল করে উঠছিল।

বাবা অতুল, এ ঘরে এসো, রুক্মিণীর পাত্র পাওয়া গিয়েছে।

সব শুনেছি মাসীমা।

তারা সবাই ঘরে প্রবেশ করলো। অতুল বলল, মা কথাটা এখন গোপনে রেখো।

কেন বাবা?

কালকে সকলকে অবাক করে দিতে হবে।

একবার অবিনাশবাবুকে জানাবে না?

হাঁ, তাঁর বাড়িতে জানাতে হবে বইকি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

কিন্তু মেসোমশাইকে!

তিনি সকলের সঙ্গে বিবাহসভাতেই জানতে পাবেন। আমি ভেতরে চললাম, দিদিকে জানিয়ে যাই বরযাত্রা তাঁর বাড়ি থেকেই হবে। এই বলে তিনি অতুলের মায়ের উদ্দেশে প্রস্থান করলেন।

অতুল অল্পভাষী, মনের আবেগ সহজে প্রকাশ করতে চায় না। শচীনের হাতটা জোরে চেপে ধরল।

নৃপেন বলল, শচীন ভাই, কলকাতায় কষ্ট করে যে চাঁদা তুলেছিলে সেটা যে এমনভাবে সার্থক হবে নিশ্চয় ভাবতে পারোনি।

রমেশ বলল, তুমিই দিয়েছিলে সবচেয়ে বেশি, যাক ঘরের টাকা ঘরেই এল।

ভূপতি বাগ্মী, সে বলল, যে দেশে এমন মা, সে দেশের জন্য চিন্তা কোরো না অতুল।

চিন্তা করি সে দেশের ছেলেদের জন্য যারা কথায় কথায় পরের মাথা নিতে উদ্যত।

সময় হলে দেখতে পাবে নিজের মাথা দিতেও পিছপা নয় অতুল।

সে সময় যখন আসেনি, আপাতত বিয়ের আয়োজনটা চালিয়ে যাও।

নিমন্ত্রণপত্রে বরের নাম?

সেটাও অবাক করে দেবার একটা উপাদান। চলো শচীন, কিছু খাবে, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

নৃপেন বলল, ভাবনায়, না খিদেয়?

আপাতত খিদেয়।

হাঁ, ভাবনাটা ভবিষ্যতের জন্য না হয় মুলতুবি থাক।

ভাই অতুল, আমারও মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

সেটা আশাভঙ্গজনিত, পরের মাথাটা ফসকে গেল। চলো সবাই ভিতরে।

আঠারো

ঘটনাটা একেবারে চাপা রইলো না, নানা লোকে জানলো, তবে নানা আকারে। অধিকাংশ লোকে জানলো আজকে অবিনাশ মাস্টারের মেয়ের বিয়ে সারদা রায় উকীলের ছেলের সঙ্গে। আর হরিপদ উকীলের মতো ভ্রমণিচ্ছন্তি মক্ষিকার দল জানলো বিয়ে ভেঙে গিয়েছে, তবু একেবারে নিশ্চিত হতে পারলো না, কি জানি অবিনাশ মাস্টারের অসংখ্য ছাত্র, তাদেরই হয়তো কোনও একজনকে মধুর অভাবে গুড়ের নীতি অনুসারে শেষ মুহূর্তে পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে পিত্তি রক্ষা করবে। নিমন্ত্রিত শ্বেতাঙ্গমহল ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করে তারা স্থির করেছিল বিবাহসভায় যাবে না, যাবে কেবল পুলিশসাহেব, তামাশা কতদূর গড়ায় দেখে এসে রিপোর্ট করবার জন্যে। সাহেবদের কারো কারো ইচ্ছা ছিল দেখতে যায় একটা 'Casted' লোক কি ভাবে 'Decasted' হয়, ভেবেছিল পত্রাকারে Times পত্রিকায় লিখে পাঠাবে। আর হরিপদ অবশ্যই যাবে, এ নাটের সে-ই গুরু। সে যাতে চক্ষুলজ্জায় শেষ মুহূর্তে সরে না পড়তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে পুলিশসাহেবকে ইঙ্গিত করেছিল ম্যাজিস্ট্রেট, নেটিভদের কথার উপর তার এতটুকু বিশ্বাস ছিল না। আসল ব্যাপার জানতো অবিনাশবাবুর পরিবারবর্গ আর অতুলদের দল। তারা স্থির করেছিল সকাল থেকে বাজনা বাদ্যি বাজাবার দরকার নেই, বাজনদারেরা সারাদিন বসে তামাক টানুক আর জলপান খাক, তার পরে সময়মতো ষোলো আনা আদায় করে নিলেই হবে। একটু নাটকীয় কাণ্ড করবার উদ্দেশ্যেই এই নীরবতার পরিকল্পনা।

নিস্তারিণী দেবীকে অতুল বলল, মেসোমশাইকে তো জানাতে হয়।

কেন বাবা, তাকে এর মধ্যে টেনে আনা। একেবারে সময় হলেই জানতে পাবেন বিবাহ-সভায়।

তিনি যাবেন তো?

যাবেন বইকি, এসব সামাজিক নিমন্ত্রণ সর্বদা রক্ষা করে চলেন তিনি।

বেশ আপনি যেমন বোঝেন।

তারপর সুশীলকে ডেকে বলল, দেখ্ সুশ্‌লে, কথা যদি ফাঁস করিস তবে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব।

পাঠকের বুঝতে পারা উচিত এটা ভূপতির উক্তি, হাড় গুঁড়ো করতে মাথা নিতে তার তিলার্ধ বিলম্ব হয় না।

অতুল বললো, ভূপতি, এ যে অন্যায় জুলুম, দেখছো না, ওর পেট ফুলে উঠেছে না বলতে পেরে।

যা তবে ঐ বেলগাছটার কানে কানে বলে আয়; আমরা এখন চললাম। মনে থাকে যেন সুশ্‌লে।

মাসীমা, সময় মতো যেয়ো।

সময়ের আগেই যাবো বাবা অতুল।

সঙ্গে মল্লিকে নিতে ভুলো না।

ওই আমাকে ভুলতে দেবে না। তা শচীন কেমন ছিল রাতে?

ভালোই ছিল, খুব ঘুমিয়েছিল, ভালোই থাকবে, কালকে আপনাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি।

বাবা, এ বার তোমরাও বিয়ে করে ফেলো।

এই আরম্ভ হলো মাসীমার সেই পুরনো কথা। এখন মাসীমা অনেক কাজ বাকি, আজকের মতো রক্ষা করো।

সেই রাতেই অতুল গিয়ে সমস্ত বিবরণ অবিনাশবাবুকে জানালো, জানালো কী ভাবে কি হয়েছে। অবিনাশবাবু বুঝলেন রায়বাহাদুরের রাগের ঝড়ঝাপটা স্ত্রীর উপর দিয়েই যাবে। বললেন, যাও তোমার মাসীমাকে খবরটা দাও।

খবর শুনে শয্যাগত মাসীমার অবস্থা অনেকটা 'উঠিয়া বসিল রোগী শয্যার উপরে'। তাঁকেও সমস্ত অবস্থা জানাল অতুল, বলল, রুক্মিণীকে সময় বুঝে খবরটা দেবেন; এখন চললাম, কাল সকালে আবার আসবো। অতুল চলে গেলে মা ও মেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলো। দুঃখ ও আনন্দ প্রকাশের ভাষা এক। ধন্য বিধাতার মুন্সিয়ানা।

অতুল যাওয়ার আগে বলেছিল, মাসীমা, খবরটা এখন চালু কোরো না।

কেন বাবা?

লোককে একটু অবাক করে দেবো। মাস্টারমশাইয়ের বন্ধু অনেক, আবার কিছু শত্রুও তো আছে, দুই দলই অবাক হবে, একদল আনন্দে একদল দুঃখে। দুঃখ ও আনন্দ প্রকাশের রীতিও এক। আমরা বলি ধন্য বিধাতার মুন্সিয়ানা।

পরদিন সকালবেলাতে অতুল এসে দেখল দুই মাসীমা অর্থাৎ বিন্দুবাসিনী ও নিস্তারিণী দেবী কোমরে কাপড় জড়িয়ে কাজে লেগে গিয়েছেন।

বিন্দুবাসিনী বলছিলেন, দিদি, তুমি ছেলের মতো ছেলে পেয়েছিলে বটে।

কী বলছো বোন, সংকটকালে এই কাজটুকু যদি না করে তবে আবার মানুষ কিসের। আর তা ছাড়া একটা সংকট ঘটেছিল বলেই তো রুক্মিণীর মতো বউ পেলো। সত্য কথা বলবো বোন, আমি অনেক সময়ে ভেবেছি আহা রুক্মিণী যদি আমার ঘরে আসতো। তা হওয়ার নয় ভেবে মনের সাধ মনে চেপে রেখেছি।

তবে বোধ করি বিধাতা মনের কথা শুনেছিলেন।

এমন কোন্ পুণ্য করেছি যে মনের সাধ বিধাতার দরবারে পৌঁছবে। তবে তাজপুরের বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় দুঃখিত হইনি।

কেন, রাজার মেয়ে।

ভাই রাজার মতো মন ভালো, রাজার মতো ধন নয়। রুক্মিণী বাপের গুণ আর মায়ের রূপ পেয়েছে।

কি যে বলো দিদি।

এমন সময় অতুল সাড়া দিয়ে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, এই যে দুই মাসীমাই এখানে উপস্থিত। এবার বলুন কী করতে হবে, বাইরে আমাদের দলবল হাজির।

নিস্তারিণী বললেন, শচীন যেন উপবাস করে থাকে।

উপবাস করেই থাকবে তবে চা ছাড়া, ওটা ওষুধের মধ্যে গণ্য। চিন্তা করবেন না

মাসীমা, আমার মা লোকাচার বিষয়ে আপনার চেয়েও নিষ্ঠাবতী, শচীনকে সারাদিন না খাইয়ে একেবারে আধমরা করে ফেলে সন্ধেবেলা বিন্দু মাসীমার হাতে পৌঁছে দেবেন।

ছেলের আমার কথা শোনো।

ঘরের মধ্যে কথা বলছে কারা?

মলি আর রুকমি।

বটে বটে—বলে অতুল ঘরে ঢুকল।

লজ্জিত রুকমি পালাবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু হায় পথরোধ করে অতুল দণ্ডায়মান। কালকে অতুল এক ফাঁকে রুক্মিণীর মুখ দেখেছিল রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমা, আর আজ একী, অপসৃত ছায়া শরৎ পূর্ণিমার শশী।

রুকমি মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে বলল, অতুলদা, পথ ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

কেন রে পথের কাঁটা তো দূর করেই দিয়েছি, তবে আবার কেন?

না পথ ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

আমারও কাজ আছে। কোন্ যাত্রাপালা শুনতে যাবি?

প্রসঙ্গান্তর পেয়েছে ভেবে বলে উঠল, যাবো যাবো, কবে কোথায়?

আজ রাতে এখানেই।

তবে কি প্রসঙ্গান্তর নয়! শুধু শুধালো, কি পালা অতুলদা?

রুক্মিণীহরণ পালা।

ছি, যা নয় তা-ই বলছ—এই বলে সে মলিনার আড়ালে লুকালো।

আজ লুকোচ্ছ লুকোও, কিন্তু ননদী খুব নিরাপদ আশ্রয় নয়।

ভয় পেয়ো না বৌদি।

বৌদি! বিয়ের আগেই!

কেন আবার বিয়ে ভাঙবে না কি। তা মন্দ নয় অতুলদা, বিয়ে ভাঙলে তবে ভালো বিয়ে হয়।

হাঁ রে, বাদামের খোসাটা ভাঙলে যেমন শাঁস মেলে।

এই দেখো না কেন তাজপুরের বিয়ে ভাঙলো বলেই দাদার বিয়ে হল এখানে আর নাটোরের বিয়ে ভাঙলো বলেই দাদাকে পেলো রুক্মিণী।

দুই সখীর মধ্যে মলিনা মুখরা। তবে মন্দর ভালো। মুখরা নারী দুঃসহ, নীরবা দুঃসহতর।

বেশ এ কথা যেন মনে থাকে মলি, তোর বিয়ে যদি না ভাঙি তবে আমার নাম অতুল নয়।

তবে আমারও সেই প্রতিজ্ঞা, তোমার বেলায় ভুলো না।

বেশ মনে রাখবো।

কিন্তু ছোটদাকে সকাল থেকে দেখছি না কেন? তাকে আবার কোথায় গুম করলে।

দাদার কাছে গিয়ে সে বসে আছে।

বুঝেছি রুকমি পাহারায় নিযুক্ত করেছে পাছে পালায়। কত দিয়েছিস ভাই?

বিব্রত রুক্মিণী বুঝলো ননদী সত্যই নিরাপদ আশ্রয় নয়।

বেশ বলেছিস, তুই দেখিস রুকমি যেন না পালায়।

অতুলদা, রুক্মিণীহরণ ছাড়া ওর পালাবার পথ বন্ধ।

অতুল বলে উঠল, তোদের সঙ্গে কথা বলবার সময় নেই, আমার কাজ আছে।

রুক্মিণী বলল, সেই ভালো, এখন যাও, কাজ আমা'রও আছে।

সে তো সেই সন্ধ্যেবেলায়—বলে অতুল দ্রুত প্রস্থান করল।

বিবাহলগ্ন সন্ধ্যাবেলা আর স্থান নবীন স্বদেশী স্কুলের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। জায়গাটা শামিয়ানা শতরঞ্চে ফুলে লতায়-পাতায় কলাগাছে যতটা সমাচ্ছন্ন করা সম্ভব তার ত্রুটি হয়নি, আর বরাসন সত্যিই বরাসন। একদিকে খানকতক চেয়ার আছে, শ্বেতাঙ্গমহল যদি আসে, তবে সে সম্ভাবনা কম। ও সব ভার নবীন মহাজনের উপরে ছিল। বর-বদলের রহস্য তার অবিদিত ছিল না। তাই তার উৎসাহে বন্যা এসেছিল। আর যে-কটা বাদ্যভাণ্ডের ব্যবস্থা ছিল তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে শহরে ও আশেপাশের গ্রাম থেকে ঢাক ঢোল কাঁসি বাঁশি জগঝম্প প্রভৃতি উৎকট শব্দকারী বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহের ত্রুটি করেনি নবীন। কারণ দর্শিয়ে সে বলে বেড়াচ্ছিল এ আমাদের স্বদেশী স্কুলের প্রথম স্বদেশী বিয়ে কিনা। যথা সময়ে অর্থাৎ যথা সময়ের অনেক আগে আলোগুলো ঝলমল করে উঠলো, আর বাদ্যভাণ্ডসমূহ বাতাস মন্থিত করে তোলপাড় শব্দ করে উঠলো।

যথাসময়ে অর্থাৎ যথাসময়ের অনেক পরে নিমন্ত্রিতগণে সভাস্থল পূর্ণ হয়ে উঠল। শহরের ভদ্রেতর কেউ বাদ পড়েনি। অবিনাশবাবু ও তরুণ শিক্ষকগণ সকলকে যথোচিত অভ্যর্থনা করছিলেন। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এলো একমাত্র পুলিশসাহেব। তাও আবার ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ অনুরোধে। 'Decasted' হওয়ার তামাশাটা কেমন গড়ায় সরেজমিনে দেখে রিপোর্ট করবার উদ্দেশ্যেই তার আগমন। পাশে নাটের গুরু হরিপদ উকীল উপবিষ্ট। এমন সময় রায়বাহাদুর প্রবেশ করতেই অবিনাশবাবু বিশেষ সমাদর করে তাঁকে নিয়ে প্রশস্ত আসনে বসালেন। সভায় পান তামাক, মানুষপ্রমাণ বড় বড় তালপাখার হাওয়া চলছিল।

এমন সময় ভিতরের দিকে নারীমহলে তুমুল হুলুধ্বনি উঠলো। বরের পালকি সেই দিকে এসে পৌঁছেছে—এই রকম ব্যবস্থাই হয়েছিল। সবাই যখন বর দেখবার জন্য উৎসুক, সেই সময় প্রবেশ করলো বরবেশী শচীন। সভাঙ্গনে বিস্ময়ের চরম। পুলিশসাহেব কটমট করে তাকালো হরিপদর দিকে, হরিপদ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালো বরের দিকে।

শচীন অকম্পিত পদে এসে পিতাকে প্রণাম করলো। রায়বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন, সকলে ভাবল এবারে তিনি সভাস্থল পরিত্যাগ করবেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পুত্রকে বুকের মধ্যে সবেগে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, বাপের মান রেখেছিস বাবা। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, অবিনাশবাবুর চোখেও। ইতিপূর্বে কেউ কখনো এঁদের চোখে জল দেখেনি।

সভাস্থ ব্যক্তিগণ এক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, তার পরে পিতাপুত্রের মিলন প্রত্যক্ষ করে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিয়ে উঠল।

পুলিশসাহেব একান্তে হরিপদর উদ্দেশ্যে বলল, What is all this? Is this decasting!

হরিপদ একান্তে বলল, Traitors! All Swadeshiwalas!

পুলিশসাহেব ছড়ি টুপি সংগ্রহ করে হন হন বেগে সভাস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। সাহেব শ্রুতির বাইরে চলে গিয়েছে দেখে হরিপদ বলে উঠল, হারামজাদাটা গিয়েছে—বাঁচা গেল।

কাছেই ছিল বীরেন চৌধুরী উকীল, বলল, সব হারামজাদা গেলে যে পুরোপুরি বাঁচা যায়।

নিকটে উপবিষ্ট ত্রিপদী ফৌজদার। বলল, দুঃখ কোরো না ভায়া, বড় মাছ ধরতে গেলে মাঝে মাঝে জাল ছিঁড়ে যায়।

তারাচরণবাবু অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, এ বারে তো সকলে বুঝতে পারলো তাজপুরের বিয়েটা ভেঙেছিল কে।

এত অপমানেও হরিপদ উকীল সভা পরিত্যাগ করলো না। সভায় ঢুকবার মুখে ভিয়েনের ব্যবস্থা চোখে পড়েছিল তার। লোভী লোক কদাচিৎ সৎ হয়।

এমন সময়ে অবিনাশবাবু সভার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা সবাই অনুমতি করুন বরকে আমি বিবাহমণ্ডপে নিয়ে যাই। আসুন রায়বাহাদুর।

উনিশ

আজ উকীল তারাচরণবাবুর মেজাজ শরিফ ছিল। আজকাল আদালতের আয় গোটা আশী টাকা, খুচরা এক পয়সাও ছিল না। এই নিষ্কাম কর্মযোগীর নীতি গোটা অঙ্ক ব্যাঙ্কে জমা পড়বে ও খুচরাতে মাত্র গৃহিণীর অধিকার। গৃহিণীকে আজ কিছু দিতে হবে না, চাইলে দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় সজোরে মুখের সম্মুখে নেড়ে দিলেই চলবে; বললেই হবে আর করে খেতে হবে না ছোকরা উকীলদের জ্বালায়। আর একটা কারণ হরিপদ যে অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে ভণ্ডুল করবার চেষ্টা করেছিল এই নজিরে তাজপুরের বিয়ে ভাঙানোও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে লোকে, তার নিজের ঘাড় আজ হালকা। এই নিত্য আর নৈমিত্তিক কারণদ্বয়ের প্রতিক্রিয়ায় তার মন আজ প্রফুল্ল ছিল।

বীরেন চৌধুরী ভাবছিল আর কয়েকজন এলেই হয় তাস নয় পাশা নিয়ে বসবে। বলল, হরিপদ আজ এখনো এলো না।

আর তার শীগগির মুখ দেখাতে হবে না।

আরে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, সারদা রায়ের ছেলের চেয়ে অনেক ভালো বর পেয়েছেন অবিনাশবাবু।

তা তো পেয়েছেন কিন্তু এখন তার ঢেউ সামলাচ্ছে হরিপদটা।

আবার কী হল, একটু খুলেই বলুন না।

বলবো বলেই তো বসে আছি। একটু লক্ষ রেখো ত্রিপদী ফৌজদার না এসে পড়ে।

আমেরিকার র‍্যাট্‌ল সাপ অতিশয় ভয়ানক, সেই জন্যই সকলকে সাবধান করবার

উদ্দেশ্যে ভগবান তার লেজে ঝুমঝুমি জুড়ে দিয়েছে। ফৌজদারের সঙ্গেও আছে লাঠির ঠকঠক।

ভয় নাই আমি চোখ কান খুলে আছি—বলুন।

তারাচরণবাবু শুরু করলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় হরিপদ ঢুকতেই ক্রোজেট সাহেব গর্জে উঠল—What an ওল্‌ড শুয়ার you are! তুমি বলেছিলে অবিনাশ মাস্টারকে 'Decasted' করবে, এখন শুনছি তার মেয়ের ভালো বিয়ে হয়ে গেল।

হরিপদ হাত জোড় করে নিবেদন করলো, কি করবো হুজুর, সবাই যে তলে তলে স্বদেশী জানবো কি করে? সারদা রায় তো ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হয়নি।

রায়বাহাদুর তো হল। তুমি কি বলতে চাও সেও স্বদেশীওয়ালা!

অবিনাশবাবুর চেয়েও বেশি। এখন রায়বাহাদুরের বাড়িতে বিলিতি কাপড়, বিলিতি লবণ, বিলিতি চিনি ঢুকতে পারে না।

রায়বাহাদুবরের এমন পরিবর্তন কবে থেকে হল?

কেমন করে বলবো, আমার বিশ্বাস গোড়া থেকেই ছিল তবে তলে তলে।

এই তো সেদিন ঘটা করে মহারানীর শ্রাধ্‌ Ceremony করলো।

তার পরে আট বছর গিয়েছে, হিসাব করে দেখুন।

বীরেন বলল, আমার তো ইচ্ছা হয় গোটা বৃটিশ জাতটার শ্রাধ্‌ Ceremony করি।

কার না অনিচ্ছা তবে মনে মনে করাই আপাতত নিরাপদ।

কিন্তু দাদা ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরার খোশখবর জানলেন কী করে?

তারাচরণ রহস্যময় হাসি হেসে বলল, ম্যাজিস্ট্রেটের কনফিডেনশিয়াল টাইপিস্ট রমেশ আমার মাসতুতো ভাই। ঘরের এক কোণে বসে এক মনে টাইপ করে যায়, কানে কিছু এড়ায় না। যেদিন যা শোনে বাড়ি যাওয়ার পথে আমার কানে দিয়ে যায়।

তা নইলে আর কনফিডেনশিয়াল টাইপিস্ট বলেছে কেন।

তোমাকে বললাম ভায়া, দেখো পাঁচকান না হয়।

কোনো ভয় নেই দাদা, আপনিই করবেন।

করবো বৈকি, তবে এত জল মেশাবো যে দুধে হাত পড়বে না, তা হলে বেচারার চাকুরিটা যাবে।

আমার কাছ থেকে কথা বের হবে না। তবে আমার বেলাতে যে কত জল মেশালেন তার ঠিক কি।

আরে না না, তোমার কথা আলাদা, তোমাকে খাঁটি দুধ দিয়েছি।

সকল গোয়ালাই ঐ কথা বলে। কিন্তু দাদা হরিপদ তা হলে রায়বাহাদুরকে সহজে ছাড়বে না, তার জন্যেই বেচারার হেনস্তা।

হরিপদ কি একটু মনুষ্যি। রায়বাহাদুরকে এবার জাত সাপে ছুঁয়েছে। স্বদেশীর পাণ্ডা বলে তাঁর নামে গোপনীয় রিপোর্ট চলে গিয়েছে, অবিনাশবাবুদের নামে তো অনেক আগেই গিয়েছে।

তাহলে দেখছি তাঁর পক্ষে রায়বাহাদুর পদবীটা রক্ষা করা কঠিন হবে।

ও হিসাব করে অযথা উল্লসিত হবেন না, মাঝখানে ওল্ড শুয়োর হরিপদ আছে।

পাগল! আমি ও সবের প্রার্থী নই। ভাবছি এবারে সরকার তাহলে জোর ধরপাকড় শুরু করবে।

শুরু করবে কী! করেছে। কালকের হিতভাষী কাগজখানা পড়ে দেখবেন। বড়বাজারে আর বউবাজারে বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করবার দায়ে একশ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে—সবাই ছোকরা, তার মধ্যে কলেজের অধ্যাপক আছে কয়েকজন।

তারাচরণ বলল, এই ডামাডোলের মধ্যে শচীনকে কলকাতায় যেতে দেওয়া রায়বাহাদুরের উচিত হয়নি।

তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাঁর স্ত্রী গিয়ে বলল, শচীন কলকাতায় যেতে চায়। উত্তর হল, যেতে চায় যাক, তবে আমি এখন বউমাকে ছাড়ছি নে।

সে কী, ছেলে নতুন বিয়ে করেছে।

রায়বাহাদুর এক গাল হেসে বললেন, আরে আমিও যে নতুন শ্বশুর হয়েছি। আচ্ছা দেখি বউমাকে জিজ্ঞাসা করে।

তোমার যেমন বুদ্ধি! বউমানুষ কি হ্যাঁ বলবে।

তবে না হয় মলিকে জিজ্ঞাসা করি।

মলি এককাঠি সেরা তারাচরণদাদা, সে এসে বলল, বউদিদি তো যাবেই, সঙ্গে আমিও যাবো।

নাও হল তো, বললেন গিন্নি।

কর্তা বললেন, তবে কারো যাওয়া হবে না, শচীনেরও নয়।

মলি সরে গেলে গিন্নী বললেন, তা যেন হল, নিজের মেয়ের বিয়ের কী করছ?

পাড়ার কারো মেয়ের বিয়ে হলেই মায়েদের মনে পড়ে যায় তার মেয়ের বিয়ে এখনো হল না। না, আর দেরী করা নয় বলে গিয়ে পড়ে ক্লান্ত স্বামীর ঘাড়ের উপর। এ ক্ষেত্রেও তাই হল।

রায়বাহাদুর ভাঙেন তবু মচকান না, বললেন, সময় হলেই হবে, ছেলের বিয়ে তো হয়ে গেল, ভাবতে পেরেছিলে এত শীগগির হবে।

গিন্নী হাতের আঙুলে একটা অজ্ঞেয় মুদ্রা প্রদর্শন করে প্রস্থান করলেন। বউমাকে ছাড়তে হবে না, মনটা খুশি ছিল।

এমন সময় সুরেন বাঁড়ুজ্জের জরুরি তার এল—'কাম ইমিডিয়েটলি'। বাস মীমাংসা হয়ে গেল। শচীনকে একাকী রওনা হতে হল।

ভায়া কিছু মনে কোরো না একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। রায়বাহাদুরের বাড়ির এত গোপনীয় ব্যাপার জানলে কি করে।

আরে সেখানে যে আমার কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক উপস্থিত ছিল।

তোমার আবার কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক এলো কোথা থেকে?

সবার যেখানে থেকে আসে—শ্বশুরবাড়ি থেকে।

তারাচরণবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

বীরেন চৌধুরী চোখের ইশারা করে চাপাস্বরে বলল, দাদা র‍্যাট্‌ল সাপ।

লাঠি ঠকঠকিয়ে অক্ষয় ফৌজদার ঘরে ঢুকে বলল, আরে খবর শুনেছ, অবিনাশ মাস্টার গ্রেপ্তার হয়েছেন। শুনে পালিয়ে এলাম।

তোমার ভয় নাই দাদা, তবে স্বদেশীওয়ালাদের হাতে দেশের ভার এলে কী হয় বলা যায় না।

না ভাই আমি কোন দিকে নেই।

আরে তাদেরই তো ভয় বেশি, দুই দলেরই তারা লক্ষ্য।

তারাচরণবাবু শুধালেন, কখন গ্রেপ্তার হলেন?

বিকালবেলায় স্কুল কলেজ ভাঙবার পরে।

কী দায়?

সেটা যারা ধরেছে তাদের দায়। আসতে আসতে দেখে এলাম এরই মধ্যে দেয়ালে দেয়ালে কাগজ সেঁটে লিখে দিয়েছে আগামীকল্য স্কুল কলেজ বাজার সব বন্ধ।

আদালত?

আদালত আর বন্ধ হয় কী করে! তবে লিখেছে আদালতে যাওয়ার পথে পিকেটিং করা হবে।

এই আবার এক হাঙ্গামা শুরু হল।

বীরেন চৌধুরী বলল, মন্দর ভালো। একটা দিন ছুটি পাওয়া যাবে।

তোমার কী ভায়া, আমাদের যে দিন ভিক্ষা তনু রক্ষা।

আগামীকল্যের চিন্তায় উদ্বিগ্ন আড্ডাধারীরা সভাভঙ্গ করে প্রস্থান করলো।

পবদিন সকালে দেখা গেল শহরে বাজার বসেনি, দোকানপাট অধিকাংশ বন্ধ, আর টমটম ও পালকি গাড়িগুলো আস্তাবল ঘেঁষে বেকার দাঁড়িয়ে আছে। পথে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে পুলিশগুলো রুল দিয়ে দোকানের ঝাঁপে আঘাত করে যাচ্ছে—এই, দোকান খোলো জলদি। কেউ গা করছে না।

ইস্কুলের বেলা হলে দেখা গেল সরকারী স্কুল ছাড়া কোন স্কুল কলেজ টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসা কোনটাই খুললো না।

শহরে রানী বাজার আর সাহেব বাজার দুটো সবচেয়ে বড়। বড় বড় দোকান আড়ৎ মারোয়াড়ীর গদি সব এখানে। অধিকাংশ দোকান বন্ধ থাকলেও অনেকগুলো খুলেছিল। সেই সব দোকানের সামনে স্কুলের ছেলেরা পিকেটিং শুরু করে দিল। অতুল, নৃপেন, ভূপতি প্রভৃতি শিক্ষকের দল, সঙ্গে কিছু ছোকরা উকীলও ছিল, চারদিকে ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছিল পিকেটাররা কোন খদ্দেরের উপর জুলুম না করে।

টিনকু, ওটা ঠিক হচ্ছে না। উনি কিনতে চাইছেন কিনতে দাও। তোমার কাজ অনুরোধ করা, বাধা দেওয়া নয়।

গোপাল, এটা কী করলে! যাও শীগগির ওঁর কাছে ক্ষমা চাও। কেন ওঁর হাত ধরলে।

করিম, তোমার পন্থা মন্দ নয়। মুখে কোন কথা না বলে খদ্দেরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা। সবাই শিখে নাও। ঐ দেখো ভদ্দরলোক ফিরে চলে গেলেন, মুখে বলে কি ওঁকে নিরস্ত করতে পারতে।

এই ভাবে সতর্কবাণী ও উপদেশ দিয়ে অতুলদের দল দুই বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ভূপতি শুধালো, কাছারির পথে ছেলেদের পাঠিয়ে দেব তো? উকীলবাবুদের পাল্কি গাড়ি আর মক্কেলদের টমটম আটকাতে হবে।

ভূপতি, তোমার মুখে কথা আটকায় না।

কথা না আটকাক গাড়ি আটকালেই হবে।

আচ্ছা ভাই অতুল, জিজ্ঞাসা করি, কাকে অনুরোধ করবে, উকীলবাবুকে না কোচম্যানকে, না ঘোড়া দু'টোকে?

নৃপেন বলল, ঘোড়া দু'টোকে বললেই বেশি ফল পাওয়া যাবে, না চলতে পারলে ওরা বাঁচে।

সবাই হেসে উঠল।

অতুল বলল, কাছারীর পথে স্বদেশী স্কুলের ছেলেদের পাঠিয়েছি।

শহর থেকে কাছারী মাইল দুই পথ।

উকীলদের মধ্যে যারা ধরি মাছ না ছুঁই পানি তারা সোজা পথে না গিয়ে মোতিবাগান হয়ে ঘুরপথে গেল। পথে পিকেটিং আরম্ভ হওয়ার আগেই হরিপদ কাছারিতে গিয়ে পৌঁছল। ভরসা ছিল বটতলার বড় বড় রসগোল্লাগুলোর উপরে। গিয়ে দেখল বটতলা ফাঁকা, মাছি উড়ছে, তখন সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর রেগে গেল মায় খোদ ক্রোজেট সাহেবও বাদ গেল না। তারাচরণবাবু যে কোন্ ফাঁকে কোন্ পথে গেলেন কেউ টের পেল না। বীরেন চৌধুরী তলে তলে স্বদেশী, দুপুরবেলা পেট ভরে খেয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করে নিল। এমন সুযোগটি দেওয়ার জন্য পিকেটার, সুরেন বাঁড়ুজ্জে, মায় বঙ্গজননীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত রইলো না।

কাছারি যাওয়ার পথে কেউ বাধা না পায় সেজন্যে পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই সাহসে কাছারি যাত্রীরা পিকেটারদের অনুরোধে কান না দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিল।

বারে বারে অবজ্ঞাত হওয়ায় পিকেটারদের রোখ চেপে গিয়েছিল। সামনে একখানা পালকি গাড়ি দেখতে পেয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল তারা, কোচম্যান ঘোড়াকে চাবুক লাগাতে গেলে আঘাতটা লাগলো ছেলেদের গায়ে, তারা কোচম্যানকে টেনে নামিয়ে ফেলল। তখনই কোথা থেকে কয়েকজন পুলিশ এসে বিনা ভূমিকায় বেধড়ক লাঠি চালাতে লাগল ছেলেদের উপরে। ঠিক সেই সময় রায়বাহাদুরের গাড়ি এসে পৌঁছল সেখানে। দেখলেন ছেলেদের বেদম মারছে, তিনি মুখ বের করে পুলিশদের নিষেধ করলেন। তার ধারণা ছিল তাঁকে চিনতে পারলে ছেড়ে দেবে। এই ভয় করেই পুলিশসাহেব অন্য জেলা থেকে একদল পুলিশ আমদানি করেছিল। চেনা লোক ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষার ব্যাপারে বড় বালাই।

রায়বাহাদুর বারবার চিৎকার করে বললেন, আরে বেকসুর মারতা কাহে, ছোড় দো।

একজন পুলিশ বলে উঠল, আরে বুঢ্‌ঢা চুপ রহো।

তখন গাড়ি থামিয়ে রায়বাহাদুর নেমে পড়ে ছেলেদের আগলে দাঁড়ালেন। ফলে হল এই যে একটি পাকা ছাপরাই লাঠি রায়বাহাদুরের মাথায় এসে পড়লো। তিনি অজ্ঞান হয়ে

গেলেন। কাছেই ছিল মিশনারী হাসপাতাল, গাড়িতে তুলে সেখানে নিয়ে গেল তাঁকে ছেলেরা। আঘাত এমন গুরুতর নয় তবে সামান্য একটুখানি রক্ত বেরিয়েছিল। ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে ছেড়ে দিল, ততক্ষণে রায়বাহাদুর সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেছেন।

ছেলেরা বলল, স্যার, আপনি বাড়ি ফিরে যান।

কী করবেন ভাবছেন রায়বাহাদুর, এমন সময় একজন পুলিশ ইনস্পেকটার এসে জানালো, স্যার, আপনার উপরে পরোয়ানা আছে, কাছারিতে যেতে হবে।

তিনি যে আইনত গ্রেপ্তার হলেন ভদ্রতাবশত সে কথাটা উচ্চারণ করলো না লোকটি, তবে রায়বাহাদুরের বুঝতে অসুবিধা হল না। লোকটা স্থানীয়। স্থানীয় লোক শাসনকার্যের প্রধান বাধা। এইজন্যে বোধ করি বিচক্ষণ বৃটিশ সরকার ভারতে গোরা পল্টন এবং অন্য দেশে গুর্খা পল্টন পাঠিয়ে থাকে।

রায়বাহাদুর রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে গিয়ে শুনলেন পুলিশের শান্তিরক্ষাকার্যে বাধা দেওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েকজন উকীল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জামিনের দরখাস্ত করলো। জামিন মিলল না। অতিশয় গুরুতর অপরাধ। রায়বাহাদুর হাজতে গেলেন।

রায়বাহাদুর হাজতে গিয়েছেন সংবাদ শহরে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল, তখন আর ছেলেদের সংযত রাখা সম্ভব হল না। যে কয়খানি দোকান ছিল ভয়ে ভক্তিতে বন্ধ হয়ে গেল। আর ছেলেরা এক বস্তা বিলিতি কাপড় মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্কের কাছে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ছাপরাই লাঠির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। শহরময় হল্লা আগুন অশান্তি।

ম্যাজিস্ট্রেট বাংলোয় বসে ঐতিহাসিক নজিরের বলে সিদ্ধান্ত করলো এ সমস্ত সেই 'ড্যা-ড মানিকটলা বোমের' প্রভাব। তিনি আরও কিছু পুলিশ আনিয়ে নিলেন সাহেবপাড়াতে।

পরদিন ম্যাজিস্টেটের এজলাসে রায়বাহাদুরের বিচার। শহরের লোক ভেঙে পড়লো। ভিড় ঠেকাতে পুলিশ হিমসিম হয়ে যাচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট এজলাসে বসলে প্রবীণ উন্নতবপু রায়বাহাদুর ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথায় যখন প্রবেশ করলেন ক্ষণকালের জন্য জনতা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে ধ্বনি উঠল শেম শেম, সরকার পক্ষের উকীলরূপে প্রবেশ হরিপদ রায়ের। হরিপদর কাছেও এতটা কেউ আশা করেনি। পরে অবশ্য হরিপদ বোঝাতে চেষ্টা করেছে কর্তব্য সব সময়ে মনের মতন হয় না ভাই। তবে লোকে বুঝলো মনে হয় না, কারণ অল বেঙ্গল লোন আফিসের আড্ডায় সে একঘরে হয়ে গেল।

বিচারে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগলো না। সরকারপক্ষের নালিশ শান্তিরক্ষাকার্যে বাধাদান। রায়বাহাদুরের পক্ষের উকীলের মন্তব্য শান্তিরক্ষাকার্যে সাহায্যদান।

ম্যাজিস্ট্রেট এই অসুবিধানজক মন্তব্য নথিভুক্ত করলো না। এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হল রায়বাহাদুর যজ্ঞেশ রায়ের। রায়দান হয়ে গেলে পুলিশ ইন্‌সপেকটারের সঙ্গে তিনি যখন বাইরে আসছেন জনতা ধ্বনি দিল বন্দেমাতরম্। তার পরে যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠল, 'আয় হরে, একবার বাইরে আয়।'

রায়বাহাদুরের সাজাতে শহরে লোক যথার্থ দুঃখিত হল, সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল এই সজ্জন দয়ালু পরোপকারী লোকটির প্রতি। তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল। মানুষে কোনো প্রবীণ ব্যক্তির মধ্যে পিতৃরূপের প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিপদে-আপদে যাকে অবলম্বন করা যায়। রায়বাহাদুর সকলের অগোচরে সেই Father Figure-এ পরিণত হয়েছিলেন। পিতার অপমানে যে খুশি হয় সে কুলাঙ্গার।

রায়বাহাদুর জেলগেটের বাইরে এসে বিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী কাণ্ড! এ যে রথের মেলা দেখছি! অতুল, এ করেছ কী!

আজ্ঞে সবাই আপনাকে নিতে এসেছে।

নিতে এসেছে, কেন আমি কি বাড়ির পথ চিনি না?

সতীর্থদের অনেককেই চোখে পড়লো, প্রায় সকলেই বয়সে ছোট।

মুন্সী, তালুকদার, আরে আপনিও যে এসেছেন তারাচরণবাবু!

তারাচরণবাবু ঝোপ বুঝে কোপ মারেন, বুঝেছিলেন জনমত এখন রায়বাহাদুরের দিকে, তাই ভাবলেন একবার দেখা দিয়েই যান, ভিড়ের মধ্যে কি আর পুলিশের লোকে খেয়াল করবে। তা ছাড়া তাজপুরের বিয়ে ভেঙে দেওয়ার জন্য মনের মধ্যে একটা গ্লানিও ছিল। বললেন, আসবো না, ভাবলাম জেলগেটে গিয়ে দর্শন করে আসি।

মুন্সী প্রবীণ লোক, বলল, রায়বাহাদুর, যে কাল পড়েছে জেলগেট এখন তীর্থ হয়ে দাঁড়াবে।

আরে শৈলেনখুড়ো, এই ভোরবেলা কষ্ট করে আসতে গেলে কেন? বাড়ির সকলে ভালো তো, বউমা, সুশীল, আর সকলে? শচীন বোধ করি আসতে পারেনি।

অতুল বলল, নিন, এখন গাড়িতে উঠুন।

বাড়ি থেকে জুড়িগাড়ি এসেছিল।

অতুল, অবিনাশবাবুর খবর কী?

তাঁকে কয়েকদিন আগে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে।

কোথায়?

কোথায় জানায়নি, বোধ করি কোনোখানে অন্তরীণ করে রাখবে।

অপরাধটা কী?

অপরাধের আবার অভাব—সব হাঙ্গামার মূলে নাকি তিনি।

যাক তবু ভালো যে তোমরা বাইরে আছ।

বোধ করি বেশি দিন নয়। সে-সব কথা পরে হবে—এখন চলুন।

রায়বাহাদুর গাড়িতে উঠতেই এক কাণ্ড ঘটলো। ছেলেরা এগিয়ে এসে ঘোড়াদুটোকে খুলে দিল, বলল, অনেক বোঝা বয়েছিস, যা আজকে তোদের ছুটি। এই বলে তারা গাড়ি টানতে শুরু করলো।

আরে আরে, এ কী করছ বাবারা, ছেড়ে দাও, না হয় আমি নামি।

ছেলেরা বলল, যেমন বসে আছেন থাকুন, আমরা টেনে নিয়ে যাবো।

অতুল, এ-সব তোমাদের শিক্ষা।

না স্যার, আমরা শিক্ষা দিই কী করে বোঝা ফেলে দিয়ে ফাঁকি দিতে হয়। এ ওদের নিজেদের উদ্ভাবন। আপনি নামবার চেষ্টা করবেন না, আজ ওরা ছাড়বে না।

অগত্যা রায়বাহাদুর বসে রইলেন। গাড়ি চলতে শুরু করতেই ব্যান্ড বাজতে আরম্ভ করল। ব্যান্ড ওরা যোগাড় করে এনেছিল। লোকের ভিড়ে চোখে পড়েনি রায়বাহাদুরের।

তিনি অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, এ যে বিয়ের বরযাত্রা দেখছি। জেল-ফেরত আসামী আগে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাড়ি ফিরত, এখন যায় ব্যান্ড বাজিয়ে।

কাল যে বদলে গিয়েছে স্যার—বলল অতুল।

গাড়ি ধীরে ধীরে চলছিল কাজেই কথোপকথন চলবার অসুবিধা ছিল না।

রায়বাহাদুরের বাড়ির দরজায় কলাগাছ পুঁতে পূর্ণকুম্ভ বসিয়ে অভ্যর্থনার আয়োজন করে রাখা হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে শীতলপাটি পেতে নতুন শাড়ি পরে নিস্তারিণীদেবী ও রুক্মিণী অপেক্ষা করছিলেন। সুশীল বাইরে—তদারকিতে ছিল।

রুক্মিণী বলল, মা, এ সময়ে উনি এলেন না, বাবা দুঃখ পাবেন।

দুঃখ পেলেই হল! দেখো-না ছেলে কী লিখেছে।

রায়বাহাদুরের জেলের সংবাদ দিয়ে আসতে লিখেছিলেন নিস্তারিণীদেবী। তাব উত্তরে শচীন যে চিঠি লিখেছিল সেখানা গীতার মতো হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে—এক দণ্ড কাছছাড়া করতেন না। চিঠিখানা অনেক বার দেখেছে রুক্মিণী তবু আবার দেখতে হল।

এই দেখ কী লিখেছে—এই যে এইখানে। 'মা তুমি যেতে লিখেছ, যাওয়া উচিত, কিন্তু নিরুপায়। বাবা দেশের কাজ করে জেলে গিয়েছেন, আমিও এখানে সেই কাজটাই করছি, জেলে যাওয়ার পথ সুগম করছি, বোধ করি আর বেশি দেরিও নেই, শীঘ্রই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবো মনে হচ্ছে। ছেলেদের দিয়ে পিকেটিং করাবার ভার আমার উপরে, ওখানে যেমন অতুলের উপরে। সুরেনবাবু আমার উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করেন। কাজেই যাওয়ার উপায় কি। সুশীল তো ওখানে আছে। মা, আমার চেয়ে তোমাকে কেউ বেশি জানে না। বাবার জেলে যাওয়ায় তুমি যত দুঃখ পেয়েছ তত পেয়েছ আনন্দ।'

কিছুক্ষণ থামলেন নিস্তারিণীদেবী, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝলে মা, শচীনের মতো কেউ আমাকে বোঝে না, আর বুঝবেই বা না কেন, পেটের ছেলে তো। যেদিন ওঁর জেল হল ঠাকুরকে ষোড়শোপচারে পুজো দিলাম, তারপরে সারাদিন বিছানায় পড়ে কাঁদলাম অবশ্য তোমাদের লুকিয়ে।

রুক্মিণী বলল, মা, আমি তোমাদের ঘরে আসবার পর থেকে কেবলই দুঃখ পাচ্ছ।

তোমার মায়ের কথা ভেবে দেখো, তাঁর দুঃখ কি আমার চেয়ে কম। আর দুঃখই বা কোথায়? এখন দেশের ঘরে ঘরে এই দুঃখ। যে দুঃখ অযাচিত সকলের ঘরে সে দুঃখ সুখের বাড়া।

এমন সময়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কানে এলো।

রুক্মিণী বলল, ঐ যে মা, বাবা আসছেন, ছেলেরা জয়ধ্বনি করছে।

রায়বাহাদুরের গাড়ি দরজার সামনে আসতেই বাড়িতে শঙ্খধ্বনি হল। তিনি গাড়ি থেকে নেমে বললেন, বাবারা, তোমরা খুব করেছ। একদিন মিষ্টিমুখ করিয়ে দেবো।

একটি ছেলে বলল, ঘোড়াকে কি সন্দেশ খাওয়ায়। বলুন ছোলা ভিজে খাওয়াবো।

রায়বাহাদুর হেসে বললেন, আচ্ছা বাবা না হয় তাই হবে, তার সঙ্গে সন্দেশ।

তাঁর চোখে পড়লো গেটের সঙ্গে গাঁথা পাথরে খোদাই নামের সঙ্গে রায়বাহাদুর পদবী।

সুশীল, এখনো ওটা খুলে ফেলিসনি! খোল্, খোল্।

জেলে থাকতেই সরকারী চিঠিতে জেনেছিলেন তাঁর রায়সাহেব, রায়বাহাদুর পদবী বাতিল করে দেওয়া হল।

আদেশ পাওয়া মাত্র ছেলেরা কোথা থেকে শাবল জোগাড় করে এনে মুহূর্তমধ্যে পাথরখানা খসিয়ে ফেলল।

এখানা কি করবো?

দে ঐ ডোবায় ফেলে।

ঝুপ করে পাথরখানা ডোবার জলে গিয়ে পড়লো।

তিনি বললেন, পচা ডোবার জলে রায়বাহাদুর পদবীর বিসর্জন সমাধা হল।

ছেলেরা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, বন্দেমাতরম্।

তিনি ভিতরে গেলে সকলে প্রণাম করলো।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, অবিনাশবাবুর স্ত্রীকে দেখছি নে যে!

তিনি বাড়িতে আছেন।

একা! এতোদিন আনা উচিত ছিল। কেন এটা কি তাঁর বাড়ি নয়। বউমা, শচীনের মা না হয় বুড়ো হয়েছেন, সব কথা খেয়াল থাকে না, তোমার উচিত ছিল মনে করিয়ে দেওয়া। বউমাকে নিয়ে এখনই গাড়ি করে যাও, বাড়িঘর বন্ধ করে একজন চাকরকে পাহারা রেখে তিনি এখনই এ বাড়িতে এসে যেন পায়ের ধুলো দেন।

আমরা যাচ্ছি। তুমি ততক্ষণ স্নান করে জলযোগ করে নাও।

না, রুক্মিণীর মা না এসে পৌঁছনো অবধি আমি জলগ্রহণ করবো না।

নিস্তারিণীদেবী রুক্মিণীকে নিয়ে অবিনাশবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কুড়ি

বেঙ্গলী পত্রিকার অফিসে বসে সুরেন বাঁড়ুজ্জে ও ভূতপূর্ব রায়বাহাদুর যজ্ঞেশ রায়ের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। সম্পাদকের চেয়ারে সুরেনবাবু, সম্মুখের চেয়ারখানায় যজ্ঞেশবাবু।

সুরেনবাবু বললেন, রায়বাহাদুর—

যজ্ঞেশ রায় বাধা দিয়ে বললেন, আর রায়বাহাদুর কেন!

তা বটে—পুরানো অভ্যেস যেতে চায় না, এখনও কখনও কখনও চিঠি পাই সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আই সি এস বলে। যাই হোক, যজ্ঞেশবাবু আপনি যে আমার চিঠি পেয়ে এসেছেন, বড় খুশী হলাম।

কী বলছেন, আজ বাংলা দেশে এমন কে আছে আপনার আহ্বান পেয়ে না আসবে, কিন্তু কারণটা এখনও বুঝতে পারলাম না।

শচীনকে দেখেছি, একবার ভাবলাম তার বাবাকে দেখি, এখন ভাবছি কাকে দেখব।

ছেলেটাকেই দেখবেন, আমার আর কয়দিন।

ওকে না দেখে পারবার উপায় আছে, হীরের টুকরো অন্ধকারে জ্বলে। আর ও একটা কারণ আছে। আমি দেশব্যাপী যে আন্দোলন করতে চাই জেলায় জেলায় তার সাহায্যের জন্য যোগ্য সহকর্মী আবশ্যক। ঢাকায় আছেন আনন্দ রায়, ফরিদপুরে অম্বিকা মজুমদার, চট্টগ্রামে যাত্রামোহন সেন। উত্তরবঙ্গে যোগেন চক্রবর্তী, এবারে আপনাকে পেয়ে দিনাজশাহীর সহকর্মী পাওয়া গেল।

আর কলকাতায়?

কলকাতাকে নিয়েই বিপদ, এখানে সহকর্মীর সংখ্যা কিছু বেশি।

কী রকম?

এই ধরুন না কেন আমি আছি, অমত্তবাজারের মোতিবাবু আছেন, বিপিন পাল আছেন, অরবিন্দবাবু আছেন, প্রবীণদের মধ্যে আছেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—

অমনি রবিবাবুকেও ধরবেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁকে ধরতে হবে বৈকি। গান দিয়ে মাতিয়ে রেখেছেন। তবে কী জানেন তিনি যে ঠিক কী চান বুঝতে পারি না। কখনও মনে হয় বর্তমান যুগ ছেড়ে প্রাচীন তপোবনে চলে যেতে বলছেন, কখনও মনে হয় শহর ছেড়ে গাঁয়ে গিয়ে চাষাভুষোদের সামিল হতে বলছেন—

কবি কিনা—

সেই তো হয়েছে মুশকিল। কবির কথার উপরে নির্ভর করে রাজনীতি করা চলে না। সেদিন মহারাজা সুন্দর বললেন, আমাদের বংশে ঐ একটি ছেলে, ওর কথায় কান দেবেন।

বললাম, মহারাজ কান তো দিই, মন দিতে পারি না যে।

তা হলে কলকাতায় নেতার অভাব নেই।

অভাব নেই তবে সদ্ভাবও নেই, কারও সঙ্গে কারও মত মেলে না। অরবিন্দবাবু বিপিন পাল আগুন জ্বালাতে চান, মোতিবাবু যথাসাধ্য ফুঁ দিচ্ছেন যাতে নিভে না যায়। আমার বিশ্বাস আইনের পথে চলেই আমাদের দাবি আদায় সম্ভব।

আর মহারাজা—

তাঁর চেষ্টা একেবারে দলছুট না হয়ে যায়—সকলকে মিলিয়ে রাখতে চান। চলুন, এখুনি আপনাকে নিয়ে মহারাজার কাছে যাব। সেখানে দেখা হবে মোতিবাবুর সঙ্গে।

সেখানে কেন?

সুরেনবাবু হেসে উঠে বললেন, এ সেই রাজস্থানের পুরানো কথা—তুমি যদি জয়সিংহ হও মনে রেখো আমিও অভয়সিংহ। সেই জন্যে বৌবাজার আর বাগবাজারের মাঝামাঝি পাথুরেঘাটায় দু'জনের মিলনের স্থান ঠিক হয়েছে।

সুরেনবাবু. এ অবস্থা বাংলাদেশের সর্বত্র। তবে কলকাতা রাজধানী কিনা—তাই মাত্রাটা কিছু বেশি।

কম করে বললেন, এখানে সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে, উৎসাহের বন্যা কূল ছাপিয়ে গিয়েছে, এর পরে যখন ভাঁটার টান আরম্ভ হবে—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে বললেন, জাতের প্রাণশক্তি বুঝতে পারা যায় ভাঁটার টান রোধ করবার সামর্থ্যে। চলুন রওনা হওয়া যাক।

গাড়িতে যেতে যেতে সুরেনবাবু শুধালেন, আচ্ছা অবিনাশবাবুর চিঠিপত্র পান তো?

মাসে একখানা করে চিঠি লিখবার হুকুম, আসে তবে আলো-আঁধারি রকমের।

সে আবার কী রকম?

এক ছত্র যদি হাতের লেখা—তিন ছত্র কালি লেপটান, এমন গাঢ় কালি, কী লেখা ছিল বোঝবার উপায় নাই। এই ধরুন না কেন—প্রথম ছত্র "আরামবাগে আরামে আছি।" তারপরেই কালির ছোপ—আবার ধরুন, "পাচকের বেতন দু'টাকা আর দুধ খুব সস্তা।" তার পরেই ঘোরতর অন্ধকার, জানতে দিতে চায় না কী লেখা ছিল।

ওঁকে বুঝি আরামবাগে রেখেছে? জায়গাটাকে ম্যালেরিয়ার রাজধানী বললেই চলে। একদিন কাউনসিলে প্রশ্ন করেছিলাম এ সব অস্বাস্থ্যকর স্থানে অন্তরীণদের রাখা হয় কেন? উত্তর পেলাম, আমাদের রিপোর্টে ও সব স্থান খুব স্বাস্থ্যকর। ওদের উদ্দেশ্য হাতে না মেরে রোগে মারা।

তখন আপনি কী বললেন?

কী আর বলব! বললাম, হ্যাঁ নেপোলিয়ানকে যেমন অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর দ্বীপ সেন্ট হেলেনায় রাখা হয়েছিল, সরকারী রিপোর্ট অনুসারে যেখানে অধিকাংশ গোরা সৈন্য লিভার পেকে মারা যেত। উত্তর হল সেটা রোগে নয় মদে। বললাম এখানেও তার ব্যবস্থা আছে, তবে অন্তরীণ ছোঁয় না এই যা। তার পরে বললেন, এই যে এসে পড়েছি।

সুরেন বাঁড়ুজ্জের চিঠি পেয়ে যজ্ঞেশবাবু কলকাতায় এসে পৌঁছলে শচীন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাঁকে নিজের বাসায় নিয়ে গিয়েছে। তারপরে বিশ্রামান্তে স্নান ও জলযোগ করিয়ে পৌঁছে দিয়েছে বেঙ্গলী অফিসে, বলে গিয়েছে আমি এখন চললাম, কখন ফিরব স্থির নেই, আপনার কাজ শেষ হলে বাসায় ফিরে খেয়ে নিয়ে ঘুমোবেন।

আর তোমার?

আমি তো স্নান করেই বেরোলাম, আহার কোনো মেসে বা কারও বাড়িতে হবে। চাই কী রাজভবনেও হওয়া অসম্ভব নয়।

তার মানে?

হাজতে।

ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে নাকি?

যে কোন মুহূর্তে। ধ্রুবেশ নারায়ণ নন্দ ওদের ধরেছে, ওরা সবাই আমার সহকর্মী।

পুত্রের কথা শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন—বললেন, তাই তো!

চিন্তা করছেন কেন বাবা, আপনিও তো বুড়ো বয়সে জেল খেটে এসেছেন।

আমি তো কোন পরিকল্পনা করে যাইনি। ছেলেদের মারছে দেখে ঝোঁকের মাথায় লাফিয়ে পড়েছিলাম। যাকগে, জেলে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে অপমান করতে চাই নে

তোমাকে, তবে তার আগে তোমার মা বউমার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল।

দু-তিন দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার না হলে যাব একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। এখন বের হই বাবা, আজ অন্তত জন ত্রিশেক ভলান্টিয়ার জোগাড় করতে হবে মেসে মেসে ঘুরে।

এসব শচীনের বাসায় সকালবেলাকার পিতাপুত্রের কথোপকথন।

সুরেন বাঁড়ুজ্জে আর যজ্ঞেশ রায় গাড়িতে চলেছেন। তাঁরা দেখতে পেলেন ভলান্টিয়ারদের বিভিন্ন দল মাথায় গেরুয়া পাগড়ি গান গাইতে গাইতে চলেছে। যজ্ঞেশবাবুর কানে এসব গান নূতন।

একদল গাইতে গাইতে গেল, "সোনার দ্যাশে শয়তান আইয়া আগুন জ্বালাইল, মোদের ফকির বানাইল।" আর এক দলের মুখে—"নগরে নগরে জ্বালরে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ, বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত, মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই।" তৃতীয় দল গাইছে—"ছিল ধান গোলাভরা, খেত ইন্দুরে করল সারা।"

দল ভিন্ন ভিন্ন, তবে প্রেরণা এক, গতিও একমুখী, বিলিতি জিনিস বিক্রেতাদের দোকান। রাস্তার দুদিকে লোক জমে গিয়েছে, দোতলায় জানলা দিয়ে মেয়েরা দেখছে, কোথাও বা উৎসাহের আতিশয্যে শঙ্খ বাজছে, খই পড়ছে মাথার উপরে। অফিস-যাত্রীরা একবার থমকে দাঁড়িয়ে দেখে আবার দ্রুততর চলছে। গায়কদের দলও বৌবাজার বরাবর চলে চিৎপুর রোডে পড়ল তারপরে উত্তরমুখ হয়ে চলল বড়বাজারের দিকে।

যজ্ঞেশবাবু শুধালেন, এদের সকলকেই ধরবে নাকি?

পাগল হয়েছেন, এত জায়গা কোথায় জেলে? তা ছাড়া এরাই তো সব নয়—এমন ছোট বড় শ'খানেক দল শহরময় বের হয়েছে, রোজ হয়।

ধরা পড়ে ক'জন?

খুব বেশি হবে তো পাঁচ সাত দশজন মাথালো গোছের ছোকরা। আমার কলেজের অনেক তরুণ অধ্যাপক ধরা পড়েছে—হতাশ হবেন না, শীঘ্রই শচীনকেও ধরবে।

এতদিন ধরেনি এই আশ্চর্য।

ধরেনি তার কারণ গর্ভমেন্ট একটা নীতি মেনে ধরপাকড় করে। ছোটদের দিয়ে আরম্ভ করে শেষে ধরে পালের গোদাটাকে। সাধারণ ভলানটিয়ারদের ছোঁয় না—রক্তবীজের ঝাড় কত ধরবে।

এত ক্ষণ মহারাজা চুপ করে শুনছিলেন, তাঁর খাসকামরাতেই আলোচনা হচ্ছিল, লোক চার জন, মহারাজা, সুরেন বাঁড়ুজ্জে, মোতিলাল ঘোষ আর যজ্ঞেশ রায়। এ বারে মহারাজা বললেন, আপনাদের কথা তো শুনলাম, এ বারে বুড়ো মানুষের একটা কথা শুনুন। অমৃতবাজার আর বেঙ্গলী বাঙালী সমাজের দুই চোখ, অবশ্য হিতবাদী আছে তবে তা বাংলা, বিশেষ সাপ্তাহিক। এখন প্রধান দু'খানি কাগজে সহযোগিতা না করে প্রতিযোগিতা করলে দেশের দুঃসময় জানবেন। সাহেবরা হাসবে, বলবে দেখো দুঃসময়েও এরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। আমি বলি কী অমৃতবাজার নিজ পথে চলুক, বেঙ্গলী নিজ পথে চলুক,

দুয়েরই উদ্দেশ্য দশের উন্নতি, তবে পথান্তর নিয়ে ঝগড়া কেন? ঠাকুর বলেছেন যত মত তত পথ।

সুরেনবাবু বললেন, মহারাজ, আপনার সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিলাম, মোতিবাবুকে আগুন ছড়ানো থেকে নিরস্ত করুন।

মোতিবাবু বললেন, আগুন ছড়াচ্ছে কে? গভর্মেন্টের মূঢ়তা দেশকে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাই না দেশময় গজিয়ে উঠেছে গুপ্ত সমিতি, হত্যা, রাজনৈতিক ডাকাতি।

মোতিবাবু, ও সবের কোন প্রয়োজন ছিল না, একটু ধৈর্য ধরলেই আইন সঙ্গত আন্দোলনের কি ফল—

কী ফল?

এই যে দেশের ধোপা নাপিত কামার কুমোর জোলা তাঁতি মায় গুরু পুরোহিত অবধি নিজেদের মধ্যে শপথ করেছে যার বাড়িতে এক টুকরো বিলিতি কাপড় এক ছটাক বিলিতি চিনি বা লবণ ব্যবহার হবে তাদের একঘরে করবে এটি স্বদেশী আন্দোলনের ফল নয়?

আন্দোলনের ফল কি মানিকতলার বোমার ফল কে বলতে পারে!

মোতিবাবু, কিছু মনে করবেন না, মানিকতলার বোমা দশ বছর পিছিয়ে দিল দেশের অগ্রগতি।

কী যে বলেন সুরেনবাবু, ঐ বোমায় আর বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তিতে দশ ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছে বাঙালীর বুকের ছাতি। ভেতো বাঙালী, কেরানীর জাত বাঙালী, অসামরিক জাত বাঙালী এই শুনে এসেছে সকলে চিরকাল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখতে পেলো তাদের এত সাহস, এত আত্মত্যাগ, এমন আত্মবিশ্বাস। এই তো জাতির মনুষ্যত্বের মূলধন।

মোতিবাবুর কথা এক দিক থেকে সত্য, তবে আমি ভাবছি কী—

ভাবনার সময় কি যায়নি মহারাজ?

না, না, আমি ভাবছি অরবিন্দবাবুকে বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ।

সন্দেহ করবেন না, অরবিন্দবাবু এবারে বেকসুর খালাস পাবেন, তবে গভর্মেন্ট সহজে ওঁকে ছাড়বে না।

ছাড়বে বিশ্বাস হয় না।

বিশ্বাস করুন। সেদিন নিবেদিতা এসেছিলেন, বললেন, অরবিন্দ খালাস হবে তবে সে যেন বেশিদিন কলকাতায় না থাকে, গোপনে ওকে চন্দননগরে পাঠিয়ে দেবেন। জিজ্ঞাসা করলেন সেখানে আপনাদের দলের লোক আছে তো। বললাম আছে বইকি। মোতিলাল রায় আছেন, চারু রায় আছেন। বললেন তবে তাদের লিখে দিন কোন ফরাসী জাহাজে তুলে দিয়ে পণ্ডিচেরীতে যেন পাঠিয়ে দেয়—কলকাতা অরবিন্দর পক্ষে নিরাপদ নয়।

মোতিবাবুর কথা শুনে মহারাজা বললেন, হ্যাঁ, অরবিন্দবাবুর মাথার দাম একটা গোটা এনসাইক্লোপিডিয়ার সমান।

মোতিবাবুর কথা যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে অত্যন্ত সুসংবাদ, তবে অনুরোধ

বিপিন পালকেও একটু ঠাণ্ডা রাখবেন। মহারাজ, মোতিবাবু আমাদের আন্দোলনকে নিরামিষ আন্দোলন বলে ঠাট্টা করবেন। আমার নিবেদন এই যে নিরামিষ আন্দোলনে ফল না হলে তখন না হয় ওঁরা আমিষের ব্যবস্থা করবেন, আপত্তি করবো না।

যখন তিন জনের মধ্যে বিতর্ক চলছিল, যজ্ঞেশবাবু তিন জনের চেহারা মনের মধ্যে এঁকে নিচ্ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল সুরেন বাঁড়ুজ্জে বিশাল শাল্মলী তরু, যেমন বলিষ্ঠ তেমনই উচ্চ তেমনই দিগন্তপ্রসারী শাখা-প্রশাখাবহুল, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝাকে যেন বাধা দিতে উদ্যত। মোতিলাল ঘোষ ক্ষুদ্র শীর্ণ খর্বকায় ব্যক্তি, দেহের অস্তিত্ব নামে মাত্র, কিন্তু কী চোখ, মুখমণ্ডলে কী বুদ্ধির ছটা, প্রতিভাশালী মানুষের মস্তিষ্ক যেন মনুষ্যরূপ ধারণ করে সম্মুখে উপস্থিত। আর মহারাজা যতীন্দ্রমোহনও বৃদ্ধ খর্বকায় কিন্তু দেহের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু চিরাগত আভিজাত্যের সুষমায় পরিপূর্ণ।

এমন সময় মহারাজার এক জন ভাগিনেয় এসে মাতুলের দিকে তাকালো, মহারাজা বললেন, বঙ্গজননী না হয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, চলুন ভিতরে যাওয়া যাক।

গাড়িতে তুলে দেওয়ার সময় যতীন্দ্রমোহন গাড়ি পর্যন্ত এলেন। সুরেনবাবু বললেন, মহারাজ, আমি আপনার মধ্যস্থতা মেনে নিলাম।

আমিও, বললেন মোতিবাবু।

তখন যজ্ঞেশবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, যজ্ঞেশবাবু, আমরা সহস্র রকমে সরকারী রজ্জুতে বদ্ধ, আপনি মুক্ত-পুরুষ, আপনি আমার নমস্য।

নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে যজ্ঞেশ রায় বললেন, ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তাতে ব্রাহ্মণ—এই বলে মহারাজার পদধূলি গ্রহণ করলেন।

মেসে ফিরে এসে যজ্ঞেশবাবু শচীনের চাকর ভূষণ দাশের মুখে শুনলেন সারাদিনের মধ্যে শচীন ফেরেনি, এমন প্রায়ই হয়।

রাতের আহারান্তে যখন তিনি শুয়েছেন শচীন এসে পৌঁছলো। বলল, ভূষণের কাছে শুনলাম রাতে খেয়েছেন কিন্তু দুপুরবেলা খেলেন কোথায়?

আরে বলো কেন, সুরেনবাবু নিয়ে গেলেন মহারাজার কাছে, সেখানে রাজভোগ হল।

হ্যাঁ ঐ লোকটির প্রতি সুরেনবাবুর বিশেষ ভক্তি, সকল দলেরই তিনি ভক্তির পাত্র।

তখন যজ্ঞেশবাবু সংক্ষেপে সেখানকার বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি খেলে কোথায়, সারাদিন করলে কী?

শচীন বলল, দুপুরে এক মেসে খেলাম, এমন প্রায়ই হয়। আজ এক মজার কাণ্ড হল বাবা।

কী রকম?

এক মেসে গিয়েছি ভলান্টিয়ার জোগাড় করতে, গিয়ে দেখি একটা ঘরের মধ্যে তুমুল কাণ্ড চলছে। প্রচণ্ড গোলমাল। ঢুকে দেখি দু'জন ছাত্র, মেসে সবাই কলেজের ছাত্র, সকলেই আমার পরিচিত, দুজনেরই হাতের আস্তিন গোটানো, একজনের দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে, আর একজনের গালে কালশিরে—

আমাকে দেখে তারা সভ্যভব্য হওয়ার চেষ্টা করলো। ঘরে দর্শকের অভাব নেই।

তারা থামালো না?

থামাবে কি, তারা এসেছে যাতে ব্যাপারটা অকালে থেমে না যায়।

কি হে, ব্যাপার কি?

যুযুধানদের একজনে বলল, দেখুন স্যার ও বলছে ডি.এল. রায়ের মেবার পতনের মতো নাটক নেই বাংলা ভাষায়--

তা তুমি কী বলো?

কেন রবি ঠাকুরের বিসর্জন।

আমি বললাম, তার জন্যে একজনের দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে, আর একজনের গালে কালশিরে—সাহিত্যবিচারের এমন রীতি তো জানা ছিল না। আমার কেমন সন্দেহ হল—আচ্ছা বলো তো মেবার পতনের নায়ক কে?

কেন রাজসিংহ।

আর বিসর্জনের?

অপর ছেলেটি বলল, কেন প্রতাপাদিত্য।

বললাম, বাপু হে, তোমরা তো কেউ বই দু'খানা পড়নি দেখতে পাচ্ছি।

তখন তারা ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্যে নাম লেখাতে এলো। বললাম, না, তোমাদের দিয়ে হবে না, তোমরা গিয়ে মারামারি শুরু করে দেবে। আমার কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

ব্যাপার শুনে যজ্ঞেশ রায় কিছুক্ষণ হাসলেন, পরে শুধালেন তা ভলান্টিয়ার জোগাড় হল?

হয়েছে দশ-পনেরোজন। নিন, অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ুন, আমি খেয়ে আসছি।

শেষ রাতে দরজায় ঘা পড়লো, শচীন দরজা খুলে দিয়ে দেখলো একজন পুলিশ ইনসপেকটার দণ্ডায়মান।

আপনার নাম শচীন রায়?

হ্যাঁ।

চলুন যেতে হবে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

যজ্ঞেশ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ধারা?

ও কথা আজ জিজ্ঞাসা করবেন না, কোন একটা ধারা নিশ্চয় আছে, এমন ধারা প্রায়ই হচ্ছে। আপনি দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে বাড়ি চলে যান, মাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলবেন। এখানকার বাসা ভূষণ দাশ সামলাবে।

গায়ে একটা জামা গলিয়ে দিয়ে শচীন প্রস্তুত হল।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, ভেবেছিলাম এ বারে গিয়ে বউমাকে নিয়ে আসবো—

ততক্ষণে ইনসপেকটারের সঙ্গে শচীন বাইরে চলে গিয়েছে। কথাটা তার কানে গিয়েছে কি না বুঝতে পারলেন না যজ্ঞেশবাবু।

একুশ

যজ্ঞেশবাবুর তেতলার ছাদের উপরে শীতের মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে চার জনে বড়ি দিচ্ছিলেন, নিস্তারিণীদেবী, বিন্দুবাসিনী দেবী, রুক্মিণী আর মলি। চার হাতের ক্ষিপ্র নিপুণতায় মুসুর ডালের ছোট ছোট লাল ফুলবড়িগুলি ফুল তুলে দিচ্ছে বিছানো কাপড়খানার উপরে। পিঠ রৌদ্র উপভোগ করছে, হাত কাজ করছে, মুখ কেন নীরব থাকে। মুখে গল্প চলছে।

মলি বলল, জানো মাঐমা, দাদা ফুলবড়ি খেতে ভালোবাসে—বলে এক ঝলক তাকালো রুক্মিণীর দিকে, রুক্মিণী অপাঙ্গে শাসন করলো তাকে, মুখে কিছু বলতে পারে না।

জানো বেয়ান, মলি ঠিক কথা বলেছে, ছেলের আমার ফুলবড়ি পেলে আর কথা নেই, কুরকুর করে দাঁতে ভেঙে খেতে থাকে।

মায়ের যেমন কথা, ফুলবড়ি দাঁতে ভেঙে ছাড়া কে আবার গিলে খায়।

তা বাছা তুমি রাগ কোরো না, ছেলের ভালো লাগাতেই মায়ের ভালো লাগে।

এবারে রুক্মিণী বলবার সুযোগ পেলো, বাবারও ভালো লাগে ফুলবড়ি।

আহা সেই জন্যেই যেন সাতসকালে উঠে বাড়িসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে টেনে এনেছ ছাদের উপরে।

কালকেই তো মা বলে দিয়েছিলেন, আজ বড়ি দিতে হবে।

বউদি থামলে কেন, বাকিটুকু বলো।

বাকি আর কি।

কিছুই জানো না যেন, মা বলেছিলেন কর্তা যখন গিয়েছেন শচীনকে না নিয়ে আসবেন না।

রুক্মিণীর কচিমুখ লাল হয়ে উঠল।

নিস্তারিণী বললেন, কেন বাছা বউমার পিছনে লাগছ।

শুধু এখন নয় মা, সমস্ত ক্ষণ লেগেই আছে।

আচ্ছা মাঐমা তুমিই বিচার করো নিজের বউদি থাকতে আর কোন্ বাড়ির বউয়ের পিছনে লাগতে যাব।

আর তুই বা রাগ করিস কেন রুক্মি, আমাদের ননদরা জ্বালাতন করে মেরেছে।

কেন রাগ করে বলতো, যাতে আমি আরও বেশি করে দাদার কথা বলি।

মা আমি চললাম—বলল রুক্মিণী।

যাবেই তো, দাদার চিঠিগুলো পড়বার একটা অছিলা পেলে।

তোমারও বাছা এমন দিন আসবে, আশীর্বাদ করি শীগ্‌গির আসুক।

তা হলে মাঐমা তোমার আশীর্বাদ মাঠে মারা গেল, বিয়ে আমি করছি নে।

বিয়ের আগে সব মেয়েই ঐ কথা বলে, রুক্মি কি কম বলেছে।

আঃ কি বকছ মা।

নিস্তারিণী বললেন, যাও তো বউমা ঘড়িটা দেখে এসো, গাড়ি আসবার সময় হল কি না।

বউদি ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিলে কিন্তু গাড়ির চাকা এগোয় না মনে রেখো।

মা, তুমি মলিকে পাঠাও ঘড়ি দেখতে।

আর তুমি ততক্ষণ হাত চালিয়ে আরও কতকগুলো বড়ি দিয়ে নাও। দাদার কি বড়ি ছাড়া আর কিছু জুটবে না! তার পরে ডালের বাটির কানায় হাতটা মুছে নিয়ে বলল, যাই ঘড়ি দেখে আসি। যাওয়ার আগে রুক্মিণীর দিকে অপাঙ্গে তাকাতে ভুল করলো না।

ওকী আবার ঘড়িটা নিয়ে এলে কেন?

পাছে বউদির বিশ্বাস না হয়, হয়তো ভাবতে পারে কাঁটা পিছিয়ে দিয়েছি। এই দেখো এখনও দুই ঘণ্টা দেরি। তার পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, দুই ঘণ্টা না দুই যুগ।

নিস্তারিণী দেখলেন মলিকে থামানো দরকার, শুধালেন, হাঁ রে, আজকাল সুশীল কলেজ থেকে ফিরতে রোজ দেরি করে কেন, সন্ধ্যা হয়ে যায়?

তা জানো না মা, ছোড়দাদা কলেজের পরে রোজ ডন কুস্তি করে, লাঠি খেলা শেখে।

এ শখ আবার কেন?

জানো না, ইংরেজ তাড়াবে।

যত সব পর্যন্ত বলে নিস্তারিণী থামলেন, বাকিটুকু মনে মনে. এক ছেলে কলকাতায় ইংরেজ তাড়াচ্ছেন, কবে বা জেলে যায়, স্বামী তো জেল খেটে এসেছেন, এখন ছোটটিকেও সেই রোগে ধরলো দেখছি, মা গো মা কী দিন কাল পড়েছে। তার পরে এক দুশ্চিন্তা দিয়ে অন্য দুশ্চিন্তা তাড়াবার আশায় জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ বেয়ান, অবিনাশবাবুর চিঠি পেলে?

ঐ চিঠি মাত্র।

কেন?

দুটি শব্দ মাত্র পড়তে পারা গেল, মশা আর কুইনিন, বাকি সমস্ত মোটা করে কালি দিয়ে লেপটানো। বুঝলাম যে মশা আছে, কাজেই ম্যালেরিয়া আছে, কাজেই কুইনিন খেতে হচ্ছে।

নিস্তারিণী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে একটি ছায়া পড়লো, পিছনে তাকিয়ে দেখে বললেন, এসো ধোপাবউ, কেমন আছ?

মা, তোমাদের শ্রীচরণের আশীর্বাদে ভালোই আছি।

ধোপাবউ বিনোদা, সর্বত্র তার অবাধ গতি। এক সময়ে সুন্দরী ছিল, তবে সেটা এখন "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে"র অন্তর্গত। বর্তমানে কালো ও কৃশ, কৃশতা কিছু বেশি।

বললে তো ভালো আছি তবে এমন রোগা দেখছি কেন?

কী বলবো মা, এ পর্যন্ত বলে সে নীরব হয়ে রইলো।

নিস্তারিণী বুঝলেন সে কিছু বলতে চায় তবে এত লোকের সামনে বলবে না। বললেন, তোমরা বাকিটুকু সেরে নাও, আমি আসছি, এসো ধোপাবউ—এই বলে তাকে ডেকে ভিতরের ঘরে গিয়ে বসে বললেন, বসো। কী হয়েছে সত্যি করে বল তো?

বিনোদা বসে পড়ে চোখে আঁচল দিয়ে জল মুছতে লাগলো।

কি হয়েছে মা? স্বামীতে মারধোর করেনি তো?

বিনোদা জিভ কেটে বলল, না মা, সে অভ্যাস এখন গিয়েছে।

তবে?

কী আর বলবো মা, আজ তিন দিন হাঁড়ি চড়েনি, তবু ভালো যে ঘরে ছেলেমেয়ে নেই।

নিস্তারিণী বিস্মিত হলেন, সবাই জানে খাওয়া পরার যথেষ্ট সঙ্গতি আছে ওদের। কেন এমন হল?

তুমি আর না জানো কী মা। ধোপা নাপিত কামার কুমোর সবাই মিলে ধর্মঘট করে শপথ করেছে যার বাড়িতে বিলিতি জিনিস তাদের কাজ করবে না। নাপিত কামার কুমোরদের শপথ পর্যন্ত, বিলিতির সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ কী। মরণ ধোপার। সকলেরই বিলিতি কাপড়। আর সোয়ামীও এমন কাঠ-গোঁয়ার ছোঁবে না সে কাপড়। আমি বলি তবে যে না খেয়ে মরতে হবে। বলে, তিন-চার দিন না খেলে মানুষ মরে না, অন্য কাজ দেখি। অন্য কাজ দেখবে কী, শরীর এমন কাহিল হয়ে পড়েছে যে উঠতে পারে না। কেবল বলে তামাক সাজ্। শেষে ঘরের তামাকটুকু পর্যন্ত ফুরিয়ে গেল। তখন রাগ। যা চেয়ে নিয়ে আয়।

আবার চোখ মোছে। চোখের জল অবাধ্য, এক ফোঁটা মুছলে দশ ফোঁটা দেখা দেয়।

ভাবলাম কারো কাছে তো কখনো হাত পাতিনি, তা চাইতেই যদি হয় তামাক চাইবো কেন, চাল ডাল নয় কেন? আমার জন্যে ভাবি না মা কিন্তু ঘরের লোকটা যে গেল। তার পরে একটু থেমে থেকে বলে বসলো, হাঁ মা, এই "স্বদেশীটা" কি?

নিস্তারিণী দুঃখের অভিজ্ঞতায় মোটামুটি একরকম বুঝেছিলেন তবে এটাও বুঝলেন এখন "স্বদেশী" বোঝাবার সময় নয়। ভিতরে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, এই নাও পাঁচটা টাকা, চাল ডাল কিনে নাও গে। বলে তার হাতখানা ধরে, টাকা গুঁজে দিলেন। টাকাগুলো ঝনঝন করে শানের উপরে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, মা, আমরা তো কারো কাছে কখনো ভিক্ষে নেইনি।

ভিক্ষে তোমাকে কে দিচ্ছে ধোপাবউ। আগাম দিলাম, কাপড় কেচে শোধ দিয়ো।

ভিক্ষের টাকা মজুরির টাকায় পরিণত হওয়ায় উঠে বসলো বিনোদা, বলল, তবে মা এই সঙ্গে এক বোঁচকা ময়লা কাপড় দাও, তোমাদের বাড়িতে বিলিতি নেই সবাই জানে।

তা দিচ্ছি। তবে জেনে রেখো ধোপাবউ স্বদেশীর জন্যে এর চেয়ে বেশি কষ্ট অনেকে পেয়েছে, আরও বেশি কষ্ট পেতে হবে।

ধোপাবউ ময়লা কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগলো খিদের চেয়ে আরো বেশি কষ্ট কী থাকতে পারে।

ধোপা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সদর দরজায় গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। সকলে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল। বউদিকে একান্তে টেনে নিয়ে মলি বলল, রুক্মিণী ঠাকরুন, ঐ যে কৃষ্ণ ঠাকুর এলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু গাড়ি থেকে একাকী নামলেন।

তিনি ঘরে ঢুকতে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, শচীন এলো না?

পারলে আসতো।

তার মানে?

মানে সহজ, আজ ভোর রাতে গ্রেপ্তার হয়েছে।

কেন?

কেন কি! গ্রেপ্তার হওয়ার সাধনাই তো করছিল। যাক্, আমার স্নানের গরম জল দাও গে।

নিস্তারিণীদেবী চোখে আঁচল দিয়ে প্রস্থান করলেন। দরজার আড়াল থেকে সকলেই কথাটা শুনলো। মলি দাদার যত-সব কাণ্ড বলে অপ্রসন্ন মুখে চলে গেল, মনে হল গ্রেপ্তার হওয়ার অপরাধটা তার দাদার। বিন্দুবাসিনী চোখের জল চাপতে চাপতে নিজের ঘরে গেলেন। তাঁর স্বামী, জামাই দুজনে বন্দী। আর রুক্মিণী এক ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বালিশ চোখের জলে ভিজিয়ে দিল। অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলবার পরে চিন্তার অবকাশ পেলো। চোখের জলের যেখানে অবসান চিন্তার সূত্রপাত সেখানে।

তার মনে পড়লো বিয়ের পরে কবারই বা দেখা হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে, সবসুদ্ধ জড়ালে ত্রিশটা দিনও হবে কি না সন্দেহ। বারে বারে বলেছে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। প্রত্যেকবার ভিন্ন রকম উত্তর পেয়েছে। বাসাটা ভালো নয়—ভালো একটা বাসা খুঁজে বার করি। কোনওবার শুনেছে আমি তো কলেজে থাকবো নয় দোকানে দোকানে পিকেটিঙে, সারাদিন তুমি থাকবে কাকে নিয়ে।

কেন, মলি আমার সঙ্গে যাবে।

বেশ কথা, তুমিও যাবে, মলিও যাবে, এখানে বাবা-মার কাছে থাকবে কে?

কেন সুশীল আছে।

না থাকবার মতোই, হয় কলেজে নয় পিকেটিঙে।

বেশ আমাকে নিয়ে চলো, আমিও তোমার সঙ্গে পিকেটিঙ করব।

এবারে উত্তরে শুধু হাসি।

আর একবার শুনলো, তুমি এ অবস্থায় তোমার মাকে একলা ফেলে যাবে কী করে?

বাবা উপস্থিত থাকলে তিনিই বলতেন যাও না, কলকাতায় গিয়ে পিকেটিঙ করো গিয়ে, ক্ষতি কি।

আচ্ছা বেশ, তিনি ফিরে আসুন তখন দেখা যাবে।

শুয়ে শুয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তরের মালা বদল করতে থাকে। কিন্তু মিলনের সুখ কি মালা বদলে আছে!

তারপরে সে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে স্বামীর লেখা চিঠিগুলো বার করলো। গুনে দেখলো অনেকগুলো, ত্রিশখানার মতো হবে, প্রত্যেকখানা এতবার পড়েছে, কোন্‌খানায় কী আছে মুখস্থ। সে ভেবে পেলো না কোন্‌খানা দিয়ে আরম্ভ করবে। প্রত্যেক খামের উপরে প্রাপ্তিতারিখ লিখে রেখেছিল। পাতে অনেক সুখাদ্য দেখলে লোভী ছেলে যেমন ভেবে পায় না কোন্‌টা দিয়ে শুরু করবে, তার ভাব অনেকটা তেমনি। তখন সে তারিখওয়ারি চিঠিগুলো পরপর সাজালো, কিন্তু সবগুলোই যে সমান আকর্ষণ করে। অগত্যা সবগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে তাস ভাঁজবার মতো করে ভাঁজলো এবং তার মধ্যে টেনে বের করে নিল একখানা। জানে এখানার ভিতরের কথা, তবু পড়লো—রুকমি দিয়ে শুরু। রুক্মিণী কদাচিৎ লিখতো। রুকমি, রুকি, রুকু, ওগো রুকমি, রুকমি আমার। একখানা চিঠি দেখে হেসে ফেলল; পান খাওয়ার সময়ে চিঠিখানা আসে, রাঙা ঠোঁটের দাগটা এখনও মুছে যায়নি। প্রত্যেকখানাতেই থাকতো—যদি সেগুলো আসতো পান খাওয়ার সময়ে। ভাবলো আচ্ছা তিনি কি এমন যত্নে আমার চিঠিগুলো গুছিয়ে রেখেছেন। হা রে মানুষটা যে

অগোছালো। হঠাৎ ভয় লজ্জা একসঙ্গে পেয়ে বসলো, যে-লোক সর্বদা জেলখানায় যাওয়ার মুখে তার পক্ষে কী উচিত স্ত্রীর চিঠি [illegible] রাখা। পুলিশে নিয়ে যাবে, পড়বে হাসবে। আচ্ছা কেন হাসবে, পুলিশের বউরা চিঠি লেখার বদলে রিপোর্ট লেখে নাকি। কথাটা মনে হতেই হেসে উঠল, হাসির দমকে চোখে জল এলো, চোখের জল যে কোথায় লুকিয়ে থাকে। মনে পড়ে গেল একটা ছড়া. চোখের জল আর হাসি/দু'জন প্রতিবাসী/একজনাতে ডাকটি দিলেই/অন্যে বলে আসি। তাই বুঝি মানুষ হাসতে হাসতে কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতে হাসে, দুয়েরই বাসা চোখে। চোখের জল দুর্বার হয়ে উঠতেই সমস্ত চিঠিগুলো বুকে চেপে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

বৈষ্ণব সাহিত্যে সব চেয়ে যে দুঃখিনী সেই বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা সব চেয়ে কম, আদৌ আছে কি না, বোধ হয় বৈষ্ণব কবিদের প্রতি অবিচার করলাম। রাধার দুঃখের অশ্রুধারায় বিষ্ণুপ্রিয়ার অশ্রুধারা মিলিয়ে দিয়ে তাঁরা বিরহের যুক্তবেণী রচনা করেছেন।

কতক্ষণ সে কেঁদেছে জানে না, মাঝখানে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিল কিনা তাও সম্বিৎ নেই, হঠাৎ একটা হল্লায় সচকিত হয়ে উঠল, বুঝলো পথে একটা শোভাযাত্রা চলেছে, এমন আজকাল প্রায়ই হয় কি না, বিশেষ শহরে কেউ গ্রেপ্তার হলে। কিন্তু না, এ যে উল্লাসধ্বনি। কান পেতে শুনলো যেন নবীন মহাজন জয়! বন্দেমাতরম্ জয়ধ্বনি। দোতালার জানলা থেকে তাকিয়ে দেখল স্বদেশী স্কুল কলেজের ছেলেরা বন্দেমাতরম্ পতাকা উড়িয়ে কাতারে কাতারে চলেছে, কিন্তু ও কী, মাঝখানে চেয়ারের দুদিকে বাঁশ বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে চলেছে, মাঝখানে উপবিষ্ট নবীন মহাজন, নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাব।

রুক্মিণী ভাবলো তবে কি নবীন মহাজন গ্রেপ্তার হল না কি! তার মহাজনী কারবার চলবে কী করে! ছেলেমেয়ে তো কেউ নেই। কিন্তু সন্দেহ ঘুচতে দেরি হল না। এক জন ছোকরা চোঙা মুখে দিয়ে হেঁকে ঘোষণা করলো, স্বদেশবান্ধব শ্রীনবীন মহাশয় আজ তাঁর যাবতীয় মহাজনী কারবার ও আড়ৎ নবীন স্বদেশী বিদ্যালয় ও আশুতোষ স্বদেশী কলেজের জন্য রেজিস্ট্রি করে উৎসর্গ করে দিয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বলো ভাই সব বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম্। ভাষাটা কিঞ্চিৎ কেতাবী হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। সমস্ত শোভাযাত্রা হাসির তরঙ্গে উন্মুখর।

রুক্মিণীর মনে হল তাঁকে নিয়েও কলকাতায় নিশ্চয় এমনি শোভাযাত্রা আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। আহা সে দেখতে পেলো না, তারই যে দেখবার অধিকার সব চেয়ে বেশি। এই কথা মনে হতেই আবার নামলো চোখের জল। সেই ধোপাবউয়ের প্রশ্ন তার মনেও জাগলো, মা এই "স্বদেশী" জিনিসটা কী ? যার মধ্যে এত হাসি এত অশ্রু, এত দুঃখ এত আনন্দ! কী সেই "স্বদেশী"!

বাইশ

ম্যাজিস্ট্রেট ক্রোজেট সাহেবের এজলাসে আজ বড় ভিড়। উপর থেকে ইঙ্গিত পেয়ে লোকটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, পারলে হাতে মাথা কাটে এমন ভাব, আইনকানুন আবার কী। নবীন মহাজনকে ফতোয়া দিয়ে এজলাজে হাজির করেছে। উকীলরা বলেছিল নবীন যেয়ো না, কোন্ আইন অনুযায়ী ডেকে পাঠিয়েছে জিজ্ঞাসা করে পাঠাও।

নবীন বলল, দাদাবাবুরা, যাই না একবার দেখে আসি সাহেবের কাণ্ড-কারখানা।

নবীন এসে হাজির হতেই ক্রোজেট অধিকতর গরম হয়ে, গরম আগেই হয়েছিল, বলল, টোমার নাম কী আছে?

নবীন বলল, হুজুর, নাম না জেনেই কি ডেকে পাঠিয়েছেন?

হামি জানি টোমার নাম নবীন মুডি।

আজ্ঞে কেউ মুদি বলে, কেউ মহাজন বলে।

টাহা হইটে পারিবে না, মহাজন অর্থ গ্রেটম্যান, টুমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি।

হুজুর তো সবই জানেন।

হাঁ, আমি টোমার মাটৃভাষা উট্টমরূপে শিক্ষা করিয়াছে।

উপস্থিতদের মধ্যে যারা রহস্য জানতো মনে মনে বলল শিক্ষা বিভাগ পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিল তোমার হেড কেরানীকে—"টাই উট্টম রূপে শিক্ষা করিয়াছে।"

টুমি টোমার সমস্ট সম্পট্টি স্বডেশী স্কুল কলেজকে ডান করিয়াছে ইহা কি সট্য?

সাহেবের উচ্চ শিক্ষালব্ধ বাংলা ভাষা নবীনের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল, সে বলল, হুজুর বুঝতে পারলাম না।

সাহেবেরও অসুবিধা নবীনের অশিক্ষালব্ধ বাংলা বুঝতে, তখন একজন উকীল ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিল।

সাহেব পাইপ কামড়াতে কামড়াতে বলল, মাটৃভাষা না জানা অট্যন্ট লজ্জার কটা।

একজন উকীল নবীনের সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল, তুমিও সাহেবের মতো বাঁকা বাঁকা বাংলা বলো, ব্যাটা বুঝতে পারবে।

নবীন সেই পন্থা গ্রহণ করলো।

কেন টোমার সম্পট্টি সরকারী স্কুলে ডান না করিলে?

হুজুর সরকারী স্কুলের পশ্চাট সরকার রহিয়াছে, আমার ডানের ডরকার কি?

এবারে সাহেব বুঝতে সক্ষম হচ্ছে, বলল, এটক্ষণে গুড ভাষা বলিটেছে। তুমি কি স্বডেশী আছে?

স্বডেশে যখন থাকে টখন স্বডেশী বই কি।

সাহেব কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারলো না, তবে সেটা স্বীকার করা চলে না, ইংরেজ ভাঙে তবু মচকায় না।

স্বডেশী স্কুলে কি তোমার সম্বণ্ডী আছে?

সম্বণ্ডী না টাক সম্বণ্ড আছে।

সমস্ট সম্পট্টি ডান করিলে এখন টোমাকে 'ভক্ষণ' করিবে কে? (ভোজন করাইবে কে?)

হুজুর ইচ্ছা করলে ভক্ষণ করিটে পারে।

হাঃ হাঃ, তুমি করিবে ডান আর আমি টোমাকে ভকষণ্ করিব।

আমাকে নয় আমার মস্টকটা ভক্ষণ করিতে পারে।

মানুষের মস্টক খাইটে স্বাডু না আছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, খেয়েছো তাহলে।

আর টাহা ছাড়া বাইবেলে নিষেঢ আছে।

আবার ভিড়ের মধ্যে থেকে—পড়েছ নাকি!

জান আমি টোমাকে বেট্রাগাট করিটে পারে।

হুজুর মা বাপ।

হাঃ, হাঃ, একসঙ্গে একজন মা ও বাপ হইটে পারি না।

আবার ভিড়ের মধ্য থেকে—তোমার আর হয়ে কাজ নাই।

আজ টোমাকে পরিট্যাগ করিল, ভবিষ্যটে ডান কারিলে কয়েড ও বেট্রাগাট লাভ করিব। এখন গমন করো।

নবীন সেলাম করে বাইরে এলো। ব্যাপারটা আর কিছুই নয় নবীনকে উপলক্ষ করে স্বদেশীওয়ালাদের ভীতিপ্রদর্শন মাত্র।

যতক্ষণ নবীনের বিচার চলছিল আদালতের হাতার মধ্যে ছাত্রদের হাজার কণ্ঠে ক্ষণে ক্ষণে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠছিল।

সাহেব পুলিশকে হুকুম দিল বডমাইশডের তাড়িয়ে দিতে। পুলিশ আসতেই 'বন্দেমাতরম্ পুলিশের মাথা গরম' রব করতে করতে ছেলেরা পালিয়ে গেল। তখন এজলাসে বসেই সাহেব আর এক ফতোয়া জারি করলো আদালতের হাতার মধ্যে বন্ডমাটরম ডনি করা চলবে না। তার ফল বড় ভীষণ হল। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর কাছে খানিকটা পতিত জমি ছিল, হাজারখানেক ছেলে জড়ো হয়ে সারা রাত ধরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করলো, ফলে মেমসাহেবের মাথা ধরে গেল, সাহেবের ঘুম হল না।

মেমসাহেবের মাথা ধরা মানে প্রায় ভারত সরকারের মাথা ধরা, তার পরে ভোরে উঠেই যখন মিসেস ক্রোজেট স্বামীকে বলল, Henry, you are a blinking idiot, shoot a few of them, তখন আর সাহেবের সন্দেহ রইলো না। এমন সময় ছোট হাজরি উপস্থিত হতেই সাহেব গর্জন করে উঠল, আণ্ডা কোথায়?

ভীত খানসামা বলল, হুজুর বাংলোর পাশে সারা রাত হল্লা-গুল্লা হওয়ায় মুরগি ভড়কে গিয়ে ডিম দিতে ভুলে গিয়েছে।

মেমসাহেব খরচ কমাবার উদ্দেশ্যে নিজেই মুরগি পোষে।

তখন সাহেব আর একটা ফতোয়া জারি করলো পতিত জমিতে বন্ডমাটরম্ ডনি করা চলবে না। তার ফলও খুব শুভ হল না। ছেলেরা শহরের পথে পথে বন্দেমাতরম্ হেঁকে বেড়াতে লাগলো। সেটাও নিষিদ্ধ হল। তখন ছেলেরা যার যার বাড়ির ছাদে উঠে বন্দেমাতরম্ হাঁকতে লাগলো। অতঃপর কোন্ ফতোয়া জারি করা যায় সাহেব চিন্তা করতে লাগলো, শহরসুদ্ধ লোকে বুঝলো এবারে সরকারে ও সাধারণে অদ্যযুদ্ধ ত্বয়াময়া আসন্ন।

কিন্তু সাহেব যখন নূতন ফতোয়া চিন্তা করছিল আর একটা চিন্তা সকলের মনে তরঙ্গিত হচ্ছিল।

নবীনের বিচারের সময়ে উকীল মোক্তারেরা চিন্তা করছিল এই অর্ধশিক্ষিত মহাজন যে-স্বদেশীর জন্যে সমস্ত দান করে দিয়ে নিঃস্ব হল সেই স্বদেশী ব্যাপারটা কি।

কপালে অডিকোলোন ভেজানো রুমাল ঘষতে ঘষতে মেমসাহেব চিন্তা করছিল স্বদেশী

ব্যাপারটা কি। এমন কি ক্ষুদে কার্জন ক্লোজেটের মনেও এক-একবার চিন্তার ক্ষুদ্র ঊর্মি উঠছিল স্বডেশীটা কি বস্টু। এমন কি সাহেবের খানসামা খানা পাকাতে পাকাতে চিন্তা করছিল স্বদেশীর যে-হল্লায় ধবাদ্দ মাফিক ডিম পাড়তে মুরগিতে ভুলে যায় কি সেই চিজ স্বদেশী।

এ সমস্তই সেই নিরক্ষর ধোপাবউয়ের প্রশ্নের রূপান্তর, মা ঠাকুরুন, কি সেই স্বদেশী যার জন্যে এত দুঃখকষ্ট, এত সুখ আনন্দভোগ।

তেইশ

সুরেন বাঁড়ুজ্জে ও মোতিলাল ঘোষ দুজনের কথাই সত্য হতে চলল, অবশ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারূপে। একজনের নিরুপদ্রব বয়কটের ফলে ভারতে বিলিতি মালের চাহিদা গুরুতর হ্রাস পেলো তখন ইংরাজ ব্যবসায়ীরা রুখে উঠে বলল, ভারতে এ কী হচ্ছে, হয় শাসন করো নয় গদি ছাড়ো। ব্রিটিশ সরকারের ঘুম চিরকাল শেষ মুহূর্তে ভাঙে, তারা এবারে বুঝলো সত্যই কিছু করা আবশ্যক, স্থির করলো তবে শাসন করাই যাক। ভারত সরকারের প্রতি সেই ইঙ্গিত হল। বৃটিশের মতো আপোষী জাত ইতিহাসে বিরল, ওরা এক হাত দেয় গলায়, এক হাত পায়ে, গলার হাত ব্যর্থ হলে পায়ের হাত তো রইলোই। বাংলা দেশে বিলিতি মাল গেলাবার জন্যে শাসনকার্য আরম্ভ হল। শাসন যতই উৎকট থেকে উৎকটতর হতে লাগলো তার প্রতিক্রিয়ায় দেশের নানা স্থানে ছোট বড় গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হতে লাগলো যার উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে লাগলো বোমার খোল ও পিস্তলের নল। গলার হাত ব্যর্থ হতে চলল দেখে মনে পড়লো পায়ের হাতটার কথা। এসব কথা পরে আসছে। কিন্তু তখন অবস্থা চিকিৎসার অতীত হয়ে গিয়েছে। যার সূত্রপাত ভাঙা বাংলা জোড়া দেবার আন্দোলনে, তার উপায় রূপে দেখা দিল বিলিতি মাল বয়কট, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দুইকে অতিক্রম করে দেখা দিল যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত দ্রৌপদীর মতো স্বদেশী। সেই নিরক্ষর ধোপাবউ থেকে আরম্ভ করে বিলাতের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চিন্তা করতে লাগলো এই 'স্বডেশীটা' কি। এ দেশের গুণীজ্ঞানীরাও বুঝলো না, বুঝলো দু-দশজনে মাত্র, বুঝলো আশার অতীত ফল, প্রার্থনাতীত দাম জুটে গিয়েছে, একটা স্থানীয় সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সর্বস্থানিক একটা সিদ্ধান্ত জুটে গিয়েছে হতভাগ্যের কপাল জোরে। স্বদেশী আর কিছুই নয় স্বদেশ আত্মার মূর্তি সন্দর্শন। স্বদেশ আত্মার বাণী শুনলো দু-দশজন মাত্র ধ্যানীর শ্রবণ। এ হেন গূঢ় রহস্য যে অধিকাংশ লোকে বুঝবে না তা আর বিচিত্র কি। আর এ হেন গূঢ় রহস্যের কাছে নিরক্ষর ধোপাবউ ও বিলাতের মহাপ্রাজ্ঞ প্রধানমন্ত্রীর সমান মূঢ়াবস্থা।

বাংলাদেশে শাসন আরম্ভ হল, অর্থাৎ বাংলাদেশ জোড়া একখানা পাকা বাঁশের লাঠি নির্বিচারে সকলের মাথার উপরে পড়লো। ইংরাজের ধারণা হিন্দুরা এ নাটের গুরু, যেমন সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাদের ধারণা সে নাটের গুরু মুসলমান, তখন যেমন মুসলমানকে কোল থেকে নামিয়ে হিন্দুকে কোলে তুলে নিয়েছিল, এ বারে তার পালা বদল হল মুসলমানকে কোলে তুলে নিল হিন্দুকে নামিয়ে।

পূর্ব বাংলা তো মুসলমানের রাজত্ব। এতদিনে আবার বাদশার রাজগি ফিরে আসছে,

চাকরিবাকরি ব্যবসা-বাণিজ্য সব মুসলমানের হাতে, বোঝানো হল ক্রমে সরাশরিয়ৎ অনুসারে শাসনকার্য আরম্ভ হবে। বোঝানো হল হাঁ, কিছু কিছু হিন্দু থাকবে, তেমন তো বাদশার রাজত্বেও ছিল, অনেকে ভাবলো ওদের উপরে আবার জিজ্জিয়া কর বসবে। এসব রাজনৈতিক তত্ত্ব মূর্খকে বোঝানো সহজ, গুণ্ডা শ্রেণীকে বোঝানো আরো সহজ। মুসলমান টোপ .গিলল। তবে তাদের মধ্যে যারা বোদ্ধা, ফাঁকিতে ত'রা ভুলল না, রয়ে গেল 'স্বদেশীর' পক্ষে।

গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলমানকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে হিন্দু গ্রামসকল লুণ্ঠিত হতে লাগলো, গৃহ ভস্মীভূত হতে লাগলো, আর সেই আগুনের আলোয় শাসক সাহেব ও ব্যবসায়ী সাহেব বাংলার বারান্দায় একসঙ্গে বসে পেগ টানতে টানতে বলতে লাগলো Rascals are being taught a lesson, বদমাইশরা শিক্ষা পাচ্ছে।

মুকুন্দরাম গান লিখেছিল, "ছিল ধান গোলাভরা, খেত ইন্দুরে করলো সারা।" তার জেল হল। পরদিন ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে বলল, "কি মুকুণ্ড, সেট ইণ্ডুরে আর ডান কায়?"

এক গ্রামে যাত্রার পালা হচ্ছিল, একটা গানে ছিল "সোনার দ্যাশে শয়তান আইয়া আগুন জ্বালাইল"—সে রাত্রি শেষ হওয়ার আগেই আলঙ্কারিক সত্য আক্ষরিক সত্যে পরিণত হল।

নিরীহ পথিক আপন মনে গান করতে করতে যাচ্ছিল—"বেত মেরে কি মা ভোলাবি আমি কি মার সেই ছেলে।" তাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে বেত মেরে দারোগা জিজ্ঞাসা করলো, কি আর মাকে মনে পড়ে?

শাসনের এই রকম নমুনা সমস্ত জেলায়, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, রংপুর, পাবনা, দিনাজশাহী, পূর্ববঙ্গেই কিছু বেশি, অবশ্য কলকাতা সবার উপরে।

কিন্তু আগুন তো নেভে না। তখন সাহেবদের সম্মিলিত মস্তিষ্ক আবিষ্কার করলো, এর মূলে স্কুল ও কলেজগুলো, বিশেষ করে স্কুলগুলো। তখন জেলায় জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবরা নজর দিল স্কুলগুলোর উপরে। এটা করবে না, ওটা করবে না বলে ফতোয়ার পরে ফতোয়া জারি হতে লাগলো; হেডমাস্টারদের উপরে গোয়েন্দাগিরি ও দারোগাগিরির দায়িত্ব দেওয়া হল, সরকারী চাকুরেদের ছেলেরা যাতে কেবল সরকারী শাসনাধীন স্কুলে পড়ে তেমন আদেশ প্রচারিত হল। আর আম হুকুম জারি হল মেমসাহেবদের শিরঃপীড়াকারী, সাহেবদের কর্ণশূল, আর ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের পিত্তশূল (অন্য কারণও আছে) স্বরূপ ঐ বন্ড্মাটরম্ গানটা সর্বত্র নিষিদ্ধ।

এই আদেশ শুনবামাত্র বরিশালের একটা স্কুলের ছাত্ররা ছুটির পরে গান গাইতে গাইতে চলল, "যায় যেন জীবন চলে, জগৎমাঝে মায়ের কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।" কোথায় ছিল পুলিশ সাহেব, পুলিশ ও দারোগা। তাদের আগেই চোখ ছিল ঐ স্কুলটার উপরে, তাড়া করলো। কাছেই ছিল একটা দীঘি, ছেলেরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আরো জোরে গাইতে লাগলো, গানটা, তাদের স্নান বোধ হয় আগে থেকেই স্থির ছিল। ছেলেরা সকলেই সাঁতার জানে, পুলিশের লোকেরা জানলেও ভারী জুতো জামাজোড়া নিয়ে তাদের পক্ষে জলে নামা সম্ভব নয়। পুলিশ সাহেব আদেশ করলো শালালোগোকোঁ গালি দো, নবাগত সাহেবের দেশী গালির

পুঁজি যথেষ্ট নয়। পুলিশ আদেশাধীন, কাজেই তারা পারে দাঁড়িয়ে ছাপরাই ও পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় ভাণ্ডার উজাড় করে, সম্ভব অসম্ভব সব রকম গালি নিক্ষেপ করতে লাগলো। ছেলেরা হাসতে হাসতে অন্য পারে উঠে পালিয়ে গেল। পাকড়ো পাকড়ো হাঁকতে লাগলো সাহেব। আর পাকড়ো ততক্ষণে যে যার ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। এ প্রহসন এখানে সমাপ্ত হলে যথোচিত হত ' সাহেব হেডমাস্টারকে লিখে পাঠালো প্রত্যেক ছেলেকে যেন পাঁচ ঘা বেত মারা হয়। হেডমাস্টার লিখে পাঠালো আমি জল্লাদ নই। সাহেবের বুদ্ধি কিছু মোটা, স্বাক্ষরিত মন্তব্য পাঠালো "টুমি বজ্জাট আছ।" হেডমাস্টার নালিশ করলো, প্রমাণ অকাট্য, আদালত পুলিশ সাহেবকে শাসিয়ে ছেড়ে দিল। আদালতের শাসন মানে সাহেবের মাথা কাটা যাওয়া। সাহেব উপরে তদ্বির করে আসামের চা বাগান অঞ্চলের এক জেলায় বদলি হয়ে গেল। সাহেব স্টিমারে চাপলে নদীর ঘাটে গিয়ে ছেলেরা গান ধরলো "ফুলাব যাবে চুলার দোরে কুলার বাতাস খেয়ে, ও ভাই সারেঙ আপাতত এইটারে যাও নিয়ে।"....

পুলিশসাহেব ডেস্কের উপরে দাঁড়িয়ে ভাবছিল There must be something wrong in British constitution, বৃটিশ সংবিধানে কোথাও নিশ্চয় গলদ আছে।

স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নবগঠিত পূর্ববঙ্গের দুর্দান্ত ছোটলাট।

এ দিকে ঢাকা থেকে, ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী, চীফ সেক্রেটারির এক অতিশয় গোপনীয় চিঠি এলো মিঃ ক্রোজেটের কাছে—তোমার জেলায় বিলিতি মালের চাহিদায় গুরুতর ঘাটতি হয়েছে, হোম গভর্মেন্ট অসন্তুষ্ট, অতএব একটু চাপ দিয়ো। চিঠি পড়ে ক্রোজেট নেচে খাড়া হল—এই রকম ঢালাও হুকুমের প্রত্যাশায় ছিল সে। সকাল বেলাতেই ডেকে পাঠালো উকীল হরিপদ রায়কে। হরিপদ এখন সাহেবের প্রধান মুরুব্বি। চিঠির কথা গোপন রেখে সাহেব বলল, ওয়েল হরিপদ, শহর শান্ত হচ্ছে না কেন? আমার বিশ্বাস এর মূলে স্বদেশী স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা।

হরিপদ বলল, হুজুর ছাত্ররা সরল, তাদের সাধ্য কি এসব কুটিল বুদ্ধি বের করে।

তবে নিশ্চয় শিক্ষকরা।

হুজুর, ওদের যদি এত বুদ্ধি হবে তবে ওরা শিক্ষক হতে যাবে কেন?

তবে তুমি কি মনে করো?

এখন, হরিপদর জাতক্রোধ হয়ে ছিল অল বেঙ্গল লোন অফিসের আড্ডাধারীদের উপরে। তারা ওকে একঘরে করেছিল, শুধু তাই নয়, তাদের চেষ্টায় শহরেও সে প্রায় একঘরে। ভাবল এই মওকায় হারামজাদাদের জব্দ করবো। যথাসম্ভব বিনীতভাবে সে নিবেদন করল, কি বলব হুজুর, এর মূলে আছে উকীলরা।

সাহেব আনন্দে টেবিলে ঘুষি মেরে বলল, রাইট-ও।

সাহেবের আনন্দের কারণ আছে বটে। উকীলদের ওপর তার বড় ভয় তাই বড় ক্রোধ। জেলান্তরের এক মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে উকীলের হাতে নাজেহাল হয়েছিল। উকীল জেরার ঘায়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল সাহেব ইংরাজী জানে না আর জানে না তার ছোট ছেলেটির বয়স কত।

ক্রোজেট রাগে গরগর করে কাঠগড়া থেকে নেমে যাচ্ছিল, উকীল জজের দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুর আরও জেরা আছে।

জজ বলল, ওয়েল মিস্টার ক্রোজেট।

উকীল জেরা করল, আপনার বড় ছেলের রং এত ফরসা, ছোটটির রঙ কালো কেন?

সাহেব মুখ লাল করে বলল, সে ইন্ডিয়া বরন (India Born) বলে, ইন্ডিয়া কালা আদমির দেশ।

উকীল জজের দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুর, এ কি জাতিবিদ্বেষ প্রচার নয়?

ক্রোজেটের দিকে তাকিয়ে বলল, ওয়েল মিস্টার ক্রোজেট।

আর কোন জেরা আছে?

না হুজুর।

আবার নিজের এজলাসেও কতবার চিহ্নিত আসামীকে জেরার ঘায়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে উকীলে। সেই থেকে উকীল সমাজের প্রতি যেমন রাগ তেমনি ভয়। রাগ ও ভয় পিঠোপিঠি ভাই।

তোমার বিশ্লেষণ সত্য। এই দেখো না কেন তোমার স্বডেশীর—

হরিপদ বাধা দিয়ে বলল, স্বদেশীর মধ্যে আমি নই।

আমি জানি তুমি Noble exception, মহৎ ব্যটিক্রম। এই স্বডেশীর সমস্ত নেতা উকীলবাবুরা। আচ্ছা হরিপদ এই স্বডেশী ব্যাপারটা কি বলতে পারো?

খুব পারি হুজুর, স্বদেশের নাম করে নিজের কোলে ঝোল টানা, to pull gravy to oneself.

সাহেব এই অপূর্ব ইংরাজির অর্থ বুঝলো কি না জানি না তবে ভাবটা বুঝতে বাধলো না। আচ্ছা এক কাজ করো, বদমাইশ উকীলদের এক তালিকা পাঠিয়ে দিয়ো।

এখনই দিচ্ছি হুজুর। এই বলে অল্ বেঙ্গল লোন অফিসের প্রধান আড্ডাধারী তারাচরণ গোঁসাই, বীরেন চৌধুরী, খুদু মৈত্র ও অক্ষয় ফৌজদারের নাম লিখে সাহেবের হাতে দিয়ে জানালো প্রথম তিনজন উকীল ভয়ানক স্বদেশী আর শেষের জন উকীল না হলেও Father of Pleaders, উকীলের বাবা।

এই ইডিয়মটা সাহেব বুঝতে পারলো না কিন্তু বাংলা ভাষা যে "উত্তম রুপে শিক্ষা করিয়াছে" তার সে কথা স্বীকার করা চলে না।

আর হুজুর লোকটা as dangerous as Timurlane, তৈমুরলঙের মতো ভয়ানক।

কেন, কেন?

ওর একটা পা খোঁড়া।

তা হোক, ওর দ্বিতীয় পা-টাও খোঁড়া করে দোব। আশা করি সে চতুষ্পদ নয়—এই বলে নিজের রসিকতায় হেসে উঠল।

সেই হাসির ছটায় ক্রোজেটের অন্তরের স্বরূপ প্রকাশ পেলো, ভয় পেয়ে গেল হরিপদ। হাসিতে যাকে ভীতিকর মনে হয় তার থেকে শত হস্ত দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ম্যাজিস্ট্রেট তখনই পুলিশসাহেবকে আদেশ দিয়ে পাঠালো লোক চারটাকে স্পেশাল কনস্টেবল সাজিয়ে পথের মোড়ে মোড়ে অবিলম্বে দাঁড় করিয়ে দিতে।

তাদের চারজনকে বাংলোয় ডাকিয়ে এনে পুলিশসাহেব অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলো।

বীরেন চৌধুরীর দেহ মেদে মাংসে এমন একটা বিপর্যয় কাণ্ড যে পুলিশের কোনো পোশাক দেহের সিকি অংশও আবৃত করতে পারলো না, মাঝ থেকে বেশি আঁটাআঁটি করতে গেলে কোমরবন্ধটা সশব্দে ছিঁড়ে গিয়ে চাপরাশটা ছুটে এসে সাহেবের গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করলো। অপ্রস্তুত সাহেব রেগে উঠে গর্জন করলো, ভাগো উল্লু।

বীরেন চৌধুরী বলল, উল্লু নেহি হুজুর rather ভল্লু হো সকেগা।

Go away, you fool.

Am I not fuller.

লাফিয়ে উঠে সাহেব শুধালো, what do you mean ?

I mean, sir, am I not fuller than I ought to be.

সাহেব বুঝলো এখানে Fuller মানে মহামান্য ছোটলাট নয়, Fuller হচ্ছে Full শব্দের কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি।

আভি ভাগো।

বীরেন চৌধুরীর ইচ্ছা অপর তিন জনের কী অবস্থা হয় দেখে। তাই সে সবিনয়ে অবগত করালো, যে স্পেশাল কনস্টেবল সাজবার বহু দিনের সাধ তার ব্যর্থ হয়ে গেল তাই অপরকে সাজতে দেখে চোখ দুটি ধন্য করতে চায়।

সাহেব কথার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারলো না, সংক্ষেপে জানালো, আচ্ছা আচ্ছা।

বীরেন চৌধুরী একান্তে দাঁড়িয়ে তামাসার দ্বিতীয় অঙ্কের প্রত্যাশায় রইলো।

এবারে ডাক পড়লো খুদু মৈত্রের। তাকে নিয়ে আর এক সমস্যা, লোকটা মাথায় সাড়ে চার ফুট, বহরে সেই মাপের। পুলিশের পোশাক প্রমাণ সাইজের, কাজেই পোশাকের মধ্যে লোকটা মাথায় বহরে সম্পূর্ণ ডুবে গেল।

I see you are a pygmy.

Don't be disappointed sir, there stands the giant—বলে দেখিয়ে দিল বীরেন চৌধুরীকে।

What makes you so sickly and frail ?

মুখগহ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জানালো, sweet meat।

Take more meat than sweets. Now go.

সাহেবের হুকুম পেয়ে পোশাকের খোলস পরিত্যাগ করে ছুটে বেরিয়ে এল মৈত্র এবং দ্রুতপদে প্রস্থান করলো সন্দেশের দোকানের দিকে।

তারাচরণকে সাজাতে বেশি গোল হল না, কেবল পোশাক ও পাগড়ি পরিহিত তারাচরণ গোঁসাই একখণ্ড বাঁশের ডগার মতো দৃশ্যমান হতে লাগলো।

পেন্টুলুন, কোট, পাগড়ি, জুতো সমস্তই বেমানান ঢিলে, তন্মধ্যে মানবাত্মার মতো বিরাজমান উকীল শ্রীতারাচরণ গোঁসাই এম এ, বি এল।

তারপরে সাহেব পড়লো অক্ষয় ফৌজদারকে নিয়ে।

তুমি কী উকীল?

ইচ্ছা ছিল সাহেব কিন্তু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বেধে গেলাম।

এখন পেশা কী ?

ফৌজদার বলল, ট্রাইপস্ Tripos।

এখন তার তিনটে পেশা বলে বন্ধুরা পরিহাস করে তাকে বলতো ট্রাইপস্। বস্তুত তার অন্য অর্থ সে জানতো না।

What Tripos !

তিনটি আঙুল দেখিয়ে ফৌজদার বলল, Tripos।

ভাবটা যেন এ বারে অর্থ পরিষ্কার হয়েছে। সাহেব ভাবলো যাকগে আর বকাবকি করতে পারি নে।

তোমার এক পা খোঁড়া কেন?

দুই পা খোঁড়া হলে কি ভালো হতো?

নাও এই পোশাক পরো।

হুজুর খোঁড়া পুলিশ দেখলে কি সরকারের গৌরব বাড়বে।

তুমি পুলিশ কোথায়? তুমি কাগতাড়ুয়া। তোমাকে দেখে লোকে ভয় করবে।

দোহাই হুজুর লোকে হাসবে, সরকারের তাতে অপমান।

পোশাক পরলে সাহেব বলল, এ বার তোমার হাতের ছড়িখানা ফেলে দাও।

তাহলে আমি দাঁড়াতে পারব না।

কিন্তু স্পেশাল পুলিশের হাতে ছড়ি থাকা বেআইনি। তাই তো মুশকিল হল। আচ্ছা এক কাজ করতে পারো। পথের যেখানে কেরাসিনের বাতির খুঁটি আছে সেটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

তারাচরণ শুধালো, হুজুর, আমি মাঝে মাঝে তামাক খেতে পারবো তো?

না, ডিউটির সময়ে না।

কেন আপনার অন্য পুলিশদের খেতে দেখেছি।

চোপ রও। তারপরে জমাদারকে হুকুম দিল, যাও এদের দুজনকে নিয়ে রানী বাজার আর সাহেব বাজারের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দাও গে। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময়ে ছেড়ে দেবে, আবার কালকে সকালে সাড়ে আটটায় দাঁড়াবে।

এদিকে বীরেন চৌধুরী ও খুদু মৈত্রের প্রচার-কুশলতায় শহরের লোক ভেঙে পড়লো এই দুই সরকারী সঙ দেখতে। ছেলে বুড়ো ছাত্র মাস্টার, ঝি বউ, দোকানী খদ্দের সবাই ভিড় জমিয়ে হাসতে লাগলো। এমন সময়ে পালকী গাড়ির একটি ঘোড়া সহকর্মী ঘোড়াটির প্রতি দাঁত খিচিয়ে উঠল, কে একজন বলল, আরে দেখো দেখো ঘোড়াটাও হাসছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ দারোগারাও হাসতে আরম্ভ করলো, শহরময় হাসির হর্‌রা। রিপোর্ট পৌঁছে গেল পুলিশসাহেবের কাছে। সাহেব গিয়ে দেখল ফৌজদার মিউনিসিপ্যালিটির বাতির খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বাঁশরীহীন শ্রীকৃষ্ণের মতো ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটু নড়তেই পড়-পড় হয়, পাঁচজনে তখন আবার ভারসাম্য স্থাপনে সাহায্য করে। আর তারাচরণ উকীল আইনভঙ্গ না করে তাম্রকূট সেবন করছে, একজন তার মুখের কাছে হুঁকো ধরে আছে, আর একাগ্র মনে সে টানছে।

পুলিশ সাহেবের কাছে রিপোর্ট পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বুঝলো স্পেশাল পুলিশ সাজাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেইদিনেই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার আগেই তারাচরণ ও ফৌজদার সরকারী মর্যাদাচ্যুত হয়ে আবার সাধারণ নাগরিকে পরিণত হল।

ক্রোজেটের প্রতিশোধস্পৃহা তামাসায় পর্যবসিত হওয়ায় তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো রানী বাজার ও সাহেব বাজারের সেই সব দোকানদারদের উপরে, যারা স্বদেশী জিনিস বেচে। সাহেব তখনই পুলিশকে হুকুম দিল দোকানগুলো বন্ধ করে সিল করে দিতে। দোকানদারেরা কপাল চাপড়ে সাহেবের কাছে গিয়ে পড়ে হায় হায় করতে লাগল। 'Go to Surendranath Banerji, your uncrowned king', তোমাদের মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর কাছে যাও বলে সাহেব তাদের খেদিয়ে দিল। এখানে সূত্রপাত, শেষ নয়। তখন সাহেবের মস্তিষ্কে তরঙ্গ উঠল, brain wave, যেসব দোকান বিলিতি জিনিস বেচে তাদের দরজায় পুলিশ পাহারা থাকবে। ফল হলো উলটো, পুলিশের ভয়ে খদ্দের ঘেঁষল না দোকানের কাছে। বিক্রি একদম বন্ধ হয়ে গেল। তখন হরিপদ ভাবলো সাহেবের তো বদলির সময় আসন্ন, এ বার তার উপরে একহাত খেলিয়ে নেওয়া যাক, বেটা বুঝতে পারবে হরিপদর প্রভুভক্তির স্বরূপ। সাহেবের কাছে উপস্থিত হলে ক্রোজেট বলে উঠল, হরিপদ দেখেছ শহরের লোকগুলো কেমন পাজি, সস্তায় বিলিতি জিনিস পাচ্ছে তবু কিনবে না। বিলিতি জিনিস সবগুলো যে পচছে।

হরিপদ বলল, হুজুর আমি এমন পন্থা বলে দিতে পারি যাতে গুদাম সাবাড় হয়ে যায়।

কী পন্থা?

পুলিশ তুলে নিন।

তার পরে?

শহরে ঢোল শোহরৎ দিয়ে বলে দিন নগদ দাম যারা দিতে পারবে না ধারে তারা জিনিস পাবে।

যুক্তিটা সাহেবের মনে লাগলো কেন না ক্রেডিটে জিনিস দিলে যথাকালে শোধ করে দিতে হয় বলে তার সংস্কার ছিল। অন্য দেশ সম্বন্ধে এ সংস্কার সত্য হতে পারে তবে এ দেশকে সাহেব তখনো বোঝেনি। তবু একবার কিন্তু কিন্তু করে বলল, দোকানীরা দেবে তো?

হরিপদর কথা তখনও শেষ হয়নি, বলল, ঐ ঢোল শোহরতের সময় বলে দিতে হবে যে ধারের জন্য, ধার আদায় করে দেবার জন্য সরকার দায়ী থাকলো।

চমৎকার আইডিয়া, বসো বসো হরিপদ ঐ চেয়ারখানায় বসো।

এই প্রথম তাকে বসতে বললো সাহেব। হরিপদ বিনীতভাবে বসতে বসতে মনে মনে বলল, আমি কেবল বসবো না, তোমাকেও বসিয়ে ছাড়বো, হরিপদকে তুমি চেনোনি, সাহেব।

অনুরূপ কোন শোহরতের ফলে একদিনের মধ্যে বিলিতী মালের গুদাম উজাড় হয়ে গেল। পরদিন বিলিতী মালের অপ্রত্যাশিত চাহিদার রিপোর্ট চলে গেল চীফ সেক্রেটারীর কাছে।

ধারে জিনিস পেলে যে না কেনে সে নিতান্ত নির্বোধ, তা প্রয়োজন থাক নাই থাক। এই মূল সূত্র ও তার উপসূত্র অনুসরণ করে খদ্দের দোকানে গিয়ে পড়ে খাতায় নাম লিখিয়ে যার যখন ইচ্ছা জিনিস নিল, দোকানী সাগ্রহে দিল, দামের জন্য দায়ী খোদ

সরকার। স্বদেশী-আলাদের অনেকে নিল ঘরে ব্যবহার করবার জন্যে, বাইরে না পরলেই হল। হরিপদ সম্বৎসরে ব্যবহার্য কাপড়চোপড় নাম লিখিয়ে নিয়ে গেল, সবাই জানতো সাহেবের মুরুব্বি সে, আগ্রহ করে আরও কিছু বেশি চাপিয়ে দিল। মনে মনে হরিপদ বলল, চাপাচ্ছ চাপাও, এর পরে তোমরাই চাপা পড়ে মরবে। বলা বাহুল্য সবচেয়ে বেশি মাল নিল স্বদেশী স্কুল কলেজের ছাত্ররা। জিনিস নিয়ে স্তূপ করে সাজাল মিউনিসিপ্যাল দীঘির ধারে, তার পরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সবাই মিলে গান ধরল, "নগরে নগরে জ্বাল রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ, বিদেশী বাণিজ্যে কর্ পদাঘাত, মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই।" এদিকে সাবাড় গুদামের মালিকগণ অনেকদিন পরে হালকা মনে গান ধরলো, হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতায় আমার একলা নিতাই, কেউবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল সীয়ারাম, সীয়ারাম।

পরদিন অগ্নিদাহের খবর পেয়ে ক্রোজেট পুলিশকে হুকুম দিল, main culprit-দের প্রধান অপরাধীদের দশটা নাম অবিলম্বে পাঠিয়ে দিতে। এসব ব্যাপারে পুলিশের প্রায়ই দেরি হয় না, আর তাদের চোখে সবাই যখন প্রধান অপরাধী যে কোন দশটা নাম পাঠিয়ে দিল, তার মধ্যে যজ্ঞেশ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুশীলের নাম ছিল। তাদের সকলকে জেলে নিয়ে গিয়ে দুশো ঘা করে বেত মারবার হুকুম দিল ম্যাজিস্ট্রেট। হুকুম তামিল হতে বিলম্ব হল না।

এই ঘটনার ফল বিষম হল।

চব্বিশ

একদিন সকালবেলা সুশীলের পড়ার টেবিলের বইখাতা পত্র গোছগাছ করে দিচ্ছিল মলি। এটি প্রায় তার নিত্য কর্মের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। অগোছালো জিনিসপত্র সে দেখতে পারতো না, আর সুশীলের টেবিল যতদূর সম্ভব অগোছালো থাকতো। স্তূপাকারে বইখাতাপত্র যেমন তেমন ভাবে পড়ে থাকতো তার উপরে আবার পেন্সিল ছুরি কলম কোথায় যে কোন্‌টা তার স্থিরতা নাই, হয়তো বা দোয়াতের মধ্যে পেনসিল ডোবানো। ছুরিটা ঢুকিয়ে দিয়ে বইয়ের পত্র বিশেষ চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। আর বই যে কত রকম তার হিসাব কে রাখে। বইগুলো সাজাতে সাজাতে হঠাৎ সে ডাক দিল, বৌদি, এদিকে এসে দেখে যাও তোমার ঠাকুরপোর কীর্তি।

রুক্মিণী এসে বলল, মলি আবার ঠাকুরপোর টেবিলে হাত দিয়েছ, নিষেধ করেছিল না।

সে কথায় কর্ণপাত না করে একখানা বই তার চোখের সম্মুখে তুলে ধরে বলল, এই দেখো।

রুক্মিণী দেখলো বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত একখানা গীতা।

তা কী হয়েছে?

আবার কী হবে? এই বয়সে দাদা গীতা পড়তে আরম্ভ করেছে।

গীতা পড়বার কি বিশেষ বয়স আছে?

আছে না?

মা পড়েন, বাবা পড়েন, শৈলেন দাদা পড়েন।

তাঁদের বয়স হয়েছে তাই পড়েন।

রুক্মিণী বইখানা হাতে নিয়ে দেখলো নানাস্থানে পেন্সিলে চিহ্নিত পঠিত অংশ, বলল, ভালই তো কতকগুলো বাজে নভেল না পড়ে ধর্মগ্রন্থ পড়ে—মন্দ কি।

মলি বলল, শুধু গীতা হলে আপত্তি ছিল না। কিছুদিন হল মাছমাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

শৈলেনদাদাও তো মাছমাংস খান না।

বৌদি, শৈলেন দাদার কথা ছেড়ে দাও; তিনি বিয়ে করেননি। সংসারী মানুষ নন, তুমি কি চাও ছোটদা সেই রকম হন?

শৈলেনদাদার মতো হলে মন্দ কি, ওরকম মানুষ কটা আছে।

এমন সময়ে সুশীল এসে উপস্থিত হল। বলল, মলি, আবার তুই আমার টেবিলে হাত দিয়েছিস। নিষেধ করে দিয়েছিলাম না।

নিষেধ তো করেছিলে, একটু গুছিয়ে রাখলে তো আর হাত দিতে হয় না।

রুক্মিণী বলল, ঠাকুরপো আজকাল গীতা পড়ছ দেখছি।

এমন সময় মলি আর দুখানি বই আবিষ্কার করে বলে উঠল, শুধু কি গীতা? এই দেখো!

সুশীল কেড়ে নেবার আগেই বই দু'খানা রুক্মিণীর হাতে গুঁজে দিল মলি।

সে দেখল একখানার নাম ভবানী মন্দির, আর একখানা মুক্তি কোন্ পথে!

বৌদি, আমার বই দাও।

তা দিচ্ছি ঠাকুরপো, সত্যি বলো তো এসব কি। মুক্তি কোন্ পথে।

তুমি কি মুক্তির সন্ধানে হিমালয়ে চলে যাবে নাকি!

মলিনা যোগ করে দিল, আবার ভবানী মন্দির। এগুলোর মধ্যে আছে কী। এ সব নাম তো কখনও শুনিনি।

এ বারে তো শুনলে, এখন আমার বই আমাকে দিয়ে দাও।

মুক্তি কোন্ পথে বইখানা দেখে রুক্মিণী সত্যই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এ যে গীতার চেয়ে মারাত্মক। জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ঠাকুরপো সত্যি করে বলো দেখি গীতা পড়ে কি হয়?

সুশীল বলল, গীতা পড়লে মনটা শান্ত হয়।

এই প্রথম শুনলাম যে গীতা পড়লে মনটা শান্ত হয়।

কেন আগে কি শোননি, হাজার হাজার নরনারী গীতা পাঠ করছে শান্তি পাবার আশায়।

হাজার হাজার নরনারীর কথা ছেড়ে দাও। আমি তো জানি গীতা পড়লে মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

রুক্মিণীর কথা শুনে হেসে উঠল সুশীল, বলল, হাসালে বৌদি, একটা দৃষ্টান্ত দাও।

দেবো বইকি। আর একটার বেশি দরকারও হবে না।

বেশ বলো শুনি।

যাকে প্রথম শোনাবার উদ্দেশ্যে প্রথম গীতা উচ্চারিত হয়েছিল সেই অর্জুনের মনটা চুপসে গিয়েছিল। গীতা শুনবামাত্র সেই চুপসে পড়া মন চাঙ্গা হয়ে উঠল, আর অমনি গাণ্ডীব হাতে করে মার্ মার্ রবে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। সত্যি কি না।

বউদি তুমি যে মস্ত শাস্ত্রী হয়ে উঠলে।

সাধে কি হয়েছি ভাই। একজন তো ইংরেজের সঙ্গে লড়তে গিয়ে জেলে গেলেন, আর একজনও দেখছি সেই পথে মুক্তি কোন্ পথে সন্ধান করছে। বাবা মার কথা একবার ভেবে দেখো।

মলিনা এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিল, মনে মনে তারিফ করছিল বৌদির, এমন ভাবে গুছিয়ে যুক্তি দিয়ে কথা বলা তার সাধ্যাতীত ছিল।

এবারে সুশীল বলল, বৌদি, বয়েসে তুমি আমার চেয়ে ছোট, অথচ কথা বলছ কতকালের বুড়ী।

ভাই ঠাকুরপো, তুমি কি করে জানবে যে বিয়ে হওয়া মাত্র মেয়েদের বযসে রাতারাতি ডবল প্রেমোশন হয়ে যায়। তখন তার মুখ দিয়ে বুড়ীর মতো কথা বের হয় যা নাকি আদ্যিকালের কথা।

মলি বলল, এরকম যে হবে আমি আগেই জানতাম। যখন দাদা মাছমাংস খাওয়া ছাড়লো বাবা শুনে বললেন ওর ইচ্ছা যদি না হয় নাই খেলো। তার পরে যখন শুনলাম বিকেলবেলা ডন কুস্তি আরম্ভ করেছে, মা শুনে বললেন ভালোই তো, স্বাস্থ্যটা ভালো থাকবে। সকলে মিলে ছোট ছেলেটিকে আস্কারা দিতে দিতে কোথায় এনেছে দেখো। গীতা পাঠ, মুক্তি কোন্ পথে সন্ধান, আর ভবানী মন্দিরটায় না জানি কি আছে। আবার একখানা আনন্দমঠ দেখছি।

রুক্মিণী এবার সুশীলের পক্ষ নিল, বলল, আনন্দমঠে দোষ কি, ও তো আমরা সবাই পড়েছি।

সে তো আমিও পড়েছি, কিন্তু এই বইগুলোর সঙ্গে মিললে যোগফল কি দাঁড়ায় ভেবে দেখো।

বৌদি, এ যে বিয়ের আগেই মলির বয়সে ডবল প্রোমোশন হয়ে গিয়েছে, শুনছ কথার ধরন।

ধরনটা ভালো করে দেখাচ্ছি। চললাম আমি বইগুলো নিয়ে মাযের কাছে। বলবো মা, তোমার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে যদি সোজা জেলে পাঠাবার ইচ্ছা না থাকে তবে এখনো সাবধান হও।

সুশীল ব্যঙ্গ কবে বলল, 'কনিষ্ঠ পুত্র' কেন ছোট ছেলে বললে কি অনিষ্ট হতো।

তুমি কি আর সত্যি ছোট আছ দাদা, তবে নিতান্ত যে ছোটদা বলি সেটা অভ্যাসের দোষ। এই বলে বই চারখানা নিয়ে মায়ের উদ্দেশে প্রস্থান করলো।

ফল হলো উল্টো। নিস্তারিণী দেবী তখন আহ্নিক করছিলেন—মলিনার অভিযোগ শুনে ঠাকুর প্রণাম করে গীতাখানি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, মা, সুশীর সুমতি দাও। তার পরে ভবানী মন্দির বইখানা দেখে বললেন, এই রকম একখানা বই সন্ধান করছিলাম। আর মুক্তি কোন্ পথে দেখে ঝরঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস। চোখ মুছে বললেন, আমিও তো ঐ পথ সন্ধান করে ফিরছি মা।

মলি বলল, তোমার বয়স হয়েছে তুমি সন্ধান করছ, তোমার ছোট ছেলের এখনই ও পথের সন্ধানে কি দরকার।

এ সব তত্ত্বকথা তুই বুঝবি নে মলি, তোর এখনো সে বয়স হয়নি।

বেশ মা আমি যাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো তোমার এক শ্রীমান আজ শ্রীঘরে, আর এক শ্রীমান কোন্ ঘরে যাবে তার স্থির কি!

বাজে বকিসনি মলি, ওকে অল্প বয়সেই ভগবান কৃপা করেছেন।

তাই মাছ মাংস ছেড়েছেন, এখন একখানা গেরুয়া কাপড় দাও হিমালয়ে চলে যাবে।

মলির কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, এ যে দেখছি আনন্দমঠ। এখানা আর একবার পড়বো, আহা কল্যাণীর কথাগুলো ভারি মিষ্টি। নে, বাকি তিনখানা তোর ছোটদাকে ফিরিয়ে দে গিয়ে।

তুমিই স্বহস্তে ফিরিয়ে দিয়ো—বলে মলিনা প্রস্থান করলো।

দেখলে তো ভাই বউদি ভালোর কাল নেই।

রাগ করিস কেন, আমরা কি মা বাবার চেয়ে বেশি বুঝি?

না, বেশি বোঝে তোমার ঐ ঠাকুরপো—বলে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

মলিনা বাড়িতে সকলের চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু তার কথাগুলিই মর্মান্তিকভাবে ফললো। তবে ফল তো অমনি ফলে না, ফলে গাছে। এখন সেই গাছের বিবরণ।

শহরের একান্তে মাঠের মধ্যে শ্মশানের কাছে মরা একটা নদীর ধারে সিদ্ধেশ্বরী কালীর মন্দির। কেহ বলে রক্ষাকালী, কেহ বলে শ্মশানকালী, কেহ বা শুধুই বলে সিদ্ধেশ্বরী কালী। মন্দির পুরাতন ও ভগ্ন, বেদী মূর্তিশূন্য, তবে দেবী জাগ্রত, তাঁর প্রভাব নাকি অপরিসীম। ভয়ে সে দিকে লোকে সন্ধ্যার পরে যেতো না। কদাচিৎ দু-একজন তান্ত্রিক সাধক মাত্র সেখানে দেখা যায়। সেখানে আজ সন্ধ্যার পরে মশালের আলোয় কয়েকজন লোক সমাগত। মশালের আলোয় ও ধোঁয়ায় সেই ভীষণ স্থান আজ ভীষণতর। কারো সেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, দূর থেকে সেই আলো যদি বা কারো নজরে পড়ে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে যায়। সেখানে এই ব্যক্তিরা কী করছে কেউ জিজ্ঞাসা করে না, ভাবে ওসব তন্ত্র সাধনের ব্যাপার, গৃহীর কৌতূহলের বিষয় নয়। ওখানে আজ কী হচ্ছে!

সরকারি অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় যুবকদের মন হিংসার পথ অবলম্বন করেছে। হিংসার আশ্রয় ছাড়া বর্তমান অবস্থার প্রতিকার সম্ভব নয় বলে তাদের ধারণা। তারা ভাবে বয়কট করে কোন কাজ হবে না, ইংরাজ রাজ্য ওতে টলবে না, চাই রক্তপাত। রক্ত দিতে হবে, রক্ত নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের শহরে শহরে বড় বড় গ্রামে গঞ্জে যেসব গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মূল সমিতির পত্তন খাস কলকাতায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলকাতার মূল সমিতিকে গুরুত্বে ছাড়িয়ে গিয়েছে ঢাকার সমিতিটা, কার্যত সেটাই এখন প্রধান। এখানকার সমিতির কার্যকলাপ নিয়ে প্রকাণ্ড মামলা হয়ে গিয়েছে, কলকাতার নামী ব্যারিস্টার মিঃ সি. আর. দাশ এসেছিলেন আসামি পক্ষে। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন হিংসা বা রাজনীতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত অনুশীলন তত্ত্বের উপরে এর ভিত্তি, যার উদ্দেশ্য নাকি মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। আসামীদের অনেকে খালাস হয়েছিল, কয়েকজনের কঠোর দণ্ডের বিধান হল। কিন্তু তাতে সমিতির কাজ বাধাপ্রাপ্ত হলেও বন্ধ হল না, সমিতির যেমন প্রসার হচ্ছিল হতেই থাকলো।

এ সব সমিতি শুধু নামেই গুপ্তসমিতি নয় কাজেও বটে। মন্ত্রগুপ্তি এর প্রধান অঙ্গ। মন্ত্রগুপ্তি ভেদের দণ্ড গুরুতর, প্রাণ দিতে হয়, অনেক সময়ই স্বহস্তে স্বেচ্ছায়, নিতান্ত বাধ্য হলে নেতার হাতে। এই জন্যে অনেক সতর্ক হয়ে, অনেক বাছাই করে, অনেক দিন অনেক প্রকার পরীক্ষার পরে সদস্য সংগ্রহ করবার নীতি, বাজে মাল, কাঁচা মাল, ভেজাল একেবারে বর্জিত। প্রথমে প্রধান নেতার নির্বাচিত ব্যক্তিকে উদ্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হত্ত ডন কুস্তি লাঠিখেলা প্রভৃতির আখড়া স্থাপন করতে। প্রেরিত ব্যক্তি উদ্দিষ্ট স্থানের হলেই ভালো, বাইরের অজানা. লোক হলে সন্দেহ হতে কতক্ষণ। কিছুকাল আখড়ার কাজ চলবার পরে প্রেরিত ব্যক্তি দু-একজন যুবককে মনে মনে নির্বাচন করে তাদের নাম ধাম বয়স বংশ, ছাত্র হলে , অধিকাংশই ছাত্র, তাদের স্কুল কলেজের নাম ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠিয়ে দিত প্রধান নেতার কাছে ঢাকায়। তাঁরা দীক্ষাযোগ্য মনে হলে প্রধান বলে পাঠাতেন ওদের উপরে নজর রাখো, অর্থাৎ এবারে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ আরম্ভ করো। প্রাথমিক পর্যায় নিতান্ত নির্দোষ। দেশের বর্তমান অবস্থা ও ইতিহাসের আলোচনা, ইংরাজ সাম্রাজ্য পতনের বিবরণ ইত্যাদি, সেই সঙ্গে চলতো গীতাপাঠ ও আনন্দমঠ পাঠ। নেতার অনুকূল রিপোর্ট পৌঁছলে প্রধানের আদেশ আসতো কাজ আরম্ভ করো। আদেশগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও আপাতদৃষ্টে অত্যন্ত সরল। প্রাথমিক পর্যায়ের পরে পাঁচ জন নির্বাচিত হলে, সাত জনও হতে পারে তবে দশজনের বেশি কখনোই নয়, সংখ্যার চেয়ে আন্তরিকতার উপরে বেশি জোর দেওয়া হত। আবার নির্বাচিত পাঁচজন কখনোই এক স্থানের হবে না, কাছাকাছি অন্যত্র যে-সব আখড়া আছে সেখান থেকে সংগৃহীত, যাতে তারা পরস্পরকে চিনতে না পারে, আর দীক্ষার আগে কখনোই তারা যেন পরস্পরের সান্নিধ্যে না আসে, নাম ধাম ও পরিচয় জানতে না পারে। প্রথম সাক্ষাৎ দীক্ষার স্থানে, সে সাক্ষাৎও নির্জনে সন্ধ্যার সময়ে, মশালের শিখার আলো আঁধারিতে। এত সতর্কতার প্রয়োজন ও কারণ ছিল। একজন ধরা পড়লে পুলিশের অত্যাচারে বা প্রলোভনে অপরকে যাতে ধরিয়ে না দিতে পারে। জেল বা প্রাণদণ্ড হলে একা সে-ই যাবে। দীক্ষার পরে প্রত্যেককে একটি সংখ্যা জানিয়ে দেওয়া হতো, সেই সংখ্যা দ্বারা সে পরিচিত; আর দেওয়া হতো একটি সাংকেতিক ঠিকানা; প্রয়োজনকালে সেই ঠিকানায় নামের বদলে সংখ্যা জানিয়ে চিঠি লিখতে পারে— কিন্তু কোনক্রমেই লিখিত বিষয় একটি ছত্রের অধিক হবে না। তার কাছে সরাসরি কোন পত্র আসবে না, তবু যেমন করেই হোক চিঠি পৌছবে তার কাছে—সে পত্রও ছত্রপরিমিত। তারপরে দীক্ষার দিন ধার্য হলে, স্থান ও কাল জানিয়ে দেওয়া হতো, দীক্ষাগুরু যিনি আসতেন তাঁর সঙ্গে অখড়ার কোন সম্পর্ক নেই, তিনি সকলের অপরিচিত, যেন আকাশ থেকে পড়লেন, দীক্ষান্তে আবার যেন আকাশে মিলিয়ে গেলেন। তাঁকেও আলো-আঁধারিতে ভালো করে দেখা যেতো না। দীক্ষার আগের দিনে দীক্ষালাভেচ্ছুকে জানিয়ে দেওয়া হতো, আগের দিন রাতে সংযম, দীক্ষাদিবসে উপবাস ও দীক্ষার আগে স্নান ও গৈরিক বসন পরিধান একান্ত বিধেয়। এইভাবে সমস্ত প্রস্তুত হলে দীক্ষাস্থানে তাকে আহ্বান করা হতো, অন্য দীক্ষার্থীদের সঙ্গে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ, প্রয়োজনে দীক্ষাগুরুর সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। অকারণ কৌতূহল সর্বথা বর্জনীয়।

দিনাজশাহীর কুস্তির আখড়া থেকে সুশীল নির্বাচিত হয়েছে, একমাত্র সে-ই। সর্বপ্রকার পরীক্ষা করে ক্যাপ্টেন (আখড়া পরিচালকের নাম) বুঝে নিয়েছে খাঁটি রুপো, এতটুকু খাদ নেই। যদি বা কিছু ছিল সেদিনের চাবুকের ঘায়ে তা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সুশীল সংযম, উপবাস ও স্নান করে প্রস্তুত হয়ে রইলো, কিন্তু বাড়িতে থাকবে অথচ খাবে না এমন তো সম্ভব নয়—অনেক রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, কাজেই মাদা নামে গ্রামে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বলে ভোরবেলাতেই রওনা হয়ে গেল আর সারাটা দিন এক বন্ধুর বাড়িতে আত্মগোপন করে থেকে সন্ধ্যার আগে সিদ্ধেশ্বরীতলায় গিয়ে পৌঁছলো, দেখলো ক্যাপ্টেন উপস্থিত। তার পরে সন্ধ্যা হয়ে এলে এসে উপস্থিত হল সম্পূর্ণ অপরিচিত চারজন যুবক, বুঝলো তারাও দীক্ষার্থী। পরস্পর কথা বলা নিষিদ্ধ, কাজেই বাক্যালাপ হল না। মন্দিরের বাইরে তারা উপবিষ্ট রইলো। অন্ধকার ঘন হয়ে এলে ক্যাপ্টেন ইঙ্গিতে তাদের আহ্বান করলো, তারা পিছু পিছু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলো, দেখতে পেলো অপরিচিত এক প্রৌঢ় ব্যক্তি পূজার আসনে উপবিষ্ট, তাঁর মুখে শ্মশ্রু গুম্ফ, পরনে রক্তাম্বর, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, সম্মুখে পূজার উপচার। তাঁর ইঙ্গিতে পাঁচ জন বসলো, ক্যাপ্টেন পিছনে দণ্ডায়মান। পূজা ও হোম শেষ করে তিনি বেদীর সম্মুখে প্রণাম করলেন দীক্ষার্থীরাও প্রণত হল। তার পরে দীক্ষার্থীদের কপালে বিভূতি লিপ্ত করে দিলেন দীক্ষাদাতা, আর একখানি তলোয়ার দিয়ে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা থেকে রক্ত বের করে পাঁচজনের কপালে তিলক পরিয়ে দিলেন। তলোয়ারখানা লক্ষ্য করে তারা দেখতে পেলো পরপর আরও পাঁচখানা তলোয়ার পাশাপাশি সজ্জিত। তখন ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিতে দীক্ষার্থীগণ বাম জানুর উপরে ভর দিয়ে দক্ষিণ পদ প্রসারিত করে দিয়ে প্রত্যালীঢ় ভাব ধারণ করলে দীক্ষাদাতা সকলের মস্তকে একখানি করে গীতা ও আনন্দমঠ স্থাপন করলেন, ডান হাতে দিলেন জবা ফুলের নির্মাল্য, বাম হাতে একখানি করে তলোয়ার। এই রূপে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হলে দীক্ষাদাতা শপথবাক্য উচ্চারণ করলেন। সে-সব শপথ যেমন কঠোর, তেমনি দুর্বার, তেমনি অলঙ্ঘ্য। শপথ বাক্যের প্রশ্নোত্তর নিম্নলিখিত রূপ।

তোমরা দীক্ষিত হইবে?

আমাদের দয়া করুন।

তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত ও অনশন আছ তো?

আছি।

তোমরা এই ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করো। সন্তান ধর্মের নিয়মসকল পালন করিবে?

করিব।

যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে?

করিব।

মাতাপিতা ত্যাগ করিবে?

করিব।

ভ্রাতা ভগিনী?

ত্যাগ করিব।

দারাসুত?

ত্যাগ করিব।

আত্মীয়স্বজন? দাসদাসী?

সকলই ত্যাগ করিলাম।

ধন—সম্পদ—ভোগ?

সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনো একাসনে বসিবে না?

বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

ভগবৎ সাক্ষাৎকারে প্রতিজ্ঞা করো, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না? যাহা উপার্জন করিবে মাতার ধনাগারে দিবে?

দিব।

মাতার উদ্ধারের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

করিব।

রণে কখনো ভঙ্গ দিবে না?

না।

যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি জানি না। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বলো?

আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্বান্তর্যামী, সর্বজয়ী, সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জারের নখে তুল্য রূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

তথাস্তু।

তোমরা গাও বন্দে মাতরম্।

তাহারা সেই মন্দিরমধ্যে অরণ্যসম নির্জনতায় গভীর নিশীথে মাতৃস্তোত্র গীত করিল।

দীক্ষাদাতা সকলকে যথাবিধি দীক্ষা দিলেন।

তারা প্রথমে বেদীর সম্মুখে, তারপরে দীক্ষাগুরুকে প্রণাম করিল। তাদের প্রত্যেককে একখানি করে গীতা ও আনন্দমঠ দেওয়া হল।

মলিনা এই গীতা ও আনন্দমঠ আবিষ্কার করেছিল। ভবানী মন্দির ও মুক্তি কোন্ পথে পরে প্রাপ্ত।

এ সব ঘটনা সুশীলের বাড়ির কেউ জানতে পেলো না। সুশীলও কাউকে কিছু জানালো

না—বাইরে যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সুশীলের পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল।

এমন সময়ে যজ্ঞেশবাবুর নামে এলো আশু মুখুজ্জের পত্র। তিনি সুশীলের বেত্রাঘাত দণ্ডের ঘটনা শুনেছিলেন। যজ্ঞেশবাবুকে লিখলেন, সুশীলের আর ওখানে থাকা উচিত হবে না, অবিলম্বে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন, ভালো কলেজে পড়বার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, থাকবি কোথায়?

কেন দাদার বাসা আছে, তার চাকরের জিম্মায় সেখানে।

গিয়েই আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করবি।

ঠিকানা তো জানি নে।

আরে পাগল, আশু মুখুজ্জের বাড়ি বললে সবাই চেনে,—ভবানীপুরে।

নিস্তারিণী দেবী হঠাৎ বলে বসলেন, ওর সঙ্গে বউমা যাক না কেন?

শচীন জেলে, বউমা গিয়ে কী করবে? তবে এ বারে শচীন বেরিয়ে এলে বউমাকে নিশ্চয় পাঠাবো।

প্রশ্নোত্তর শুনে একই সঙ্গে চোখে জল মুখে হাসি এলো রুক্মিণীর, এমন সময়ে পিছন থেকে বাহুতে নিদারুণ এক চিমটি কাটলো মলিনা।

রুক্মিণী মুখ ফেরাতেই মলিনা বলল, চোখে জল কেন?

যে চিমটি কেটেছিলে!

তবে আবার মুখে হাসি কেন?

কবে তোমাকে এই রকম চিমটি কাটতে পারবো ভেবে।

আমি ভাবলাম হঠাৎ বুঝি দাদার কথা মনে পড়লো।

যে চিন্তা অহোরাত্রের সঙ্গী তার সম্বন্ধে কি হঠাৎ শব্দ প্রয়োগ চলে। মলিনা এখনো বড় ছেলেমানুষ।

সুশীল কলকাতা রওনা হয়ে গেল। যাওয়ার আগে সাংকেতিক ঠিকানায় জানাতে ভুল করলো না।

পঁচিশ

ইংরাজের মতো আপোসী জাত ইতিহাসে বিরল। তারা যদি এক পা এগোয় তবে দুই পা পিছোয়, লড়াই আরম্ভ করবার আগেই সন্ধির শর্ত স্থির করে রাখে, যাকে আক্রমণ করবে এক হাত দেয় তার গলায়, এক হাত পায়ে। ব্যবসা করতে গিয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করে আবার বেগতিক দেখলে ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। এদের তুলনা মেলা ভার।

বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারটা যে ভুল হয়ে গিয়েছে বুঝতে তাদের বেশ কিছু সময় লাগলো, কারণ ভারত শাসন ব্যাপারে তারা ত্রিনয়ন। এক নয়ন প্রাদেশিক সরকার, এক নয়ন ভারত সরকার, তৃতীয় নয়ন ভারত সচিব। তিন চোখের দৃষ্টিতে মিলতে কিছু সময় লাগবার কথা। যখন মিললো বুঝলো বঙ্গভঙ্গ করা ঠিক হয়নি। হিসাব করে দেখলো বিলিতি মালের চাহিদা অসম্ভব কমে গিয়েছে, লাঠি চালিয়ে মাল বেচা যাচ্ছে না, পরন্তু লাঠির প্রতিক্রিয়ায়

যুবকেরা বোমা তৈরি করছে, পিস্তল চালাতে শুরু করেছে, মরছে সরকারী কর্মচারীর দল সাদা ও কালো। তখন তাদের মনে পড়ে গেল পায়ের হাতখানার কথা, গলার হাত শিথিল করে দিল। আর শুধু কী তাই। বাংলাদেশে যে আগুন জ্বলেছে তার ফুলকি ছিটিয়ে পড়ছে মারাঠায়, পাঞ্জাবে, উত্তরপ্রদেশে, এমন চললে যে সমস্ত আটচালাখানাই জ্বলে যাবে। অতএব বঙ্গভঙ্গ তো রদ করা আবশ্যক। তখন, তখন মনে পড়লো দেশটাকে শান্ত করবার প্রয়োজন।

জাদুকর যেমন ছোট্ট লাঠিখানা বুলিয়ে অসাধ্য সাধন করে সেই চেষ্টা করলো ইংরাজ জাদুকর। তাদের এই জাদুদণ্ডখানার নাম ইংলণ্ডেশ্বর। সময়ে অসময়ে গতিকে বেগতিকে ওটাকে বুলিয়ে দেয় দেশে বিদেশে সাম্রাজ্যের উপরে। এই জাদুদণ্ডখানার এই শক্তি আছে বলেই ইংরাজ জাত ইংলণ্ডেশ্বরকে সযত্নে পোষণ করে। ইংরাজ সরকার রব তুলল সম্রাট ভারত ভ্রমণে যাবে। দেশে যিনি রাজা বিদেশে তিনিই ভারতসম্রাট। ভারতবাসীর রাজভক্তির উপরে ইংরাজের ঐতিহাসিক বিশ্বাস। পুরাকাল থেকে এরা রাজশাসিত, রাজার নামে এরা বিগলিতচিত্ত। হলও তাই। মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সবাই উল্লসিত হল, সম্রাট আসছেন, সম্রাট তখন সিংহাসনে নব উপবিষ্ট পঞ্চম জর্জ।

কংগ্রেস তখনো রাজভক্ত, রাজার ও তার সাম্রাজ্যের দীর্ঘায়ু কামনা করে অধিবেশন আরম্ভ করতো। আর প্রথমেই তিনি পদার্পণ করবেন কলকাতায়, কলকাতা ভারতের রাজধানী। বুদ্ধিমানেরা অনুমান করলো তিনি কি শূন্য হাতে আসছেন। নিশ্চয় বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেবেন। এ বারে বুদ্ধিমানদের অনুমান নিতান্ত মিথ্যা হল না। দেশের নেতাদের প্রধান তখন সুরেন্দ্রনাথ; ভক্তরা ইংরাজি বানানটাকে সামান্য অদলবদল করে বলতো Surrender not, আর এক নেতা ফেরোজ শা মেটা, ভক্তদের মুখে তিনি Ferocious Mehta! তিলক তখন জেলে, অরবিন্দ ত্যাগ করেছেন রাজনীতি।

সম্রাটের আগমনের জন্য রঙ্গমঞ্চের কিছু অদলবদল আবশ্যক। প্রথমেই ছেড়ে দেওয়া হল বিলিতি মাল বয়কটের আসামীদের, অবিনাশবাবু, শচীন, অতুল, ভূপতির দল আবার বাইরের আলো-হাওয়ায় ফিরে এলো, অবশ্য বোমা ও পিস্তলের আসামীরা রয়ে গেল তখন জেলে বা দ্বীপান্তরে।

খবরটা কিভাবে রটলো কেউ জানে না, তবে খবরটা ঠিক। সম্রাট ভারতে পদার্পণ করেই বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেছেন। যুবকেরা গিয়ে হাজির হল বৌবাজারের বেঙ্গলী পত্রিকার আফিসে। শচীন, ধ্রুবেশ, অতুল প্রভৃতির মতো মাথালো কয়েকজন যুবক উপরে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে বলল, স্যার, সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেছেন। তিনি বললেন, কই আমি তো কিছু জানি নে।

না, খবর সত্যি।

তবে চলো গোলদীঘিতে।

সুরেন্দ্রনাথ গাড়িতে উঠলে ছেলের দল ঘোড়া খুলে দিয়ে গাড়ি টানতে শুরু করলো। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, ও কি করছ?

না স্যার, আজ আপত্তি শুনবো না।

ঘোড়া দুটো ভাবলো বাবুদের মাথা খারাপ হয়েছে। ভাবলো আহা আর যেন ভালো না হয়, কিন্তু এমন সৌভাগ্য হবে কি। তা যতক্ষণ খারাপ থাকে জিরিয়ে নেওয়া যাক।

মানুষে টানা ঘোড়ার গাড়ি আমাহার্স্ট স্ট্রীটে ঢুকে মির্জাপুর স্ট্রীট হয়ে গোল-দীঘির পুবদিকে এসে পৌঁছলো—তখনো গোলদীঘির মধ্যে গ্যাসের আলো জ্বলেনি। মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চতুর্দিক কম্পিত।

ঘন ঘন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও করতালির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করে চলেছেন। ততক্ষণে তিনি সংবাদের আদ্যন্ত জানতে পেরেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য "আমাদের জয়, সরকারী কর্মচারী চক্রের ব্যূহভেদ করে আমরা ভাঙা বাংলাকে জোড়া লাগাতে সমর্থ হয়েছি, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে অতএব বয়কট নীতি অপসারিত হল।" তখন সেই অস্পষ্ট জনতার মধ্যে থেকে অদৃশ্য এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো এই যে কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে অপসারিত হল তাতে আমাদের ক্ষতি হল না?

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, আমার তো মনে হয় কোন ক্ষতি হয়নি।

বক্তৃতা শেষ করে সুরেন্দ্রনাথ গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, ছেলেরা টেনে নিয়ে বেঙ্গলী আপিসের দিকে চলল, ঘোড়া দুটি সহিসের হাতে পিছনে পিছনে।

একটি ঘোড়া বলল, ভায়া এ বারে বোধহয় বেবাক ছুটি পাওয়া যাবে।

অপরটি বলল, তুই গাধা নাকি?

কেন?

বাবুদের উৎসাহ খড়ের আগুন। এমন অনেকবার দেখেছি।

জনতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার দিকে চলে গেল। শচীনের পাশে একজন অপরিচিত ব্যক্তি চলছিল, সে কতকটা আপন মনেই বলল, ভাঙা বাংলা জোড়া লাগলো বটে কিন্তু এ বারে ভাঙলো সমস্ত বাঙালীর কপাল, এ আর জোড়া লাগবে না।

শচীন অযাচিতভাবে শুধালো, কেন বলুন তো?

শুনে ফেলেছেন নাকি!

তাতে দোষ কি?

দোষ এই যে আজকে একথার অর্থ কেউ বুঝতে পারবে না। এতদিন বাংলা দেশ ছিল ভারতের চৌমাথার উপরে, এবারে ঢুকলো গিয়ে কানাগলির মধ্যে, এর থেকে আর উদ্ধারের উপায় নেই।

তবে কি বলতে চান ভাঙা বাংলাই ভালো ছিল?

নিশ্চয়ই নয়।

তবে কেন এরকম সন্দেহ করছেন?

ইংরেজ বাংলাদেশকে এক পথে দুর্বল করতে না পেরে অন্য পথ ধরলো। এ থেকে মুক্তির উপায় তো দেখি না——বলে লোকটি ডানে বেঁকে মেডিকেল কলেজের দিকে চলে গেল। শচীন বাঁয়ে বেঁকে ঢুকলো গিয়ে ফেভারিট কেবিনে। এক পেয়ালা চা সম্মুখে নিয়ে বসে রইলো, অপরিচিত সেই লোকটির কথা তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগলো, তার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে চেষ্টা করছিল শচীন। কতক্ষণ সে চিন্তামগ্ন ছিল জানে না, হুঁশ হল যখন দোকানের একটি বয় বলল, মশায়, চা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

শচীন হাত দিয়ে দেখল তাই বটে।

আর এক কাপ দেব কি?

না—বলে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে বাসার দিকে চলল সে।

ছাব্বিশ

দেখো মুখে স্বদেশী স্বদেশী কপচালেই হয় না কাজে করে দেখানো চাই। আমি তোমাদের মতো পার্কে পার্কে স্পীচ ঝেড়ে বেড়াই নে, দোকানে দোকানে পিকেটিঙ করি নে, শোভাযাত্রা করে বন্দেমাতরম্ আওয়াজ তুলি নে, আমার স্বদেশী কাজে।

যথা—

ঘটে বুদ্ধি থাকলে যথা যথা করতে না।

ঘটে যখন বুদ্ধি নেই বলে বুঝে ফেলেছ বলই না তোমার স্বদেশীর নমুনা।

দুটো একটা তো নয়—কত বলবো।

বেশি নয়, গোটা কতক বললেই চলবে।

তবে শোনো—বলে হরিপদ আরম্ভ করলো, শ্রোতা তারাচরণ প্রমুখ অল বেঙ্গল লোন আফিসের অন্যান্য সভ্য। সভায় আজ নিয়মিত সভ্যগণ সবাই উপস্থিত ছিল, উপরিরও অভাব ছিল না।

বেশ তবে শোনো—বলে হরিপদ আরম্ভ করলো, বলি ক্রোজেট সাহেব বেটাকে এ জেলা থেকে তাড়ালো কে?

তুমি! তুমি কি চীফ সেক্রেটারি না ছোটলাট!

তারাচরণ ভায়া আর যাই করো জ্ঞানপাপী সেজো না। বেশ জানো ক্রোজেটকে তাড়াবার মূলে আমি।

ফৌজদার বলল, বুঝিয়ে বলো।

এই সহজ ব্যাপারটায় বুঝবার এত কী আছে জানি না। বেটা স্বদেশী কাপড়ের দোকান বন্ধ করে দিয়ে বিলিতি কাপড় ধারে বিক্রির হুকুম দিয়েছিল মনে আছে তো? বলেছিল ধার আদায়ের ভার সরকারের উপর। একটি পয়সা কেউ উপুড়হস্ত করেনি, এখন আড়াই লাখ টাকার জন্য সরকার দায়ী হয়েছে। চীফ সেক্রেটারি বলেছে এ দায় ক্রোজেটের ব্যক্তিগত। অবশ্য সরকার ম্যাজিস্ট্রেটের প্রেসটিজ রক্ষার্থ টাকাটা অ্যাডভান্স করে দিয়েছে কিন্তু মাসিক কিস্তিতে কাটা যাচ্ছে ক্রোজেট ব্যাটার মাইনে থেকে। হিসেব করে দেখেছি ভায়া পেন্সন থেকেও কিস্তি শোধ করতে হবে। বুঝলে ভায়া এই হচ্ছে যথার্থ স্বদেশী—বলে বুকে সগৌরবে চাপড় মারলো। তোমরা যা করছ তার নাম চ্যাঙড়ামি।

সভ্যদের অনেকেই হরিপদর কথা বিশ্বাস করলো, বলল, এটা কাজের মতো কাজ বটে।

তারাচরণ উকীল ও অক্ষয় ফৌজদারের সবচেয়ে বেশি রাগ হরিপদর উপরে,—আর আমাদের নিয়ে চৌমাথার মোড়ে স্পেশাল কনস্টেবল সাজিয়ে দাঁড় করানো সেটাও বুঝি স্বদেশী?

আলবৎ স্বদেশী।

দেখো হরিপদ—বলে ত্রিপদীর এক পদ সেই লাঠিখানা তুললো ফৌজদার।

আগে বুঝে নাও পরে লাঠি নাচিও। ক্রোজেট যখন স্পেশাল কনস্টেবল হওয়ার মতো লোকের নাম চাইলো আমিই দিলাম তোমাদের চার জনের নাম।

তুমিই দিলে?

দিলাম বইকি।

তা হলে যে তোমাকে আমাদের আড্ডা থেকে বয়কট করেছিল অন্যায় করেনি?

আরে অন্যায় যে করেছিল তার প্রমাণ এখন দরজা খুলে দিয়েছ। তোমাদের দোষ দিই নে, ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ।

বীরেন চৌধুরী শুধালো, ভায়া, আমাদের উপরে এ অহেতুক দয়ার কারণ?

তোমাদের উপরে দয়া! তোমরা কি আমার দয়ার যুগ্যি! দয়া বঙ্গজননীর উপরে।

খুদু মৈত্র মুখগহ্বরস্থ সন্দেশটাকে আয়ত্ত করতে করতে বলল, আহা বঙ্গজননীর কী সৌভাগ্য।

যাই বলো কারণ বিশ্লেষণ করলেই আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে। আমি জানি যে বীরেনভায়া আর খুদুভায়াকে মানায় পুলিশের এমন মাপের পোশাক নেই—ওরা বাদ পড়ে যাবে। আর তোমাদের পুলিশের পোশাকে এমন বেঢপ বেমানান দেখাবে যে শহরময় হাসির রোল উঠবে। উঠল কি না। সাহেব রেগুলেশান আলোচনা করে দেখালো হাসি বন্ধ করবার কোন আইন নেই। ভাবলো দূর হোক গে ছাই স্পেশাল কনস্টেবল সরিয়ে নাও। প্রথম দিনেই সাহেবের আক্কেল হয়ে গেল, নইলে দেখতে তোমাদের সকলকেই স্পেশাল কনস্টেবল সাজতে হত। এরই নাম স্বদেশী, চোঙ মুখে দিয়ে স্লোগান ছড়িয়ে বেড়ানো স্বদেশী নয়।

হরিপদর আত্মগরিমা প্রচারে সকলে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। চটকা ভাঙলে তারাচরণ বলল, এর পরে বলবে অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে ভাঙিয়ে দেওয়াটাও তোমার কাজ। আর সেটা স্বদেশীর একটা নমুনা।

তারাচরণ ভায়া তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। আমি সগর্বে স্বীকার করছি নাটোরের বিয়ে ভাঙিয়ে দিয়েছি আমিই আর তা করেছি স্বদেশের জন্য।

একজন টিপ্পনি কাটলো, স্বদেশী ছেড়ে এবার স্বদেশ।

আমার কাছে ও দুই ভিন্ন নয়। দেখো এই দিনাজশাহী শহরে পয়লা নম্বরের দুইজন স্বদেশী অবিনাশবাবু আর যজ্ঞেশবাবু। এখন এদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ ঘটে কার না ইচ্ছা হয়। তাই ভাঙচি দিতে হল নাটোরকে, জানি যে এগিয়ে আসবে শচীন। হাঁ, ছেলের মতো ছেলে বটে।

আর সুশীলের চাবুক খাওয়াটাও বোধ করি আর এক নম্বর স্বদেশী?

যাক জিজ্ঞাসা করেছ ভালোই হল, ভাবছিলাম আমিই বলব। ঐ চাবুক মারবার মূল নীতিটা হচ্ছে সরকারকে বাধ্য করতে হবে জনসাধারণকে উত্ত্যক্ত করে তুলতে তবে, না তারা ক্ষেপে উঠবে। সরকারের সঙ্গে আপোস হয়ে গেল ভালোই নইলে ক্রোজেটকে বুদ্ধি দিতাম স্বদেশীওয়ালাদের ঘরে রাতের বেলায় আগুন দিতে। তবে না লোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।

ভবানীগোবিন্দবাবু নিরীহ বৃদ্ধ, এতক্ষণ নীরবে শুনছিলেন, এবারে নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন, ওহে হরিপদ, তোমার স্বদেশী তালিকায় আমার নামটা আছে কি?

কি যে বলছেন স্যার, আপনি জীবনে একখানা বঙ্গলক্ষ্মী কিনলেন না।

হ্যাঁ সেটা মনে রেখো, আর নূতন ম্যাজিস্ট্রেটকে বোলো, রাতের বেলায় আমার বাড়ির দিকে যেন দৃষ্টি না দেয়।

স্যার, আপনার বাড়িতে খড়ের ঘর কোথায়?

সেটাও তদন্ত করেছ দেখছি। তা নূতন প্রভুপাদের নামটা কি?

মিঃ ডান্ডার্স।

বাবা! নামেই ডাণ্ডা চালায়।

হরিপদ একতরফা বক্তৃতা করে গলা শুকিয়ে ফেলেছিল, গলার আর দোষ কি, এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতায় অগস্ত্যের গলা শুকিয়ে যায়—হাঁক দিল, বাবা পীতাম্বর, এক গেলাস বেশ ঠাণ্ডা জল দে দেখি।

পীতাম্বর আড্ডার খানসামা, বেতনটা অবশ্য লোন আফিস থেকে পায়, এখানে বাবুদের কাছে বকশিশে যা জোটে।

বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে টেলিগ্রাম আসবামাত্র শহর আনন্দমুখর হয়ে উঠল, সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে বাতি জ্বালানো হল, মাঠে ময়দানে সভাসমিতিতে বক্তৃতা চলল, আর গান তো আছেই, বন্দেমাতরম্, সার্থক জনম আমার এবং বঙ্গ আমার জননী আমার। আর এদিকে লোন আফিসের আড্ডার দ্বার অবারিত হয়ে গেল, সেই সুযোগে বহু কালের একঘরে হরিপদ প্রবেশ করে সবচেয়ে ভালো চেয়ারখানি দখল করে উপবিষ্ট হল। দুর্জনের সর্বত্র প্রশস্ত আসন।

হঠাৎ সকলে বিস্মিত আনন্দে কলরব করে উঠল, একি, একি! এ যে শুধু বঙ্গভঙ্গ রদ নয়, একেবারে মনোভঙ্গ রদ। সকলের বিস্ময় ও আনন্দ থামতে চায় না।

সত্যেন ও সৌরীন ঘরে প্রবেশ করেছে। দুজনেই সমবয়সী ডাক্তার, বরাবর একসঙ্গে পড়েছে।

সত্যেন ডাক্তার এক টাইফয়েড রুগীকে সারিয়ে তুলল; তখনকার দিনে টাইফয়েডের চিকিৎসা ছিল না, অসুখ হলে সকলে ধরে নিত রুগী মারা যাবে। রুগীটি সারাবার ফলে সত্যেন ডাক্তারের পসার অসম্ভব বেড়ে গেল। এদিকে সৌরীন ডাক্তার বলে বেড়াতে লাগলো পেটের ব্যারামের রুগীকে টাইফয়েড বলে চালিয়ে দিয়ে বেশ খেল দেখালো সত্যেন, লোকটা একেবারে ফ্রড। এই কথা কানে যেতে দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গেল, অবশেষে ব্যবসায়িক রেষারেষি পারিবারিক রেষারেষিতে পরিণত হল, দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ও খানাপিনা বন্ধ হয়ে গেল। সে আজ বছর তিনেকের কথা। আজ হঠাৎ দুজনকে একত্র দেখে তাই সকলের আনন্দ ও বিস্ময়, আনন্দের চেয়ে বিস্ময় বেশি।

সত্যেন ডাক্তার হাসতে হাসতে বলল, আর বঙ্গভঙ্গই যখন রদ হয়ে গেল মনোভঙ্গ বজায় রেখে কি লাভ? কি বলো সৌরীন?

হাঁ সরকারী নীতির অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

তারাচরণ শুধালো, তা এত দেরি কেন, আমরা তো উঠবো ভাবছিলাম।

সত্যেন বলল, দেরি কি সাধে, প্রভুপাদ ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

কি আবার, টাইফয়েডের চিকিৎসা নাকি?

সকলে হেসে উঠল।

কি দেখলে?

দেখলাম ডাভার্স সাহেবের চণ্ডতা নামের মধ্যেই, লোকটা ঠাণ্ডা, ক্রোজেটের মতো নিরেট নয়।

আর কি দেখলে?

দেখলাম ঘরভর্তি লোক, কিন্তু মজা এই যে রায়বাহাদুর রায়সাহেব প্রভৃতি দরবারীদের কেউ নেই, সবাই নামকাটা সেপাই—

অর্থাৎ নামকাটার দল আছে, কানকাটার দল অনুপস্থিত।

আবার সকলে হেসে উঠল।

তা হঠাৎ অসময়ে এদের ডাক কেন?

তারাচরণবাবু পাকা উকীলের মতো একটি বাক্যের মধ্যে দুটি প্রশ্ন ভরে দিলেন, বেশ তুমিও পাকা ডাক্তারের মতো দুই দফা ওষুধ দাও।

সত্যেন ও সৌরীন দুজনেই তারাচরণের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট—তাই তুমি বলে থাকেন।

দেখুন ইংরেজ হিসেবী জাত, জানে কার কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে। এই কয় বছরের আন্দোলনে বুঝেছে পুরনো দরবারীরা একেবারে অচল। তাই এখন নূতন দরবারীর সন্ধান চলছে।

তা হরিপদ তোমার ডাক পড়লো না কেন?

এতক্ষণ তবে কী বোঝালাম। সাহেবরা এতদিনে বুঝেছে আমি ছদ্মবেশী স্বদেশী, জো হুকুমের অভিনয় করলেও আসলে NO- হুকুম।

তবে তো তোমার আগে ডাক পড়া উচিত ছিল।

তারাচরণ ভায়া, ঐ তো শুনলেন ওরা হিসেবী জাত, ওরা জানে জো হুকুমের পোশাক বদলাবার জন্যে কিছুদিন সময় দেওয়া দরকার।

হরিপদ ভাঙে তবু মচকায় না।

এ সব তো বুঝলাম কিন্তু আসল কথা কী; হঠাৎ ডাক পড়লো কেন?

ডাভার্স জানতে চাইলেন যেদিন ভারতসম্রাট কলকাতায় পদার্পণ করবেন, দিনাজশাহী শহরে একটি শোভাযাত্রা করবার ইচ্ছা তাঁর, এ বিষয়ে উপস্থিত ভদ্রগণের মনোভাব কি? তাঁরা কি উদাসীন থাকবেন, না সমর্থন করবেন, না বাধা দেবেন। প্রথমেই তিনি তাকালেন অবিনাশবাবুর দিকে।

সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল, অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু কী ভাবে এলেন?

জাদুকর যেভাবে টুপির মধ্যে থেকে খরগোশ বের করে সেই ভাবে। পরে তাঁর

কাছে শুনলাম যে পরশু সন্ধ্যায় পুলিশ হঠাৎ মোটরগাড়ি নিয়ে আরামবাগে উপস্থিত। সেখান থেকে একেবারে কলকাতায়, কলকাতা থেকে আজ দুপুরে নিজ বাড়িতে পৌছে দিয়েছে।

বাবা একেই বলে গরজ।

ভবানীগোবিন্দবাবু নীরবে সমস্ত শুনছিলেন, কথাবার্তা বেশি বলেন না, যখন বলেন একেবারে বৃদ্ধ চাণক্যের মতো। বলে উঠলেন, বাবা দুশো বছর গোলামি করেও ইংরেজ জাতটাকে বুঝতে পারলাম না। এরা ধীরতায় যেমন স্বভাবসিদ্ধ ত্বরাতেও তেমনি, একসঙ্গে ওরা হস্তী ও অশ্ব।

তা অবিনাশবাবু কী বললেন?

বললেন আমরা তো কখনও সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের অভাব প্রদর্শন করিনি, কংগ্রেসও করেনি। আমরা শোভাযাত্রায় যোগদান করবো এই বলে তিনি তাকালেন যজ্ঞেশবাবুর দিকে। যজ্ঞেশবাবু বললেন অবিনাশবাবু আমাদের সকলের মনের কথাই প্রকাশ করেছেন। সাহেব বেজায় ঘুঘু, কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চান না, তখন তিনি তাকালেন শচীন অতুল ভূপতির দিকে।

আড্ডার মুখপাত্র আজ তারাচরণবাবু, সকলের হয়ে প্রশ্ন করলেন, ওরা আবার এলো কোত্থেকে?

যাদুকরের টুপির ভিতর থেকে। দেশের সমস্ত আসামীকে খালাস করে দেওয়া হয়েছে। এমন কী আমাদের মতো চুনোপুঁটির দিকেও তাকাতে ভুললেন না। আমরা ঠোঁট ফাঁক না করে যতটা হাসা সম্ভব হেসে সজোরে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালাম। কেমন সৌরীন, সব ঠিক বলছি তো?

সৌরীন স্বল্পভাষী, বলল, বলছ তো ঠিক কিন্তু এঁরা বিশ্বাস করছেন কি না সন্দেহ, বিশেষ হরিপদবাবু।

হরিপদ একগাল হেসে বলল, বিশ্বাস! আমার সঙ্গে সাহেব আগেই পরামর্শ সেরে নিয়েছেন। সকাল বেলাতে ডাকিয়ে নিয়ে সমস্ত কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন, ডাট তুমি কী বলো। সাহেব আবার দত্তকে বলেন ডাট।

বীরেন চৌধুরী বলল, ও কী চললে কোথায় হরিপদ!

সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, অবিনাশবাবু খালাস পেয়ে ফিরে এসেছেন শুনে কি চুপ করে বসে থাকতে পারি। সকলের আগে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে তোমাদের উপরে আজ এক হাত নেবো।

গ্রেপ্তার হাওয়ার সময় তো এক হাত নিয়েছিলে, এবারে আবার কোন্ হাত?

প্রশ্নটা তার কানে ঢুকলো না, আগেই সে গৃহত্যাগ করেছে।

হায় লজ্জা! পণ্ডিতেরা বলেন তোমাকে পরিত্যাগ করলে বিশ্ববিজয় করা সম্ভব, কিন্তু তোমাকে অবলম্বন করলেও কম শক্তিশালী হওয়া যায় না।

সাতাশ

অনেকদিন পরে আজ বেয়ানের মুখে হাসি দেখা দিয়েছে।

কি বলো দিদি, হাসবো না, অনেকদিন পরে জামাই এসেছে।

সেই সঙ্গে জামাইয়ের শ্বশুরের কথাটাও বলো।

সে বুড়ো মানুষটা তো আসবেই জানতাম।

কই আমরা তো টের পাইনি, আর চিঠিপত্র যা আসতো সমস্ত তো চন্দ্রগ্রহণ লাগা, বারো আনাই কালির ছাপ, তবে কি মনে মনে টেলিগ্রাম চলতো।

বুড়োবুড়ীদের আবার মন তার আবার মনের টেলিগ্রাম।

গলা খাটো করো দিদি, ও ঘরে মেয়েরা আছে।

নিস্তারিণী একবার এ দিক ও দিক তাকিয়ে বলল, না, কেউ নেই।

কিন্তু ছিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে ছিল রুক্মিণী, সে বুঝলো এবার ধরা পড়বার সম্ভাবনা, শাশুড়ী ও মায়ের উদ্দেশ্যে একবার জিভ বের করে মুখ ভেঙচে নিঃশব্দে পালিয়ে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। বিন্দুবাসিনীর চিঠিগুলো চন্দ্রগ্রহণ লাগা কি না জানি না, তবে রুক্মিণীর মুখ আজ গ্রহণের ছায়া অপসারিত চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল। বালিশে মুখ গুঁজে এতক্ষণের রুদ্ধহাসির উৎস খুলে দিল। জোরে হাসবার উপায় নেই, চাপা হাসিতে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। এমন সময়ে হঠাৎ এসে পড়লো মলিনা।

ওকী বউদি, আজকের দিনে কি কাঁদতে হয়।

মলিনার ভুল বোঝায় তার হাসির দম আরো বেড়ে উঠলো, বালিশে মুখ চেপে সে আরও ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। মলিনা ভাবলো নিশ্চয় দাদা বকেছে। তাই সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে তার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, ছিঃ ভাই বউদি, দাদা যদি দু-কথা বলেই থাকে তাই বলে আজকের শুভদিনে কি চোখের জল ফেলতে আছে, দাদা এলেন, তাঐমশায় এলেন, আজ কি চোখের জল ফেলবার দিন—এই বলে রুক্মিণীর মুখ ঘোরাতে সে চেষ্টা করলো। রুক্মিণী দেখলো মুখ ঘোরালেই ধরা পড়বে তাই আরো জোরে বালিশ আঁকড়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো।

মা দেখো এসে বউদি কাঁদছে।

কাঁদবার কী হলো বলে শাশুড়ী ও মা দুজনে ঘরে ঢুকলো।

ছিঃ মা, আজকে কাঁদতে আছে? দেখো তো কতদিন পরে তোমার বাবা ফিরলেন, আবার শচীনও এসেছে।

বিন্দুবাসিনী কি বলবেন ভেবে না পেয়ে ধমকের সুরে বললেন, মেয়ের আজ কান্নার দিন হলো।

রুক্মিণী দেখলো এখন কিছু না করলে ধরা পড়তে আর দেরী নেই, তখন সে হাসির আবেগের মধ্যে যতটা সম্ভব কান্নার সুর এনে বলল, আজ কিছুতেই মায়ের বাড়ি যাওয়া হবে না, না কিছুতেই যেতে দেব না।

বউয়ের কথায় একগাল হেসে নিস্তারিণী বললেন, দেখো বেয়ান ঐ একরত্তি মেয়ের

যে বুদ্ধিটুকু আছে তোমার ঘটে তাও নেই। এখন শুনলে তো নাও আর কেঁদো না বউমা, আজ কিছুতেই তোমার মাকে যেতে দেবো না।

বাঃ রে, নিজের বাড়ি যাবো না, তবে কি তোর বাড়িতে চিরকাল থাকবো।

হিতে বিপরীত হল। ঐ নিজের ও তোর শব্দ দুটো ছিটে গুলির মতো হাসির উপরে আচমকা এসে পড়াতে এবারে সত্যি জল এলো চোখে। তবে সেটা আর তার নিজের বাড়ি নয়! আজন্মের বাড়ি এখন তার বাপের বাড়ি নয়। বেশিক্ষণ আর মুখ গুঁজে পড়ে থাকা সম্ভব নয় বুঝে শাশুড়ীর কথায় যেন সান্ত্বনা পেয়েছে এই ভাবে মুখে আঁচল টেনে দ্রুত চলে গেল পাশের ঘরে।

মলিনা যাও মা তোমার বউদিকে বুঝিয়ে একটু ঠাণ্ডা করো।

মলিনা পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো রুক্মিণী জানলার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সেকি বউদি হাসছ?

গোড়া থেকেই তো হাসছিলাম, তুমিই তো গোলমাল করে সকলকে ডেকে এনে এক কাণ্ড বাধালে।

তবে যে কাঁদতে কাঁদতে বললে, মাকে আজ কিছুতেই যেতে দেবো না।

অভিনয়।

বিস্মিত মলিনা বলল, অভিনয়! কিন্তু কোন্‌টা অভিনয় ভাই বউদি, কান্নাটা না হাসিটা?

দুটোয় না মিললে আর অভিনয় কিসের।

তুমি এতও জানো বউদি!

সব মেয়েই জানে, তারা যে জন্ম-অভিনেত্রী।

কই আমি তো অভিনয় করছি না।

অভিনেতারও নেপথ্য আছে—এখন তুমি নেপথ্যে আছ ভাই।

এমন সময়ে বাইরে চটির শব্দ উঠল, কই, সব গেলে কোথায়?

এই যে এসে দেখো, তোমার বউমা কেঁদে অনর্থ বাধিয়েছে, তার মাকে কিছুতেই আজ বাড়িতে যেতে দেবে না।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, আহা যেতে দিচ্ছে কে? আমি এতক্ষণ ধরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বেয়াইকে রাজি করে এলাম আজ কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। কই চলো দেখি, কোথায় কাঁদছে।

এই বলে তিনজনে পাশের ঘরের দিকে রওনা হল।

রুক্মিণী দেখল আর রক্ষা নেই, চোখের ইঙ্গিত করলো মলিনাকে যে আর নেপথ্যে থাকা চলবে না, এ বারে এসো দুই জনে অভিনয় শুরু করা যাক।

যজ্ঞেশবাবুরা ঘরে ঢুকে দেখলেন রুক্মিণী মুখে আঁচল দিয়ে জানলার শিকে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর মলিনা বলছে, না বউদি এ তোমার অন্যায় আবদার , মাঐমা আজ কিছুতেই ও বাড়িতে যেতে পারবেন না, তাওইমশায় এলেন দুদিন এখানে থাকুন, তারপরে যাবেন। মা নিষেধ করছেন বাবা নিষেধ করছেন আর তুমি নিজের মেয়ে হয়ে কিনা বলছ আজই যেতে হবে। এ তোমার অন্যায়।

এটুকুর জন্য রুক্মিণী প্রস্তুত ছিল না, বুঝলো আর একজন জন্ম-অভিনেতা তার উপরে এক হাত নিয়েছে।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, অবশ্য তুমি বললে বলতে পারো, এ তোমার বাড়ি বটে কিন্তু মনে রেখো এ দুটো বুড়োবুড়িরও কিছু অধিকার আছে এ বাড়িটার উপরে।

এবারে বিন্দুবাসিনীর পালা—বললেন, বেয়াই আপনারা জীবিত থাকতে এ বাড়ি রুক্মিণীর? আমি বিয়ে হয়ে এসে থাকবার জন্যে একখানি ঘর মাত্র পেয়েছিলাম, শ্বশুর শাশুড়ী কাশী না পাওয়া পর্যন্ত সে বাড়ি আমার একথা মুখে উচ্চারণ দূরে থাক মনে ভাবতেও সাহস হতো না।

বেয়ান সে কাল এখন আর নেই, এখন নতুন যুগ।

তাই বলে কি বাপ মা বেঁচে থাকতে বউয়ের বাড়ি হবে—উক্তিটা বিন্দুবাসিনীর মুখের, নিস্তারিণীর মনের।

শ্বশুরের কথা শুনে রুক্মিণী একবার মাথাটা নাড়লো, ভাবটা যার যেমন ইচ্ছা ভেবে নিক।

যজ্ঞেশবাবু বললেন, তোমরা মিছে দোষ দিচ্ছ বউমাকে, ঐ তো রাজি হয়েছেন।

বিন্দুবাসিনী বললেন, ওতে হবে না, মুখে বলুক।

মেয়ের নীরবতা দেখে তিনি বললেন, মেয়ের আস্পর্ধা দেখো। তার পরে একটু জোর দিয়ে বললেন, আমার বেয়াই বাড়ি, আমি যতদিন খুশি থাকব, ও যাও বলবার কে?

নিস্তারিণী কার উপরে দোষ চাপাবেন স্থির করতে না পেরে সকল দায়ের দায়ী কলিকালের উপরে গিয়ে পড়লেন—হায় কলিকাল!

প্রহসন যখন আরও জমে উঠবার মুখে শচীন এসে ঘরে প্রবেশ করল, তাই বলো তোমরা সবাই এখানে। আমি বাইরে বাবাকে খুঁজে না পেয়ে ভিতরে এসে দেখি মাও নাই, ভাবলাম সব গেল কোথায়। তা এখানে মামলাটা কী?

মলিনা আগ বাড়িয়ে বলল, বউদি বলছেন আজ কিছুতেই মাওইমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে দেবেন না।

নিস্তারিণী রেগে উঠে বললেন, চুপ কর ছুঁড়ি, এখন বউদিকে বাঁচানোর জন্যে কথা ঘুরিয়ে বলিস নে।

বেশ তোমরা যা জানো বলো।

শোনো বাবা, বউমা আব্দার ধরেছে, এমন কী কান্নাকাটি করছে যে তার মাকে আজই তাঁর বাড়িতে চলে যেতে হবে।

এ কথা বলবার তার কী অধিকার। বাবা, আপনি বাইরে যান, লোক বসে আছে। যজ্ঞেশবাবু চলে গেলে শচীন আরম্ভ করলো, মা, তোমরা আস্কারা দিয়েই ওর মাথাটা খেলে। আমি ক'মাস ছিলাম না, এর মধ্যে এতটা বাড় হয়েছে ভাবতে পারিনি। মা তোমরা দুজনে যাও, আমি দেখছি।

যাচ্ছি কিন্তু শাসন করিস নে, বউ বড় ভালো মেয়ে।

যাও ভয় নেই, শাসন করবো না।

মলিনা বললো, শুধু একটু শান্তিপূর্ণ পিকেটিঙ করবো। কি আমি যাবো না থাকবো?

না তুই যাস নে, তুইও ওর মাথা খাওয়ার একজন।

একটু ভুল করলে দাদা, ওর মাথা খাওয়ার লোকটাকে সদাশয় সরকার বাহাদুর এতদিন আটকে রেখে ছিল বলে মাথাটা আস্ত আছে, এই বারে যাবে।

এত কথা শিখলি কোথায় রে, মলি!

তোমাদের স্বদেশী কাগজগুলো পড়ে, কি জ্বালাময়ী ভাষা, পড়লে শীত কালেও গা ঘেমে ওঠে।

চুপ কর্, দেখলি সরকার জব্দ হয়ে গেল।

এবারে এসেছ বউকে জব্দ করতে, সেটা তত সহজ হবে না দাদা।

এতক্ষণ রুক্মিণী মনে মনে ভাবছিল এবারে প্রাণনাথকে একটু খেলানো যাক।

শচীন জিজ্ঞাসা করলো, মাকে তুমি চলে যেতে বলেছিলে?

রুক্মিণী নীরব।

কী, উত্তর দাও? এ কথা বলবার অধিকার তোমাকে কে দিল?

অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার নিতে হয়।

বেশ তো কথা বলতে শিখেছ।

তোমরা দেশের লোককে শেখাচ্ছ আর ঘরের লোক শিখবে না।

মাকে চলে যেতে বলেছিলে?

না দাদা, বউদি বলেছিল কিছুতেই মাকে যেতে দেবে না।

ধমক দিয়ে উঠে শচীন বলল, তুই চুপ কর্।

আমি তো সাক্ষী, জানো সাক্ষীকে ধমক দেওয়া অপরাধ।

তোকে ওকালতি করতে হবে না।

বাঃ রে, একবার বলছ সাক্ষী, একবার বলছো উকীল।

যাকে জিজ্ঞাসা করছি সে উত্তর দিক। অমন করে মাথা নাড়লে কি বুঝব।

যার যেমন খুশি।

আমার ইচ্ছা মা আজই যাবেন, তার সঙ্গে তুমিও।

আর সেই সঙ্গে তুমিও। দাদা বাড়িটা বেশ নিরিবিলি।

আবার!

আহা দাদা অমন করে বউদিকে বোকো না, দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

মুখ ফেরাও।

আমার মুখ ফেরাবো কি ফেরাবো না সে আমার ইচ্ছা।

না, মুখ তোমার নয়।

তবে কার?

খানিকটা আমার।

দাদা এবারে চললাম, মুখের ভাগাভাগির কথা উঠেছে আর আমার থাকা চলে না। ওতে ভাগাভাগির অসুবিধা হতে পারে। বলে মলি যেতে উদ্যত হলে রুক্মিণী তার আঁচল চেপে ধরলো।

দেখো দাদা, আমার অপরাধ নেই, বউদি আটকাচ্ছে।

এত একগুঁয়েমি শিখলে কোথায়?

বাড়ির আবহাওয়ায়।

আমি তো ছিলাম না।

তবে দেশের লোকের কাছ থেকে।

দেশের লোকেও একগুঁয়ে নয়।

তবে স্বদেশীওয়ালাদের কাছ থেকে।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

তার মানে? মুখ একটা মাত্র, কথা ছোট বড় নানারকম, একমুখে বলা ছাড়া উপায় কি।

কাঁদতে কাঁদতে এমন গুছিয়ে কথা বলতে কখনো শুনিনি তো।

এবারে শোনো।

শুনবো না দেখবো—বলে শচীন জোর করে তার মুখ ফিরিয়ে নিল। কান্নার চিহ্ন মাত্র নেই, সমস্ত মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল।

ব্যাপারখানা কী?

একটু পুতুল খেলা করলাম।

পুতুল কে?

মেয়েদের হাতে সবাই পুতুল, স্বামী সবচেয়ে বড়।

হায় বঙ্কিমচন্দ্র এর পরেও কি তুমি বলতে চাও স্ত্রীলোকের বুদ্ধি নারকোলের মালার মতো—আধখানা বই দেখলাম না। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অখণ্ড মণ্ডলাকারং, যাকে খণ্ড করা অসম্ভব।

এমন সময়ে সুশীলের প্রবেশ।

কিরে, তুই কোত্থেকে?

কলকাতার বাসা থেকে।

হঠাৎ?

বউদিকে দিন দুই দেখিনি, মনটা কেমন করছিল।

হাতে ওখানা কী কাগজ?

হিতভাষীর সান্ধ্য সংস্করণ।

জরুরি খবর আছে কিছু?

পড়ে দেখো—বলে কাগজখানা দাদার হাতে দিল।

শচীন জোরে জোরে পড়লো—“দিনদুপুরে গোলদীঘির মধ্যে পুলিশের হেড কনস্টেবল হরিপদ দেব পুলিশের গুলিতে নিহত—আততায়ীরা পলাতক, অনুসন্ধান চলিতেছে।”.... একটু চিন্তা করে বলল, তাইতো আবার গোলাগুলি চলল, এতেই স্বদেশী নষ্ট হবে দেখছি।

রুক্মিণী বললো, তবে আর কি, সবাই মিলে শান্তিপূর্ণ পিকেটিঙ করো।

সে কথায় কর্ণপাত না করে শচীন বললো, বাবাকে বলেছিস?

তাঁর সঙ্গে দেখাই হয় নি।

চল খবরটা দেওয়া যাক। গুরুতর ব্যাপার, এর পরিণাম কি দাঁড়ায় বলা যায় না।

চলো।

সেখানে অবিনাশবাবুও আছেন।

রুক্মিণী তার জামার আস্তিন টেনে ধরে বলল, অবিনাশবাবু নয়, শ্বশুর মশাই।

এই তরল রহস্যে যোগ দেওয়ার মতো মনের অবস্থা শচীনের ছিল না, সুশীলকে নিয়ে সে প্রস্থান করলো।

আঠাশ

অনেক রাতে বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই মা বলে উঠলেন, হাঁ রে সুশীল, এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? শচীনরা বসে থেকে থেকে অবশেষে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো। নে খেতে বস্।

হাঁ মা দেরি হয়ে গিয়েছে সত্যি। অনেক দিন পরে এলাম, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল—বলে সে খেতে বসলো এবং নামমাত্র খেয়ে উঠে পড়লো।

ও কি খাওয়ার ছিরি, সবই যে পড়ে রইলো।

দুপুরবেলা অনেক খেয়ে ফেলেছি আর খেতেও দেরি হয়ে গিয়েছিল, এ বেলা তেমন খিদে পায়নি।

মা মনে মনে ভাবলো এ কলকাতার জলের গুণ, তার উপরে যত্ন করে খাওয়াবার লোক নেই, নাড়ী মরে গিয়েছে।

সুশীল গিয়ে তার ঘরে শুয়ে পড়ল কিন্তু ঘুম এলো না। সন্ধ্যারাতের সমস্ত ঘটনা তার মনে ছায়াছবির মতো আনাগোনা করতে লাগলো।

সিদ্ধেশ্বরীতলায় যখন সে পৌঁছলো সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এসেছে, কাউকে না দেখতে পেয়ে মন্দিরের পৈঠার উপরে বসলো। এই ভাবে এখানে অপেক্ষা করবার জন্যে কলকাতায় এক সাঙ্কেতিক চিঠি পেয়েছিল সে। সেই জন্যেই তার অকস্মাৎ এখানে চলে আসা। দূরে কোথায় শিয়াল ডাকছে, কাছেই উঠছে ঝিঁঝির একটানা সুর, মাথার উপরে গাছের ডালে ভগ্ননিদ্র পাখীর পাখা ঝটপটানি আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে জোনাকির অনিশ্চিত আলো। কতক দেখছে কতক শুনছে, কিন্তু সে দিকে তার মন নেই, মনে ভাবছে হঠাৎ তার উপরে কেন এই আদেশ। এমন সময়ে তার চোখে পড়লো। এই কি আহ্বানকর্তা? কী তার আদেশ? কে এই ব্যক্তি? তার মনে পড়লো দীক্ষাদিনের নির্দেশ, প্রশ্ন করবার অধিকার তার নেই, উত্তর দেওয়ার মাত্র অধিকারী সে।

সুশীল শুনতে পেলো—

১০৪ নম্বর, তোমার প্রতি আমাদের চোখ আছে।

তার মনে পড়লো দীক্ষার দিনে এই সাঙ্কেতিক নম্বর তাকে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় ঘরের মধ্যে জানলার কাছে যে পত্রখণ্ড পেয়েছিল তাতেই ঐ সংখ্যাটা ছিল আর নির্দেশ ছিল একটিমাত্র ছত্রে 'শনিবারে সন্ধ্যাবেলা সিদ্ধেশ্বরীতলায়'। সেই নির্দেশ অনুসারেই তার আকস্মিক আবির্ভাব দিনাজশাহী শহরে।

শ্রমজীবী সমবায়ে তোমার যাতায়াত আরও নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। গত সপ্তাহে দুই দিন যাওনি, কেন?

ময়দানে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম।

দেশ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদের অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত। শপথবাক্য মনে রেখো।

ধাপার মাঠে গত এক মাসের মধ্যে সাত দিন অনুপস্থিত ছিলে। কেন?

শরীর সুস্থ ছিল না, পড়াশোনার চাপ।

শরীর সুস্থ রাখা অনুশীলনের প্রথম সূত্র। আর পরীক্ষা পাস করে ডেপুটি হওয়ার জন্যে কলকাতায় যাওনি।

অপরাধী নীরবে শুনলো।

গত মঙ্গলবার ১৮ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের তেতালায় কেন গিয়েছিলে?

কলেজের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

সে বন্ধু নয়, আর যাবে না। গতকাল বিকালে ফেভারিট কেবিনে কেন ঢুকেছিলে?

চা খেতে, কলেজ থেকে আসবার পথে পড়ে, বাসায় সে সময়ে চা করে দেবার লোক থাকে না।

না থাকলে খাবে না, প্রয়োজন হলে অন্য দোকানে খাবে। কবে কলকাতায় ফিরবে?

দাদা বউদি এই সপ্তাহের মধ্যেই যাবেন শুনছি, তাঁদের সঙ্গে।

বেশ তাই হবে, আর দেরি করবে না।

যে আদেশ।

তোমার পিস্তলের হাতসই আছে রিপোর্ট পেয়েছি।

একবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

উত্তম। এবারে তোমার উপরে গুরুতর আদেশ আসবে।

কী আদেশ?

প্রশ্ন করবার অধিকার নেই মনে রেখো। বোমায় কাজ না হয় পিস্তল চালাবে।

কিন্তু পিস্তল?

আবার প্রশ্ন! যথাসময়ে পাবে। কাজ হয়ে গেলে দীঘির মধ্যে ফেলে দেবে।

গোলদীঘির জলে?

প্রশ্ন নয়। যথা সময়ে স্থানের নির্দেশ পাবে। এক জায়গায় অল্পদিনের ব্যবধানে এ কাজ চলে না।

সুশীল বুঝলো হরিপদ দেব নিহত তাদেরই দলের কারও হাতে।

শনিবার বিকালে সাড়ে পাঁচটার সময়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরে সুরভি ভাণ্ডারের কাছে বিরাশি নম্বরের জন্য অপেক্ষা করবে।

বিরাশি নম্বরকে চিনি না।

সে চিনে নেবে তোমাকে। কোন কথা বলবে না তার সঙ্গে—তার হাতে পত্রে নির্দেশ পাবে।

মাপ করবেন, কোন্ শনিবারে?

বলছিলাম, প্রশ্ন করবার প্রয়োজন ছিল না, যদি নিশ্চিত করে না বলতাম তবে প্রত্যেক শনিবারে অপেক্ষা করতে! আগামী দ্বিতীয় মাসের শেষ শনিবারে। মনে রেখো। আর মনে রেখো তোমার উপরে আমাদের যেমন চোখ আছে তেমনি আছে পুলিশের চোখ। এখানে যে এসেছ কেউ জানে?

না।

উত্তম। এখন যাও।

ছায়ামূর্তি ছায়াবাজির মতো ঘনতর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সুশীল ফিরতে ফিরতে ভাবছিল কে এই লোকটা? দীক্ষাদিনে যে দুজনের কণ্ঠস্বর শুনেছিল এ কণ্ঠ তাদের কারো নয়। তবে লোকটা যেই হোক সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জানে দেখছি।

বিছানায় শুলে পর এই সব স্মৃতি তার মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল। ভাবছিল এ যে সরকারী গোয়েন্দার উপরে যায়, এত খোঁজ খবর রাখে কি করে? তবে কী সর্বদা তার পিছে ছায়ার মতো কেউ ঘোরে? ১৮ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটে একবার মাত্র গিয়েছিল, ফেভারিট কেবিনে দিন দুই মাত্র, তবু অজানা নেই। আর ১৮ নম্বরের রমণী রিপন কলেজে তার সহপাঠী। সে বন্ধু নয় মানে কি? তবে কি সরকারের গোয়েন্দাগিরি করে? না, তা হতে পারে না, বিদেশী মাল বয়কট করতে গিয়ে এক মাস জেল খেটে এসেছে। তবে এমন হতে পারে যে অন্য কোন গুপ্ত সমিতির দলভুক্ত। শুনেছিল অনেক গুপ্ত সমিতি আছে যাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। বুঝতে পারলো না সকলেরই যখন উদ্দেশ্য এক তবে রেষারেষি ভেদাভেদ কেন?

হঠাৎ তার মন বিদ্রোহ করে উঠল, কাদের জুলুমের নাগপাশে নিজেকে সে বদ্ধ করে ফেলেছে। তবে কি সে হঠকারিতা করে দীক্ষা নিয়ে ভুল করে ফেলেছে? অবিনাশবাবুর মতো, দাদার পথ তো তাদের মত ও পথের সঙ্গে মেলে না। তাঁদের মধ্যে তো ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই—অথচ ত্যাগ স্বীকার তাঁদের তো কম নয়। ভুল ভুল ভুল। এক নাগপাশের বদলে আর এক নাগপাশ বরণ করেছে সে। সরকারী নাগপাশ বরঞ্চ ঢিলা, এ যে একেবারে দুর্জয় ফাঁস। এক অত্যাচারের বদলে আর এক অত্যাচার। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়লো, এরাও তো চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, কতজন ফাঁসি গিয়েছে, দ্বীপান্তরিত হয়েছে। মনে পড়লো ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, কানাই দত্তর কথা, মনে পড়লো বারীন উল্লাস উপেন বাঁড়ুজ্জের কথা, সর্বোপরি মনে পড়লো আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের কথা, মনে পড়লো সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাম্ মাতরম্। না, না, না, ভুল করেনি, ভুল করেনি। সে মনে মনে জপ করতে লাগলো, "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" এই মন্ত্র জপ করতে করতে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার চোখ দিয়ে। তার পরে কখন ঘুমিয়ে পড়লো জানে না।

দেখো শচীন, এবারে আরামবাগে কিছুদিন বাস করে একটা উপকার হয়েছে।

শচীন হেসে বলল, আজ্ঞে তা তো দেখতেই পাচ্ছি, ম্যালেরিয়ায় শরীর কৃশতর হয়েছে।

অবিনাশবাবু একবার শরীরটার দিকে তাকিয়ে হেসে উত্তর দিলেন, তা একটু হয়েছে বইকি। প্রসঙ্গটা যখন তুললে আগে সেটাই হয়ে যাক। স্থানটা বিশেষ উপভোগ্য। পথঘাট নেই বললেই হয় আর তার পরে অন্তত তিনটা নদী পার না হলে পৌঁছানো যায় না। যতদূর দুর্গম হতে পারে। অবশ্য ম্যালেরিয়া মশার পক্ষে নয়। ওটা একটা দ্বীপ না হয়েও দ্বীপান্তরের সমস্ত গুণ আছে। লোকজন বিরল, যারা আছে মাসের মধ্যে দশ-বারোদিন জ্বরের জন্য উপবাস করতে বাধ্য হয়, কাজেই খাদ্যদ্রব্য সুলভ; তবে অধিকাংশই পাওয়া যায় না। গোরু আছে, দুধ সুলভ হওয়া উচিত ছিল তবে গোরুগুলোও বোধ করি ম্যালেরিয়ার রুগী—তাই কম। সকাল বেলায় মাঠের দিকে গেলে দেখতে পাবে দুটো কঙ্কালসার গোরুতে লাঙল জুতে একটা কঙ্কালসার মানুষ চাষ করছে।

ডাক্তার অবশ্য আছে? শুধোয় শচীন।

আছে তবে ওষুধ নেই, এমন কি ডাক্তারও না থাকার মধ্যে, কেউ তিন দিনের বেশি থাকতে পারে না। ওষুধ নেই বললাম সেটা অত্যুক্তি হল, তিনটা ওষুধ আছে, ফিভার মিক্‌শ্চার, কফ মিক্‌শ্চার আর ক্যাস্টর অয়েল, বঙ্কিমবাবু যাকে কেষ্ট রস বলেছেন—সব কটাই কেষ্ট পাওয়াবার মুক্ত দ্বার।

আর থানা? প্রশ্ন করে শচীন।

বাবা থানা না থাকলে চলে, তবে পুলিশগুলোর সাধ্য নেই চোর ডাকাত ধরে, তবে ভরসার মধ্যে চোরডাকাতগুলোও কঙ্কালসার। ওটা নাকি পেনাল স্টেশন, সরকারের অপ্রীতিভাজন লোকদের ঐ থানায় বদলি করা হয়।

শুধু পুলিশকে নয়, পুলিশের অপ্রীতিভাজন লোকদেরও।

সে তো বাবা আমাকে দেখেই বুঝতে পারছ। আমার ফিরে আসবার হুকুম হলে দারোগা এনছাব আলি একগাল হেসে বলল, মাস্টারবাবু আপনার ভাগ্য ভালো।

কেন বলো তো?

আজ্ঞে আপনার আগে দুইজন স্বদেশীবাবু এসেছিলেন তাঁরা এখানেই দেহ রাখলেন।

সরকার একটু উন্নতির চেষ্টা করে না কেন?

কেন করবে? স্বদেশীওয়ালাদের পাঠানোর জন্যে ওরকম দু'চারটে স্থান দরকার। কোন স্বদেশীবাবু মরলে দায়ী স্বদেশের জল-হাওয়া।

তা বটে।

এ বারে কাজের কথায় আসা যাক। আবম্ভ করেছিলাম ওখানে গিয়ে উপকার হয়েছে বলে।

অবিনাশবাবু ও শচীনে সকালবেলায় আলোচনা চলছিল অবিনাশবাবুর বৈঠকখানায়। দুজনের মধ্যে এখন সম্পর্ক শ্বশুর-জামাতার, তবে আগেকার শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধটাই এখনো প্রবল, কথাবার্তা সেই সুরেই চলে, নূতন সম্পর্কের গাম্ভীর্য প্রবেশ করতে পারেনি।

বুঝলে শচীন, ওখানে গিয়ে নির্জনতা পেয়ে এই প্রথম ধীরভাবে চিন্তা করবার অবকাশ পেলাম। এতদিন কাজের ঘূর্ণিঝড়ের আঁধির মধ্যে থাকায় স্পষ্ট করে দেখতে পাই নে। দেখো সবাই যখন বলছে settled fact-কে unsettled করে আমরা জিতেছি তখন আমার মন আর আগের মতো সায় দিচ্ছে না।

কেন বলুন তো?

জিতেছে ইংরেজ। ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজি ধরনের রাজনীতি করতে গেলেই ঠকতে হয়। ওরা বাংলাদেশকে দু'টুকরো করে বাংলাদেশের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছিল, এখন আমরা বাংলাদেশ ছাড়া আর কিছু যেন ভাবতেই পরি নে।

সেটা কি কাম্য নয়?

অবশ্যই কাম্য, তবে বৃহত্তর স্বার্থের বদলে নয়। ভাঙা বাংলাকে ওদের ভয় নয়, ওদের সবচেয়ে বড় ভয় ভারতীয় ঐক্যকে। প্রথম কংগ্রেস যখন প্রতিষ্ঠিত হয় বড়লাট স্বাগত জানিয়ে ছিল, কিন্তু পরে যখন দেখলো কংগ্রেসের প্রভাবে ভারতের চিরাগত খণ্ডগুলো ধীরে ধীরে ঐক্য অনুভব করছে, ভয় পেয়ে মুসলমান সমাজের এক অংশকে উসকে দিয়ে মুসলিম লীগ গঠন করতে পরামর্শ দিল। সেটা হবে কংগ্রেসের পাল্টা। ওরা এখন কংগ্রেস বলতে সর্বদা বলে হিন্দু কংগ্রেস, ইংরেজের চোখে কংগ্রেস এখন হিন্দু প্রতিষ্ঠান। তার পরে দেখল এ-ও যথেষ্ট নয়, হিন্দুদের মধ্যেও ভেদ ঘটাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ করে দেখলো বাঙালী বাংলাদেশ নিয়ে মেতে উঠেছে, কারও মুখে আর ভারত শব্দ উচ্চারিত হয় না।

কেন স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তো মুসলমানও ছিল?

ছিল তবে অল্প, ক্রমে সংখ্যাটা আরো অল্প হবে। দেখো, আমার বয়স পঞ্চাশের বেশি হল, আমরা মানুষ হয়েছি ভারতবোধের মধ্যে, তখন কাব্যে সংগীতে ভারত বই অন্য কথা ছিল না। এবারে কী দেখলাম? ভাঙা বাংলার ফাটল দিয়ে অতলে তলিয়ে গেল ভারত বোধ, এখনকার সংগীত মানেই সোনার বাংলা, বঙ্গ আমার জননী আমার। ওরা যখন এক শাসনে এক ভাষায় ভারতকে এক করছিল তখন খেয়াল করেনি ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠবো। যা ভয় করেছিল তাই হতে চলল দেখে প্রতিকার চিন্তা করতে লাগলো। প্রথম প্রতিকার মুসলমানকে উসকে দিয়ে মুসলিম লীগ স্থাপন, দ্বিতীয় প্রতিকার বঙ্গভঙ্গ ঘটিয়ে ভাবালু বাঙালীক উসকে দিয়ে তার চোখের সম্মুখ থেকে ভারতবর্ষকে সরিয়ে নিয়ে বঙ্গদেশকে একান্ত করে তোলা।

শচীন জিজ্ঞাসা করলো, এত দেশ থাকতে বাংলাদেশের উপরেই নেকনজর কেন?

আরে এখানেই যে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম পত্তন, এখানেই যে ওদের রাজধানী, এখানেই যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব বেশি, এখানেই ওদের ভারত শাসন পরীক্ষার ল্যাবরেটারি। ওরা দেখলো এ পরীক্ষাতেও সফলকাম হল। অতঃপর দেখো অন্য প্রদেশ গুলোকেও উসকে দেবে, হয়তো প্রাদেশিক শাসন বা ঐরকম কোন নাম দিয়ে একটা কিছু করবে, তখন প্রদেশে প্রদেশে নদীর জলের ভাগ নিয়ে, বনের ফলের ভাগ নিয়ে রেষারেষি বেধে যাবে।

তাহলে আমাদের দিক থেকে এর প্রতিকার কি?

জানি না। তবে এটা জানি ইংরেজি ধরনের রাজনীতি নয়। আর যাই হোক নরমপন্থীদের বক্তৃতায় নয়, ওসব ওদেরই ভাষা, ওদেরই ভাব; আবার গরমপন্থীদের বোমা পিস্তলেও নয়, ওসব ওদেরই আবিষ্কার, ওদেরই নীতি।

তবে কি?

আর যে কি হতে পারে জানি না। তবে সেদিন রবিবাবুর একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম, তাঁর অনবদ্য ভাষা কোথায় পাবো, ভাবটা বলছি। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মধ্যে গুরুর আবির্ভাব আসন্ন হয়ে উঠেছে যিনি আমাদের ভাষায় আমাদের ভাবে ডাক দিয়ে আমাদের মুখ ফিরিয়ে দেবেন ঘরের দিকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দিকে।

এমন সময়ে অন্দরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন বিন্দুবাসিনী, বললেন, একবার ভিতরে এসো।

অবিনাশবাবু বলে উঠলেন, দেখো শচীন—বলতে বলতেই ঘরের দিকে মুখ ফেরাবার ডাক পড়লো, তবে ইনি গুরুজন, গুরুতর।

শচীনের হাসি পেলেও চেপে রাখলো, শাশুড়ী ঠাকরুণ বাচালতা মনে করতে পারেন।

কেন কী হয়েছে?

ও বাড়ি থেকে বেয়ানঠাকরুণ এসেছেন।

এসো না শচীন।

এসো বাবা, তোমাকেও ডাকতে বলেছেন তোমার মা।

ভিতরে গিয়ে অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ এমন জরুরী তাগিদ কেন?

একটা পরামর্শ আছে।

পরামর্শ থাকুক আর নাই থাকুক তবু ভালো যে পায়ের ধুলো পড়েছে।

পায়ে কি বেয়াইমশাই শুধু আমারই ধুলো আছে?

সে কি কথা। এই যে আপনার বেয়ান মাস কয়েক আপনার বাড়িতে কাটিয়ে এলো তাতেও কি অভাব মেটেনি।

সেটা অভাবে।

কার?

আপনি ছিলেন না।

বেশ এ বার স্বভাবে পড়বে, আজ বিকালেই যাবো দুজনে। এখন শুনি এমন কি গুরুতর পরামর্শ যে সকালবেলাতেই দর্শন পেলাম। পরামর্শ খুব দিতে পারবো, সে বয়স হয়েছে সন্দেহ নেই।

কর্তার কাছে মলির বিয়ের এক সম্বন্ধ এসেছে।

এ তো অতি সুখবর।

তিনি বললেন, যাও বেয়াইয়ের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে এসো, ছেলেটি নাকি তাঁর স্কুলের ছাত্র ছিল।

আর পরিচয় কী?

তাদের বাড়ি নওগাঁ শহরে, ডেপুটি হয়েছে, আমাদের পাল্টিঘর।

ছেলেটির নাম কী?

বাপ লিখেছে সুধীন ভৌমিক।

এতক্ষণ শচীন নীরবে শুনছিল, এবারে বলল, ও ছেলেকে চিনি। স্কুলে পড়বার সময়ে

চিনতাম না, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে যায় তখন পরিচয় হয়েছিল। এখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে বুঝি?

বাপ তো তা-ই লিখেছেন।

ওখানে বিয়ে চলবে না।

কেন রে?

ওরা তিন পুরষের দারোগা, ছেলে সেই পুণ্যের ফলে ডেপুটি হয়েছে, আবার তার পুণ্যের ফলে ওর ছেলে হয়তো পুরো ম্যাজিস্ট্রেট হবে কি জজ হবে, তবু ওখানে মলির বিয়ে চলবে না।

কেন বলো তো?

এটা বুঝলেন না মাস্টার মশাই, যার গায়ে তিন পুরুষের দারোগাগিরির বিষ, সেই ডেপুটি তো স্বদেশীওয়ালাদের যম। হয়তো দেখবেন নিয়তির পরিহাসে কোন দিন আপনাকে বা বাবাকে তার এজলাসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

ছেলের কথা শুনে মা বললেন, দেখো শচীন, এ তোমরা বাড়াবাড়ি। আচ্ছা, দারোগার ছেলে কি ভদ্দরলোক হতে পারে না?

ভদ্দরলোক হতে পারে, ভালো লোক হতে পারে না, বিশেষ ঊর্ধ্বতন তিন পুরষ যদি দারোগা হয়।

শচীন, আমি ভাবছি কি জানো, ছেলের বাপ মেয়ের বাপের ইতিহাস, মেয়ের ভাইয়ের ইতিহাস সব জেনেশুনে কেন এ প্রস্তাব করলো।

না জেনে করেছে।

এ আর কে না জানে, বিশেষ নওগাঁ দিনাজশাহী তো দূর নয়।

তবে কোন মতলব আছে।

কি এমন মতলব হতে পারে?

বাবার টাকার গুজব।

তিন পুরুষের দারোগার টাকার অভাব কি।

এখন ওটা স্বভাব দাঁড়িয়েছে, অনেক আছে আরও বাড়বে না কেন?

হয়তো স্বদেশীর দিকে ঝোঁক আছে।

রকম দেখে তাই মনে হচ্ছে, স্বদেশীওয়ালাদের বাগে পেলে কয়েদ না দিয়ে ছাড়বে না।

না শচীন তুমি হয়তো অন্যায় করছো তাদের উপরে।

এতক্ষণ সংলাপ চলছিল শচীন ও অবিনাশবাবুর মধ্যে। এ বারে কথা বলবার সূত্র পেয়ে নিস্তারিণী দেবী বললেন, দেখুন তো বেয়াই আপনার জামাইয়ের কাণ্ড। একটা পাত্র জোগাড় করে আনতে পারবে না, যদি ভাগ্যগুণে জুটে গেল তখন ভবিষ্যতে কি হতে পারে তাই নিয়ে বসলো। হ্যাঁ রে শচীন, তুই কি কুষ্ঠি গুনতে জানিস?

দারোগার কুষ্ঠি গুনতে হয় না মা।

তবে?

তবে আর কি! মলিনার বিয়ে দিলে তিন পুরুষের দারোগার ছেলের সঙ্গে আর সুশীলের বিয়ে দেবে চার পুরুষের গোয়েন্দার মেয়ের সঙ্গে।

শোনো একবার ছেলের কথা। এখন কি করবো বেয়াই বলুন।

দেখুন আমার মনে হয় যজ্ঞেশবাবুর মত নেই তাই আমার মত যাচাই করতে পাঠিয়েছেন এদিকে। আবার এ দিকে শচীনেরও অমত। এমন স্থলে অগ্রসর নাই হলেন। যাই হোক আমি বিকালে গিয়ে একবার আলোচনা করবো যজ্ঞেশবাবুর সঙ্গে।

বেশ, তবে তাই বলি গিয়ে তাঁকে। কিন্তু এ দিকে যে মলির বয়স বেড়ে চলল। কথাটা এমন সুরে বললেন যেন দোষটা মেয়ের।

মা, দিন গেলেই বয়স বাড়ে, মলিকে দায়ী করছ বৃথা।

না বাবা, সব দায় আমার। আবার কবে বাপ বেটায় মিলে জেলে যাবে তখন আমি মেয়ে নিয়ে কি করবো।

একটা উপায় আছে মা।

উৎসাহিত হয়ে বললেন, কি উপায় তাই বল, মিছে বকাচ্ছিস কেন?

তোমরা দুজনেও জেলে চলো না কেন?

তবে আর সুশীলই বা বাকি থাকে কেন?

আমাদেরই বা বাদ দিলে কেন শচীন। কি গিন্নি রাজী আছ তো?

বিন্দুবাসিনী বললেন, মন্দ হয় না, জেলের মধ্যেই সংসার বসবে। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন আহা শচীনের মতো একটি ছেলে যদি থাকতো।

শচীন, তুই বউমাকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিস শুনে মেয়ে একেবারে কামড়ে ধরেছে যাবে তোমাদের সঙ্গে।

মন্দ কি, একটা বড় জায়গা দেখবে।

মন্দ আর কি। আমরা বুড়োবুড়ী একলা থাকি।

অবিনাশবাবু বললেন, আমরাও তো একলা আছি।

আপনারা তো মেয়ের বিয়ে দিয়ে নির্দায় হয়ে বসে আছেন। আমার যে দায় সে তো রইলোই, এখানেই থাক আর কলকাতাতেই থাক।

শচীন বলল, চোখের বাইরে গেলে চিন্তা কমবে।

বয়স হলে বুঝবি চোখের বাইরে গেলে চিন্তা বাড়ে, তখন তো কাজ থাকে না, কাজের অভাব চিন্তা দিয়ে ছড়িয়ে নেয়।

বিন্দুবাসিনী বললেন, মস্ত একটা সত্যি কথা বললে দিদি। লোকে বলে মেয়ের বিয়ে দিলে লোকে নিশ্চিন্ত হয়। এত বড় ভুল আর নেই। মেয়ের বিয়ে দিলে চিন্তা বেড়ে যায়, প্রথমে জামাইয়ের জন্য, তারপরে নাতিনাতনিদের জন্যে।

যা বলেছ বেয়ান। এবারে উঠি বেয়াইমশায়।

ছুটি দেবার মালিক উনি।

চলো দিদি একটু ঘরে, এতক্ষণ দরকারি কথা হল—

বাক্যটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অবিনাশবাবু বললেন, এবারে মনের কথা। মনের কথা বলবার পুরনো লোকটাকে বুঝি আর পছন্দ হয় না।

আহা তুমি থামো তো—বলে দুই বেয়ানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

উনত্রিশ

শ্রীচরণেষু, মাস্টারমশাই,

এখানে এসে গুছিয়ে নিতে কদিন গেল। ইতিমধ্যে মলিনারা কলকাতার যাবতীয় দ্রষ্টব্য ও অদ্রষ্টব্য বস্তু যথা জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বোটানিকাল গার্ডেনস্, হাওড়ার পুল, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, পরেশনাথের মন্দির প্রভৃতি দেখে নিয়েছে। সম্ভব হলে আমি সঙ্গে যেতাম অন্যথা সুশীল। এখন মেয়েরা দোতালার বারান্দায় মোড়া পেতে বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে পথের জনতা ও বিচিত্র দৃশ্য দেখে সময় কাটায়। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে কলকাতা শহরটা দিনাজশাহীর চেয়ে বড়ই হবে। আমাদের বাসাটা আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরে একটা গলির মোড়ে, কাজেই বড় রাস্তা ও গলি দুয়েরই সুযোগ পায়। বড় রাস্তার সুযোগ তো বলেছি, গলির সুযোগ হচ্ছে দুপুর বেলায় ফিরিওলার কাছ থেকে জিনিস কেনা। এক আনার জিনিস চার আনায় কিনে কলেজ থেকে ফিরলে আমাকে অবাক করে দেয়, বলে এ কখনোই তোমার দ্বারা হতো না। স্বীকার করি, না আদৌ সম্ভব হতো না। বাসায় ঠাকুর-চাকর আছে, কাজ করতে হয় না বলে গল্পের অবাধ অবসর। সুশীল এসে জুটলে দ্বিভুজ আড্ডাটি ত্রিভুজ হয়ে ঘনতর হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে থাকে মুড়ি, বেগুনি, পাঁপড়-ভাজা, চা। মাঝে মাঝে আমাকে টানতে চেষ্টা করে, বড় একটা ধরা দিই নে।

চতুর্ভুজ হওয়ার ইচ্ছে নেই বলে, তা ছাড়া সুশীলের অসুবিধা হয়। মোটের উপরে এরা ভালোই আছে মনে হয়। দিনাজপুরের স্মৃতি এদের আনন্দকে এতটুকু ম্লান করেছে বলে মনে হয় না।

বাসা গুছিয়ে তুলেছি বটে মনটা এখনো গুছিয়ে আনতে পারিনি। সে দিন আপনি যে প্রসঙ্গ তুলেছিলেন ধ্বনিপ্রতিধ্বনিরূপে সেটা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। এ কথা সত্য যে বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে বঙ্গের প্রাধান্য বেড়ে ওঠায় ভারতবোধটা গৌণ হয়ে পড়েছে—অন্তত অপ্রবীণদের মনে। তবে সেটা ভালো কি মন্দ তার ফলাফল কত দূরপ্রসারী কিছু বুঝতে পারছি না, এখনো বিষয়টা নিয়ে কেউ চিন্তা আরম্ভ করেনি। আট-দশ বছরের আন্দোলনের ফলে জয়লাভে অনেকে উল্লসিত, অনেকে ক্লান্ত, কিছু কিছু লোক উদাসীন, মোটের উপরে সকলেই এখন পুরাতন জীবনযাত্রা পুনরায় আরম্ভ করতে ব্যস্ত । যুদ্ধান্তে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা।

এদিকে কলকাতা থেকে রাজধানী সরে গেল দেখে বাড়িভাড়া কমবে আশঙ্কায় মালিকরা উদ্বিগ্ন, ভাড়াটেরা আনন্দে উল্লসিত। আবার ভারত সরকারের যে-সব কর্মচারীকে দিল্লীতে যেতে হবে তাদের দোমনা ভাব। দিল্লীতে জল হাওয়া ভালো, খাদ্যখানা সস্তা, চারদিকে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান; আবার হে মাতঃ বঙ্গকে ছেড়ে যেতে হবে, এখানকার যে-সব পথঘাট দৃশ্যাবলী অতি-পরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে ম্লানভাবে বিরাজ করছিল হঠাৎ তারা মনের শিরা-উপশিরার উপরে মোচড় দিতে শুরু করেছে। প্রথম দৃষ্টির বিস্ময় ও শেষ দৃষ্টির অতৃপ্তির মধ্যে এখন পাঞ্জা কষাকষি চলছে। অভাবিত ঘটনা-মাহাত্ম্যে গাঁয়ের কপাটি খেলবার মাঠ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রান্তরের উপরে টেক্কা দিয়েছে। মোটের উপরে লোকে ভালোই আছে, ব্যতিক্রম বোধ করি আমি একক। তবে আরও থাকা অসম্ভব নয়, তবে এখনো তারা অজ্ঞাতবাস করছে।

আপনি তবু একটা আদর্শের ভগ্নমূর্তি পেয়েছেন, ভগ্ন হলেও মূর্তি বটে, একটু চেষ্টা করলে হয়তো জোড়া লাগতে পারে। কিন্তু আমার সম্মুখে যে অসীম শূন্যতা, চোখের উপরে নেমে এসেছে একটা কালো পর্দা। এ যেন সাত বছর সমস্ত শহরটা চটকা ভেঙে জেগে উঠে পুরাতন চালে নূতন ভাবে চলতে শুরু করেছে। পার্কগুলো খালি, কোথাও সভাসমিতি নেই, রাস্তায় স্বদেশী গান শোনা যায় না, সংবাদপত্রে রাজভক্তির বন্যার ঢেউ খেলছে। আর কাপড়ের দোকান লবণ ও চিনির দোকানগুলো দ্বিগুণ তেজে বিলিতি মাল বেচছে। ম্যাঞ্চেস্টার বস্তাপচা মালের গোলা ভারতীয় বাজারের চাঁদমারি লক্ষ করে ছুঁড়ছে, একটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না। দোকানদারদের মুখে কি অমায়িক হাসি, আসুন বাবু বসুন, এই নিন পান, সিগারেট। বিলাত থেকে টাটকা কাপড় এসে পৌঁছেছে, দেখুন কি রংদার শাড়ি আর কি ঠাস বুনন মিহি জমিন।

এ কী হে, এ যে দাগী, পুরানো মাল নয় তো!

সকালবেলায় কি মিথ্যে বলে নরকে যাবো (বিকালে বলতে বাধা নেই)! ওটা দাগী নয়, একটু দাগ লেগেছে মাত্র, জাহাজে এসেছে কিনা, নিন আপনাকে টাকায় চার আনা ছাড় দেবো। বলে শেষ পর্যন্ত টাকায় ছ'আনা ছাড় দিয়ে সাত বছর আগেকার গুদামজাত জিনিস পাচার করে দিচ্ছে। যে কিনছে সে হয়তো পিকেটিঙ করে জেলে গিয়েছিল, যে বেচছে হয়তো সেও। কিন্তু এখন কি পটপরিবর্তন! মাস্টারমশাই, আপনার একটা উক্তি মনে পড়ছে, অনেক কথাই পড়ে, বাঙালীর চিত্তে মাঝে মাঝে প্রবল বর্ষণ নামে কিন্তু ধরে রাখতে পারে না সে জল, দু'দিনের কলোচ্ছ্বাসের পরে অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। এখন মনে হচ্ছে বয়কট ব্যাপারটা সেইরকম একটা শক্তির অপব্যয় মাত্র। রবিবাবুর একটা প্রবন্ধের বিষয় মনে আসছে, ইংরাজের উপর রাগ করে দেশী কাপড় ব্যবহার করা দেশকে অপমান করার সামিল, দেশকে ভালোবাসি বলে যেদিন দেশী জিনিস ব্যবহার করবো সার্থক হবে আমাদের স্বদেশী। আগে তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করতো না, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে এখন শুনছে যদিও মানছে না। এও সেই বিলিতি মালের মর্যাদা। এখানে মলি ও তার বৌদি আনন্দে আছে কাজেই স্বাস্থ্য ভালো আছে, তাদের ইচ্ছা আপনি একবার ঘুরে যান। এখানে আর সবই ভালো কেবল সুশীলের সম্বন্ধে আমার উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হয়েছে। স্বাস্থ্য অবশ্য ভালোই আছে, খুব ভোরে ওঠে, প্রাতঃস্নান করে, তার আগে দেশী মতে ব্যায়াম করে, ছোলা ভিজা আদা গুড় খায়; নিরামিষ তো আগেই অর্থাৎ বাড়িতে থাকতেই আরম্ভ করেছিল, এখানেও চলছে। এ পর্যন্ত একরকম, আজকাল অনেক যুবক করে থাকে। কিন্তু উদ্বেগের কারণ অন্যত্র। তার আসা যাওয়া গতিবিধি সমস্তই অনিয়মিত ও সন্দেহজনক। কলেজে যাবে বলে বের হয়, যায় কি না, কতক্ষণ থাকে জানবার উপায় নেই। কোনো কোনো দিন ফিরতে রাত বারোটা হয়ে যায়, মেয়েদের বলে যায় তার ভাত যেন ঢেকে রেখে দেওয়া হয়। একদিন রমণী নামে আমার একটি ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম, মেয়েদের কাছে জানতে পেরে সরাসরি আমার কাছে এসে বলল, ওকে বাড়িতে আনা চলবে না।

কেন রে?

ছেলেটি ভালো নয়।

বিলক্ষণ, আমি দেখেছি খুব ভালো, নিয়মিত ক্লাসে আসে, প্রশ্ন করলে সদুত্তর দেয়, এ দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যবান প্রিয়ভাষী।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মলির সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার কথা ভাবছ।

আগে ভাবিনি তবে তোর কথা শুনে ভাবনাটা মনে এলো।

না, ওকে বাড়িতে এনো না।

যতদিন না তার বিরুদ্ধে না আনবার কারণ দেখাতে পারছিস অবশ্যই আনবো।

আমাদের কথোপকথন অবিকল তুলে দিলাম। রমণী ওকে বেশ চেনে, একসময়ে দু-একদিন ওর মেসে গিয়েছিল, এখন অনেক দিন যায়নি। ওর কাছে প্রশ্ন করে সুশীলের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারলাম না, লুকালো বলে মনে হয় না, কারণ বলল ওভারটুন হলের নীচের তলায় শ্রমজীবী সমবায় বলে যে বই খাতাপত্র প্রভৃতি ছাত্রব্যবহার্য জিনিসের দোকান আছে সুশীলকে কখনো-সখনো দেখেছে সেখানে। ছেলেটি লেখাপড়ায় ভালো, ইংরাজিতে অনার্স নিয়েছে, পাবে বলেই মনে হয়, শেষ পর্যন্ত না ডেপুরটিগিরির পথে যায়। ওর পিতা বর্ধমান জেলার সম্পন্ন গৃহস্থ। মা এ সব কথা জানতে পারলে এখনই ছুটে আসবেন, সেটা আমি চাই নে। তিনি এখনই জানতে পারেন আমার ইচ্ছা নয়। আরও কিছুদিন ওর প্রতি লক্ষ রাখতে চাই, বিশেষ সামনেই ওর পরীক্ষা। তবে সুশীলের অমূলক আপত্তি দূর না হলে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না। আশা করি আপনি ও মাসিমা (বিয়ের আগে এই সম্বন্ধ ধরেই ডাকতো) মঙ্গল মতো আছেন।

আমাদের কুশল।

সেবক শচীন।

ত্রিশ

অনেকক্ষণ থেকে মলিনা ও রুক্মিণী সেজেগুজে বসে আছে, না আসে শচীন না আসে সুশীল। একে বিকালের তপ্ত রোদ তায় বদ্ধ ঘর, ওরা ঘেমে উঠেছে। ভেবেছিল বাইরের হাওয়ায় বের হলে ঘাম মরে যাবে কিন্তু বসে থেকে থেকে আরও ঘামছে আর কপালে কুঙ্কুমের ফোঁটা মুখের রঙ গলে পড়বার মুখে, আর কিছুক্ষণ এমন চললেই মুখ ধুয়ে ফেলে আবার প্রসাধন করতে হবে। মাঝে মাঝে মুখ দেখছে আয়নায়, শাড়িটা পাট করে দিচ্ছে, মুখে হাত বুলোতে ইচ্ছা করছে কিন্তু জানে একবার হাত দিলেই সমস্ত লেপটে যাবে। আবার নূতন করে সাজতে হবে।

কথা ছিল শচীন আজ তাদের নিয়ে যাবে দক্ষিণেশ্বরে, ভবতারিণী কালীমূর্তি ও পরমহংসদেবের সাধনপীঠ দেখাতে, সঙ্গে যাবে সুশীল। শচীন কলেজে যাওয়ার সময়ে বলে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে, আর সুশীলকেও বিশেষ করে বলে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি ফিরিস, না হয় শেষের ক্লাসটা বাদ দিস। কিন্তু কই, যেমন দাদা তেমনি ছোট ভাই, কারো দেখা নেই। ওরা অনেকক্ষণ থেকে ঘর-বার করছে অর্থাৎ ঘর থেকে বারান্দা, দোতালার দরজার ও জানলার ফাঁক। পথে লোকের অভাব নেই কিন্তু কোথায় তারা।

ওরা যখন হতাশ হয়ে বসে পড়েছে প্রায় ধরে নিয়েছে আজ আর যাওয়া হল না, শেষ মুহূর্ত পেরিয়ে যাওয়ার পরে শচীন এসে কোনো একটা অজুহাত দেখাবে, সুশীল সেটুকুও দেখাবে না, হয়তো বা আসবেই না। বাইরে যারা যায় ঘরের লোকের দুঃখ তারা বোঝে না। ওরা যখন ভাবতে শুরু করেছে বেড়াবার পোশাক খুলে ফেলবে কি না এমন সময়ে দরজার কড়া নড়ে উঠল, মলিনা উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখলো ডাকপিওন মাত্র। অন্য সময় হলে কৌতূহলে ছুটে গিয়ে চিঠি নিয়ে আসতো, আজ সেই বদ্ধজীবের পরমমিত্র ডাকপিওনকে নিতান্ত অবাঞ্ছিত মনে হল, কিন্তু এ কী, দোতালার দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো শচীন, হাতে খানকতক চিঠি।

একি দাদা তুমি এখন এলে? দরজা খুলে দিল কে?

পিওনের জন্য ভূষণ দরজা খুলেছিল, ঢুকলাম—এই নে চিঠি।

অবাঞ্ছিতের ফাঁক দিয়েই অনেক সময় দেখা দেয় পরম বাঞ্ছিত।

চিঠিগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়েই বলল, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, চলো, ভূষণকে দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকাও।

রুক্মিণী বলল, সে কী করে হয় ভাই, ঠাকুরপো আসেনি।

বউদি, তোমার গুণের ঠাকুরপোর জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে আজকার বেড়ানোটা মাটি হয়ে যাবে।

রুক্মিণীরও ইচ্ছা এখনই বের হয়ে পড়ে তবু মুখে বলল, না ভাই, তা হয় না।

শচীন বইগুলো রাখতে গৃহান্তরে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলল, সুশীল কই?

তা তোমার গুণধর ভাইকে জিজ্ঞাসা কোরো।

আরে পেলে তো জিজ্ঞাসা করি—কোথায় সেই ভবঘুরেটা?

ভব ঘুরে দেখো—বলল মলিনা।

আজকাল ওর কী যে হয়েছে।

দাদা, তোমাকে অনেকবার বলেছি হয় ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও, নয় কড়া শাসনে রাখো।

কোনটাই সম্ভব নয় বুঝে শচীন উত্তর দিল না, আগেও দেয়নি। এমন সময়ে আবার কড়া নড়ে উঠল আর মুহূর্ত পরেই চৌকাঠের ফ্রেমের মধ্যে দেখা দিল রমণী। রুক্মিণী ও মলিনা অন্য ঘরে গেল, মলিনা আগে যেতো না, এখন যায়। রুক্মিণী অপাঙ্গে মলিনার মুখের দিকে তাকালো, সেটা চোখ এড়ালো না তার। অপ্রস্তুত ভাব ঢাকবার উদ্দেশ্যে টেবিলের উপরে বইগুলো গোছাতে আরম্ভ করলো। বেশ বুঝতে পারা যায় এ বাড়িতে রমণীর যাতায়াত বেশ রমণীয় হয়ে উঠেছে। এমন সময় শুনতে পেলো দাদার ডাক, মলিনা এ ঘরে আয়।

যাই দাদা—বলতে গলাটা কেঁপে উঠল।

যাও ভাই, বইগুলো যথেষ্ট আগোছালো করেছ, আমি গুছিয়ে রাখছি—বলে মুখ টিপে হাসলো রুক্মিণী।

বউদির এই টিপ্পনিটুকু মলিনার মধুর লাগলো তবু তার দিকে একটা ছদ্ম কোপের দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে রওনা হল, যাওয়ার আগে চকিতে আয়নার মুখটা একবার দেখবার, কাঁধের উপরে শাড়িটা আর একটু টেনে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলো না। আগে হলে ছুটে যেতো এখন ধীরে যায়, আগে জোরে কথা বলতো এখন ধীরে বলে, আগে রমণীবাবু বলতো, এখন নাম উচ্চারণ করে না, পরিচিত এখন অপরিচিত। রমণীতেও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আগে বেড়াতে আসতো, প্রত্যহ একই স্থানে বেড়ানো চলে না। এখন পড়া বুঝে নিতে আসে, জ্ঞান অনন্ত, তাই আসবার উপলক্ষ্য ফুরোতে চায় না।

সে দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে শচীন বলল, আচ্ছা রমণীর সঙ্গে মলিনার বিয়ে হলে কেমন হয়?

মনের উৎসাহ চেপে রেখে স্ত্রী সংক্ষেপে বলল, বেশ হয়।

কিন্তু আমি ভাবছি কী মলিনার ওকে পছন্দ হবে কি?

চিরটা কাল বইয়ের পাতার দিকে চোখ দুটো দিয়ে রাখলে, মানুষের মুখের দিকে তো তাকালে না।

স্ত্রীর গাল দুটো টিপে দিয়ে বলল, কেন এখন তো বই ছেড়ে বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কিন্তু আমাকে তো পছন্দ করে বিয়ে করোনি।

তার চেয়ে বেশি করেছি।

কী রকম শুনি?

দুষ্ট রাহু গ্রাস করবার আগেই মাঝপথ থেকে লুফে নিয়েছি।

সেটা তো অবস্থাগতিকে। পছন্দ তো করোনি।

যাকে চিরকাল দেখে আসছি তার সম্বন্ধে পছন্দ অপছন্দব প্রশ্ন ওঠে না। পছন্দ নতুন দৃষ্টির ফসল।

দম্পতির বিশ্রম্ভালাপের জমা খরচের যোগফল শূন্য।

রমণী বলল, স্যার আপনারা কোথাও বের হচ্ছেন নাকি? বড় অসময়ে এসে পড়েছি।

অত্যন্ত সুসময়ে এসে পড়েছ। দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার কথা, তিনটায় রওনা হব, তার আগে আসতে বলে দিয়েছি সুশীলকে, দেখো এখনো এল না, বয়স হল, হল না দায়িত্বজ্ঞান।

তাই তো। আচ্ছা আমি কি একবার শ্রমজীবী সমবায়ে দেখে আসবো, অনেক সময়ে ওখানে থাকে।

যাও না, পাও না পাও একখানা ঘোড়ার গাড়ি সঙ্গে করে নিয়ে এসো। আর শোনো ওকে যদি নিতান্তই না পাওয়া যায় তুমি যেতে পারবে সঙ্গে?

রমণীর ষোলো আনা ইচ্ছা যায়—তবু বলল, আপনাদের অসুবিধা হবে।

বিলক্ষণ, না গেলেই অসুবিধা।

মলিনার আঠারো আনা ইচ্ছা যায়, তবু বলল, ওঁর হয়তো অন্য কাজ আছে।

রমণী বুঝতে পারলো না এ আপত্তি মৌখিক না আন্তরিক। তবু কিছু বলা আবশ্যক। বলল, ছিল বটে কাজ তবে এমন কিছু জরুরী নয়।

তবে চলো। আর ওকে পাওয়া গেলেও তোমাকে ছাড়ছি নে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে,

সঙ্গে দু-একজন অতিরিক্ত পুরুষ থাকা ভালো, দিনকাল খারাপ।

সুশীলকে পাওয়া গেলে সেই যাক, আমার যাওয়াটা হয়তো সে পছন্দ করবে না।

সে পরে বিবেচনা করবো, এখন দেখে এসো পাওয়া যায় কি না।

মলিনা মনে মনে বলল, ছোটদার অনেক কাজ, আজ যেন তাকে না পাওয়া যায়। রমণী মনে মনে বলল, শ্রমজীবী সমবায় বাদ দিয়ে আর সর্বত্র সন্ধান করবো।

মলি, তোর দিকের জানলাটা তুলে দি, রোদে মুখ লাল হয়ে উঠল।

না দাদা, বেশ আছি, পথঘাট বাড়িঘর দেখতে দেখতে যাচ্ছি।

ঠিকে গাড়ি খড়খড় ঘড়ঘড় রবে পথের ধুলো উড়িয়ে, পথিককে সচকিত করে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে ছুটেছে।

সুশীলকে কোথাও খুঁজে পায়নি রমণী, শচীনের অনুরোধে তাদের সঙ্গে চলেছে দক্ষিণেশ্বরে। গাড়ির মধ্যে চার জন, শচীন রমণী সামনের দিকে এবং রুক্মিণী আর মলিনা পিছনের দিকের আসনে। মলিনার মুখ সত্যি লাল হয়ে উঠেছিল তবে রোদে নয় গাড়ির মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তির উপস্থিতিতে আর মাঝে মাঝে রুক্মিণীর উদ্দেশ্যমূলক চিমটিতে। সে নিতান্ত ব্যগ্রভাবে বলল, না না দাদা, জানলা তুলে দিয়ে কাজ নেই। সে বুঝেছিল জানলা তুলে দিলেও তার মুখের রক্তিমা কমবে না, মাঝ থেকে রৌদ্ররূপী স্পষ্ট কারণটার অভাব ঘটবে আর তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠবার সম্ভাবনা রুক্মিণীর চিমটিগুলোর।

আরে বাইরে এমন কি দেখবার আছে, মাঝে থেকে ধুলো আসছে।

মলিনা ভাবলো কথাটা মিথ্যা নয়, দেখবার যা কিছু ভিতরেই, বাইরের দৃশ্য অজুহাত মাত্র।

না না দাদা, থাক, বরঞ্চ তোমার দিকের জানলাটা তুলে দাও।

রুক্মিণী কখনো রমণীর সম্মুখে কথা বলেনি, এখন বলল। গাড়িতে ও পথে চিরাচরিত সংস্কার শিথিল হয়ে যায়। বলল, রোদে আমার মাথা ধরে উঠেছে, দাও জানলাটা তুলে।

বউদি, তুমি বরঞ্চ আমার দিকে এসে বসো।

তাতে আরও বেশি রোদ লাগবে, তুমি খাড়া পশ্চিমে বসেছ।

অবোধ পুরুষ দুটি রৌদ্রের রহস্য কিছুই বুঝতে পারলো না, গাড়ির সম্মুখের আসনের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তারা উদাসীন, কোথায় তাদের চোখ। কত বৃহৎ সমস্যা, কত সুদূরপ্রসারী চিন্তা তাদের মনের মধ্যে, কাছের জিনিস তাদের চোখে পড়ে না। মেয়েরা দেখে খুঁটিনাটি অদৃশ্য সব বস্তু। পুরুষের চোখ দূরবীক্ষণ আর মেয়েদের চোখ অণুবীক্ষণ।

হাঁ, কাছেভিতে দ্রষ্টব্যের অভাব ছিল না। রমণীর বুকের উপরে প্লেট দেওয়া শার্ট, কাঁধের উপরে কোঁচানো চাদর, গাড়ির পাদানের উপরে লুণ্ঠিত কোঁচা, চোখের সোনার চশমা, এসব কি দ্রষ্টব্য নয়। যে ব্যক্তি দেখতে জানে তার চোখে এ সমস্তর মধ্যে অসীম রহস্যনিকেতন।

আমি বরঞ্চ জানলাটা তুলে দি, বউদির মাথা ধরে উঠেছে—বলে রমণী উঠে জানলার খড়খড়ি তুলে দিল। এই প্রথম সে রুক্মিণীকে বউদি বলে সম্বোধন করলো, বউদি ছাড়া আর

বলবেই বা কি। এতদিন সম্বোধন করবার প্রয়োজন হয়নি। রোদের অজুহাত মলিনার গেল তবে পরিবর্তে লাভও কম হল না। রমণীর চাদরের প্রান্ত উড়ে এসে লাগলো মলিনার মুখে, জামার হাতাটা স্পর্শ করলো তার বাহু আর নিশ্বাসের সঙ্গে মিশলো নিশ্বাস। এ সব এড়ালো না রুক্মিণীর চোখ।

সে জিজ্ঞাসা করলো, মলিনা, এবারে ভালো লাগছে না?

বাক্যটার বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে ভিন্ন অর্থ সম্ভব। কালীপক্ষের অর্থ গ্রহণ করে শচীন বলল, দেখ, এবারে ভালো লাগছে।

বিদ্যাপক্ষের অর্থ গ্রহণ করে রুক্মিণী বলল, ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি ওর ভালো লাগছে।

অবোধ পুরুষ, চতুর নারী!

অবশেষে এ লীলার অবসান হল, গাড়ি এসে পৌঁছলো দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানার দরজায়। ওরা চার জনে নেমে মন্দিরের দিকে চলল।

বেশি দেরি করবেন না মশয়, যাতায়াতি চুক্তি বলে রাত করে দেবেন না মশয়।

না না দেরি হবে না গাড়োয়ান।

আমরা কোচোয়ান মশয়, গাড়োয়ান যারা গোরুর গাড়ি চালায়।

একজন পাণ্ডা এসে জুটলো, প্রয়োজন নেই বললেও সঙ্গ ছাড়লো না সে।

চলো রমণী, ঠাকুরের ঘরটা দেখে আসা যাক।

সে কি বাবু, আগে কালীমাকে দর্শন করুন, যাঁর কৃপায় ঠাকুর পরমহংস হলেন।

ঠিক কথা, চলো মন্দিরের দিকে যাই।

মাকে দর্শন করবার আগে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাত পা ধুয়ে পবিত্র হয়ে নিন। মশায়রা তো ব্রাহ্মণ।

হাঁ!

তবে আর কি।

চার জনে গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হল, বেশি নামতে হল না, জোয়ারের জল এগিয়ে এসে অনেকগুলো সিঁড়ি ডুবিয়ে দিয়েছিল। হাত পা ধুয়ে ওরা বসলো একটা ধাপের উপরে, উঠতে ভুলে গেল। জোয়ারের কলকল, স্নিগ্ধ বাতাস, এ পারে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার, ওপারে সূর্যাস্তের শেষ আভা, নদীর জলে নৌকোর আলো, মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টার রব সমস্ত মিলে মায়াজাল নিক্ষেপ করলো তাদের মনের উপরে।

কি বাবু, বসে রইলেন যে—চলুন মায়ের আরতি দর্শন করবেন।

হাঁ চলুন যাই।

চার জনে এসে ভবতারিণী কালীর উদ্দেশে প্রণাম করলো।

রমণী বলল, এমন স্নেহপূর্ণ মূর্তি দেখিনি, স্যার।

রমণী, কালী মৃত্যুর প্রতীক, তবে তেমন করে দেখতে পারলে মৃত্যুও স্নেহময়।

তত্ত্ব আলোচনার সময় ছিল না, লোকটা তাড়া দিচ্ছিল।

চলুন ঠাকুরের ঘরটা দেখে নেবেন, এর পরে সব বন্ধ হয়ে যাবে।

ওরা ঠাকুরের দোতালার ঘরে গিয়ে ঠাকুরের ছবির কাছে প্রণাম করলো।

পাণ্ডাঠাকুর—

আমরা পাণ্ডা নই, পূজারী। পাণ্ডা হল খোট্টা-মেড়োরা।

ভুল হয়েছে পূজারীঠাকুর, একবার পঞ্চবটীটা দেখিয়ে দেবেন না?

সে কি বাবু, এই সন্ধ্যাবেলায়!

ক্ষতি কি?

রাতের বেলায় ওখানে অনেকে সাধনা করেন আর তা ছাড়া সেখানে দশমহাবিদ্যার লীলা চলে, অবশ্য সেটা অনেক রাতে।

আমরা ওখানে বেশিক্ষণ থাকবো না, একবার উঁকি মেরে দেখেই চলে আসবো।

হাঁ, দাঁড়াবেন না।

পঞ্চবটী নির্জন স্থান, তাতে সন্ধ্যার অন্ধকার, তবে মানুষ দেখা যায়। ওরা ধীর পদে বেদীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, পূজারী ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে ইঙ্গিত করতে লাগলো—ফিরে চলুন, ফিরে চলুন।

ওরা কৌতূহলবশত আরও একটু এগিয়ে গেল, আর এগোতে সাহস হল না, উঁকি মেরে দেখলো একটি গাছের আড়ালে মুদ্রিত চক্ষু ধ্যাননিমগ্ন সুশীল। শচীন মুখে আঙুল দিয়ে শব্দ করতে নিষেধ করলো, তাকে অনুসরণ করে সকলেই ফিরে চলল।

পূজারী শুধালো, দেখা পেলেন তো সাধকের? আপনাদের ভাগ্য ভালো, সকলের ও সৌভাগ্য ঘটে না।

কেউ কথার উত্তর দিল না। আর একবার তারা কালী মূর্তিকে প্রণাম করলো। কে কী প্রার্থনা করলো!

পূজারীর হাতে একটি টাকা দিতে দশ টাকার ওজনে আশীর্বাদ করে জানালো যে বাবুদের পুণ্যের শরীর বলেই সাধকের দর্শন লাভ হল।

ওরা গাড়িতে উঠল, গাড়ি ছুটলো শহরের দিকে। কারো মুখে কথা নাই।

একত্রিশ

দেখো এখনো বলছি সময় থাকতে সাবধান হও, সে দিন নিজ চোখে দেখলে তো। এর পরেও যদি কিছু না করো তবে লোকে তোমাকে দায়ী করলে তাদের দোষ দিও না।

তুমি যা বলছ মিথ্যে নয়, তবে.....কিন্তু...

'তবে কিন্তু'র সময় চলে গিয়েছে। নিজ চোখে দেখে এলে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে ধ্যান করছে, এরপরে নদীটা পার হয়ে বেলুড় মঠে গিয়ে ভর্তি হলে তখন কী করবে?

দেখো রুকমি, বেলুড়মঠে ভর্তি হওয়া অত সহজ নয়, তারা যুল দিয়ে দেখে খাঁটি কী মেকী, পরীক্ষা দেবার ভয়ে এসেছে কি প্রাণের টানে এসেছে, বিমাতার অত্যাচারে এসেছে কি ঠাকুরের আহ্বানে এসেছে।

এত কথা জানলে কী করে, চেষ্টা করেছিলে নাকি ভর্তি হতে?

চেষ্টা করতে আর পারলাম কই, মাঝপথে পাকড়াও করলে আমাকে।

আমি কাউকে পাকড়াও করিনি, কোথা থেকে হঠাৎ একটা লোক এসে বরের আসনে বসে গেল।

আর ফস্কে গেলো নাটোরের কাঁচাগোল্লা।

দেখো, ঠাট্টা করো না।

কাঁচাগোল্লা নিয়ে ঠাট্টা! সর্বনাশ! মাইরি বলছি এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

গা ছুঁতে উদ্যত হলে রুক্মিণী সরে বসলো।

সরলে যে, পাছে মলি দেখে ফেলে?

তার কি আর দেখবার জন্যে বাইরের দিকে নজর আছে, মনে মনে সেও এখন ধ্যানস্থ।

কার ধ্যান?

সেদিন গাড়ির মধ্যে দেখলে না?

আমার তো কিছু চোখে পড়েনি।

ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল কেন?

রোদে।

রোদ তো আমার গায়েও লেগেছিল।

তোমার মৌলিক রঙ ভেদ করে মনের আভা গালে ফুটে ওঠা কিছু কঠিন নয় কী?

বেশ, আমি কালো তো কালো।

আহা তোমাকে কালো বললে পি. এম. বাগচীর কালিকে কি বলবো!

কি বলবে বসে বসে ভাবো, আমি চললাম। বলে উঠে পড়তে উদ্যত হলো। আঁচল চেপে ধরলো শচীন, বললো, সুশীলের বিয়ের প্রসঙ্গটা তাহলে বাজে কথা?

তুমিই তো গা করছ না।

গা করলেই তো পাত্রী এসে জুটবে না।

ঠাকুরঝি আর আমি ভেবেচিন্তে একটা পাত্রী স্থির করেছি।

শুনতে পাই কে সেই সৌভাগ্যবতী?

শোনবার দরকার কি, অনেক বার দেখেছো তাকে।

কী চোখে দেখেছি বলো?

আহা কী ভাষা, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে যাচ্ছে।

একেবারে স্থির করে ফেলেছ? তার মানে তোমাদের চেনা মেয়ে—

তোমারও, সকলেরই।

কে মেয়েটি?

আমাদের তারাচরণ উকীলের মেয়ে লীলা; দেখতে যেমন সুন্দর স্বভাবটাও তেমনি।

অর্থাৎ দেখতে মায়ের মতো আর স্বভাবটা মোটেই বাপের মতো নয়। তা তিনি আমাদের মতো ঘরে কি মেয়ে দেবেন, আমরা যে নামকাটা সেপাই।

মেয়ের ভালো বিয়ের লোভে লোকে নাম তো তুচ্ছ কথা, নাক কান পর্যন্ত কাটতে রাজি।

ভেবে ভেবে মন্দ ঠাওরাওনি, মেয়ে চেনা, পরিবারটি চেনা, আবার একই শহরের লোক। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানো ঐ সঙ্গে মলির বিয়েটাও হয়ে যাক। মুশকিল কি জানো একসঙ্গে দুটি পাত্রপাত্রী জোটাই কোথা থেকে।

মলির পাত্র তো জুটেই আছে।

জুটেই আছে, কোথায়, আমি তো দেখতে পাই নে।

সেইজন্যেই তো তোমার হয়ে আমাকে দেখতে হয়।

খুলেই বলো না লোকটা কে?

রমণী গো রমণী, তোমার ছাত্র রমণী।

তার সঙ্গে নিশ্চয় এ বিষয়ে তোমার কথা হয়নি, কি করে জানলে?

যে-সব বিষয় মুখে খুলে না বললেও বুঝতে পারা যায় এ সেই রকম একটা বিষয়।

আমি বললেই ও বিয়ে করবে?

তুমি না বললেও বিয়ে করবে, রমণীর এখন একবার ডাকিলেই খাই মনের ভাব।

আর তোমার ঠাকুরঝিটির?

শুনবে, তবে শোনো, সে দিন দুপুরবেলা ওর ঘরে ঢুকে দেখি কি একখানা বই পড়ছে, আমাকে দেখেই উল্টে রেখে দিয়ে অন্য কথা পাড়লো। আমার কেমন সন্দেহ হল—কী বই! পাল্টে নিয়ে দেখি কবিতা, পড়ে দেখি আরম্ভ "রমণীরে কেবা জানে মন তার কোনখানে।" বইয়ের উপরে নাম দেখি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবিঠাকুরের কবিতার প্রধান গুণ কি জানো? জাগ দিয়ে রেখে রাতারাতি ডাঁশা আম পাকিয়ে তোলে। ধরা পড়ে গিয়ে লাল হয়ে উঠল—

শচীন বাধা দিয়ে বলল, কারো কারো মস্ত সুবিধা যে যতই ধরা পড়ুক রঙের বদল হয় না।

আহা বাজে কথা রাখো—বললাম রমণীর মন কোথায় আমি জানি। ও বলল কি যে যা-তা কথা বলছ বউদি।

এতদূর গড়িয়েছে জানতাম না। কিন্তু ও পক্ষের মনের কথা জানি কি করে?

আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, রমণী আগে আসতো দেখাসাক্ষাৎ করতে, ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ চলে না। তাই এখন আসে পড়া বুঝিয়ে নিতে। জ্ঞানের শেষ নেই তাই শেষ নেই আসা যাওয়ার।

একটু ভাবতে সময় দাও।

তা ভাবো কিন্তু সুশীলের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আর গড়িমসি কোরো না।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণের বারান্দায় বসে এই সব আলোচনা চলছিল, সুশীলের আসা-যাওয়ার অনিয়ম সম্বন্ধে এখন আর চিন্তা করে না, কারণ বুঝলে কার্যের গুরুত্ব কমে যায়।

রুক্মিণীর হাতখানা টেনে নিয়ে শচীন বলল, দেখো রুকমি, আমি ও সব ধ্যানের জন্য আদৌ ভাবছি না, অনেককে ধ্যানস্থ হতে দেখলাম আবার অনেকের ধ্যানভঙ্গ হতেও দেখলাম, ও সব ধরি না। আর পুরাণ যদি বিশ্বাস করো তবে ধ্যানভঙ্গের ফল আমাদের সকলের রক্তের মধ্যে।

বিস্মিত রুক্মিণী বলল, সে আবার কীগো?

কেন শকুন্তলার কাহিনী পড়োনি? বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গের ফল শকুন্তলা, আর শকুন্তলা

ও দুষ্মন্তের পুত্র ভরত যার নামে এ দেশ ভারতবর্ষ আর আমরা ভারতীয় সেই দেশের অধিবাসী, কাজেই ধ্যান সম্বন্ধে আমাদের বিচলিত হওয়ার কারণ থাকতে পারে না।

তবে তোমার বিচলিত হওয়ার কারণ কি?

আমি ভাবছি ও বিপ্লবীদের পাল্লায় পড়লো নাকি!

শঙ্কিত রুক্মিণী গালে হাত দিয়ে বলল, ওমা, সে কী গো, তারা যে মানুষ খুন করে! এই তো সেদিন গোলদীঘিতে খুন হয়ে গেল!

তুমি বলছ খুন, সরকারও তা-ই বলে, বিপ্লবীরা বলে দেশের কণ্টক দূর করলো।

তাই বলে নিরীহ মানুষ মারা?

ওরা নিরীহ মনে করে না। আর তা ছাড়া ওরাও কম বিপদের ঝুঁকি নেয় না, ধরা পড়লে ফাঁসি, জেল, দ্বীপান্তর। কানাই দত্ত, ক্ষুদিরাম, বারীন ঘোষ, উল্লাস কর, পুলিন দাস প্রভৃতির নাম মনে আছে নিশ্চয়?

তারা তো দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। তাই বলে ঠাকুরপো সেই দলে মিশবে বিশ্বাস করতে পারি না। আর বিপ্লবী হলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ধ্যান করবে কেন?

ওটাও ওদের সাধনার অঙ্গ।

দক্ষিণেশ্বর তো ঠাকুরের স্থান!

রুক্মিণী, ঠাকুরের মতো, স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাবিপ্লবী কম জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাঁরা কি মানুষ মেরেছেন?

মানুষ মারাই কি বিপ্লবের একমাত্র লক্ষণ?

না না, ঠাকুরপো ও পথে কখনো যাবে না। সে মাছমাংস পরিত্যাগ করেছে, ব্যায়াম করে, না হয় আর একটু এগিয়ে ধ্যানধারণা করলো—তাই বলে রক্তপাত! না, না।

না হয় ভালোই, তবে আমার সন্দেহ দূর হচ্ছে না।

সন্দেহ হয় হোক, শীগগির ওর বিয়ে দিয়ে ফেলো। আর দেখো তোমরাও তো এক সময় দেশের কাজ করেছো, জেলে গিয়েছো।

সকলের তো এক পথ নয়—ঠাকুরের কথা ভুলে গেলে, যত পথ তত মত।

ঠাকুর মাথায় থাকুন। তুমি আজই তারাচরণ উকীলের মেয়ের সঙ্গে প্রস্তাব করে তোমার মাস্টারমশাইকে লিখে পাঠাও, তিনি যেমন করে বলা উচিত বাবাকে বলবেন।

আচ্ছা দেখি।

যখন শচীন ও রুক্মিণীর মধ্যে এইসব কথাবার্তা চলছিল সেই গ্যাসের আলো জ্বলেনি অথচ আবছায়া অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে সেই গা-ঢাকা প্রদোষে আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরে সুরভি ভাণ্ডার নামে মিষ্টান্নের দোকানের সম্মুখে ফুটপাতের উপরে দাঁড়িয়ে সুশীল অপেক্ষা করছিল, তার দু' হাতে দুটো কমলালেবু। এ সমস্তই সংকেতের অঙ্গ। এমন সময়ে লম্বা মতো একটা লোক সম্মুখ দিয়ে টানাপায়ে চলে যেতে যেতে বলল, একশ চার। উত্তরে সুশীল বলল, একশ চার। লোকটি বলল, এসো। সুশীল তার পিছুপিছু চলল।

বত্রিশ

লোকটা লম্বা লম্বা ধাপ ফেলে সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। হ্যারিসন রোড পার হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটের ডান ফুটপাতে গেল, ডাকঘর পার হয়ে সেন্ট পল্‌স কলেজের চত্বর অতিক্রম করে, অতিক্রম করে কার্তিক বোসের ওষুধের দোকান, মেছুয়াবাজার স্ট্রিট পুলিশের থানা, ঢুকে পড়লো একটা পার্কে, সুশীলও ঢুকেছে। পার্কের পুব-দক্ষিণ দিকটা অন্ধকার মতো, থানার মধ্যেকার বড় বড় বাদাম আর তেঁতুল গাছগুলোর ছায়া এসে পড়ায় গ্যাসের আলো সেখানটায় নিস্তেজ। লোকটা ইঙ্গিত করলো সুশীলকে বেঞ্চিখানায় বসতে, নিজে দাঁড়ালো পিছনে, সুশীল বুঝলো লোকটা চায় না তার মুখ দেখতে পায় সে। এ বারে আরম্ভ হল প্রশ্নোত্তরের পালা।

রমণী এখনো তোমাদের বাসায় যাতায়াত করছে?

হাঁ।

নিষেধ করো না কেন?

বাসা দাদার, আমার নয়।

তুমি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলায় ধ্যান করছিলে, তোমার দাদা বউদি প্রভৃতিরা দেখে ফেলেছিলেন, সঙ্গে ছিল রমণী।

জানি না।

সুশীল বুঝতে পারলো এ কণ্ঠস্বর তৃতীয় একজনের, আগেকার দুইজনের কণ্ঠস্বর অন্য ব্যক্তিদের।

রমণী গোয়েন্দা জানো?

না। সরকারের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে বলে মনে হয় না।

অন্য দলের লোক হলেও আমাদের চোখে সে গোয়েন্দা, তাকে সরিয়ে দিতে হবে।

কী উপায়ে?

প্রশ্ন করবার অধিকার তোমার নেই ভুলে যেযো না। পারবে সরিয়ে দিতে?

না।

অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সরিয়ে দেবার নানা উপায় আমরা জানি।

আপনারা করুন, আমি পারবো না।

এখনো তোমার সাধনায় সিদ্ধি হয়নি, এখনো কাঁচা আছো।

জানি না।

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে' মন্ত্র জপ করো?

করি।

তোমার উপরে গুরুতর কাজের ভার আসছে।

কবে, কি কাজ?

আবার প্রশ্ন! শনিবার সন্ধ্যায় শ্রমজীবী সমবায়ে উপস্থিত থাকবে। একজন লোক এসে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী কিনতে চাইবে, বই বিক্রি হয় না জানতে পেরে লোকটা হ্যারিসন রোড পেরিয়ে কলাবাগান বস্তি দিয়ে মার্কাস স্কোয়ারে ঢুকবে, তাকে অনুসরণ করবে। তোমার

হাতে একটা ছোট পুঁটুলি দেবে। নির্জন স্থানে খুলে দেখতে পাবে তার মধ্যে কর্তব্য নির্দেশ এবং আরও কিছু, সেই অনুসারে কাজ করবে— অন্যথা না হয়। মনে রেখো তোমার শপথ বাক্য—আর জেনে রাখো, প্রয়োজন হলে আমরা নিজ দলের লোককেও সরিয়ে দিতে দ্বিধা করি নে।

লোকটির পরবর্তী বাক্যের জন্য সুশীল অপেক্ষা করে রইলো, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন আর কথা শুনতে পেলো না, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো স্থানটা শূন্য—কাছে অদূরে কেউ কোথাও নেই। ভাবলো, একি, লোকটা ম্যাজিক জানে নাকি, হঠাৎ মিলিয়ে গেল কোথায়, কেমন করে! সহসা মনে চমক মারলো, থানায় ঢুকে পড়লো নাকি, লোকটা পুলিশের লোক নয় তো! শুনেছিল বিপ্লবী দলে অনেক পুলিশের লোক ঢুকে পড়েছিল, তারা নির্দেশ দিত আর সেই নির্দেশ পালন করতে গেলেই বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হত পুলিশের হাতে। এভাবে নাকি অনেকে ধরা পড়েছে। তখন তার মনের মধ্যে পূর্বপক্ষ উত্তর-পক্ষ আরম্ভ হয়ে গেল।

কেমন করে জানবে আমার সংকেত-সংখ্যা?

ও সব জানাই তো পুলিশের কাজ।

সংখ্যা না হয় জানলো কিন্তু স্থান, কাল?

গুপ্ত সংখ্যা যারা জানতে পারে স্থান কাল জানাও তাদের অসাধ্য নয়।

আগের নির্দেশদাতাদের মতো এ লোকটাও তো মুখ দেখতে দেয়নি।

পাছে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ হয়, সেইজন্যেই থানার কাছে নিয়ে এসেছিল যাতে অনায়াসে থানায় ঢুকে পড়তে পারে।

আর পঞ্চবটীর ব্যাপার জানতো?

এ আর বুঝতে পারছ না, অনেক দিন তোমার পিছু নিয়েছে।

আর শ্রমজীবী সমবায়ের দোকানের রহস্য?

ওখানে অষ্টপ্রহর সাদা পোশাকে, ক্রেতা-বিক্রেতারূপে পুলিশ থাকে।

বিক্রেতাদের মধ্যেও?

অসম্ভব কি! 'আধুনিক রণনীতি' নামে যে পুস্তিকা লুকিয়ে বিক্রি করতে তার খবর পেলো কি করে? বইগুলো সব বাজেয়াপ্ত হল কোন্ সূত্রে? বিজনবাবু ধরা পড়লো কেন? তোমরা চলো ডালে ডালে পুলিশের গতিবিধি পাতায় পাতায়।

তা হলে ওদের মারতে হবে।

কত মারবে? পুলিশ নিঃশেষ হওয়ার অনেক আগেই তোমাদের দল উজাড় হয়ে যাবে।

আর রমণী?

পুলিশের লোক না হতেও পারে।

তবে?

শুনলে না অন্য বিপ্লবীদলের লোকও এদের চোখে গোয়েন্দা।

কথাটা মনে লাগলো সুশীলের, সে শুনেছিল বিপ্লবীদের সংখ্যা অনেক, আর কারো সঙ্গে কারো মতে-পথে মিল নেই।

সব দলেরই যখন উদ্দেশ্য এক তবে এ রেষারেষি কেন?

এটা আর বুঝলে না। আমাদের দল দেশ উদ্ধার করবে আর তা যদি না পারে অন্তত অন্য দল যেন সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রশ্নোত্তরে যখন কূল মিলল না তার মন বিস্বাদ, বিরক্ত হয়ে অবশেষে বিদ্রোহ করে উঠল। এ কাদের নাগপাশে সে বদ্ধ করেছে নিজেকে। মনে হল তার দীক্ষা গ্রহণটাই ভুল হয়েছে। তখনো গায়ে ক্রোজেটের চাবুকের জ্বালা দগ্‌দগে ছিল তাই ক্রোধের বশে পূর্বাপর বিবেচনা না করে দীক্ষা নিয়ে ফেলে এক পরাধীনতার উপরে আর এক পরাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠল। এমন সময়ে শুনতে পেলো থানার পেটা ঘড়িতে দশটা বাজবার ধ্বনি। ওঃ, অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, বউদি ভাত পাহারা দিয়ে বসে আছে, দাদা এতক্ষণে হয়তো বইখানা মুড়ে রেখে জিজ্ঞাসা করছে সুশীল ফিরলো, আর মলি রাত জাগতে পারে না, ঘুমিয়ে পড়েছে, ভূষণদাস শোবার উদ্যোগ করছে। বাবা মা ছেলেরা পড়াচ্ছে পড়ছে ভেবে নিশ্চিন্ত আছেন। এতদিন যারা ছায়ার মতো হয়ে গিয়েছিল আজ আবার তারা কায়াময় হয়ে উঠল। সমস্ত চিন্তার ভার সবলে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দ্রুত পা চালিয়ে দিল বাসার দিকে। থানাটা পার হয়ে এসে একবার পিছনে তাকাতেই চোখে পড়লো অদূরে একটা লম্বা লোক—সেই লোক সন্দেহ নাই—দ্রুততর বেগে চলতে লাগলো সুশীল।

তেত্রিশ

আজ অল বেঙ্গল লোন আফিসের আড্ডা সরগরম, যদিচ প্রধান আড্ডাধারী তারাচরণবাবু এখনো এসে উপস্থিত হননি। যথারীতি সকলের উপরে গলা হরিপদ রায় উকীলের। বলছিল এই যে বঙ্গভঙ্গটা রদ করলাম, কী লাভ হল?

অনেকেই একসঙ্গে বলে উঠল, কেন দুই ভাই আবার এক হলাম।

দুই ভাই আবার এক হলে সত্য কিন্তু বড় ভাইয়ের অবস্থাটা ভেবে দেখেছ?

আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে।

ধিক্কারের সঙ্গে হরিপদ বলে উঠল, তেমনি আছে! তবে খুব বুঝেছ।

তুমি কি বুঝেছ বলো না?

তবে শোনো—বলে আরম্ভ করলো হরিপদ, আগে একটা আপীল নিয়ে ঢাকায় যাওয়ার সুযোগ ছিল, পাঁচ রকমে দু'টাকা আসতো—আর এখন?

কেন, কলকাতায় যাবে।

কলকাতায় যাবে! আরে বাপু, কলকাতার মহাসমুদ্রে হাঙর-কুমির-রাঘব বোয়াল থাকতে তোমাকে আমাকে ডাকবে কে?

দেখো হরিপদ তুমি সর্বদা নিজের স্বার্থের মাপকাঠি দিয়ে সমস্ত বিচার করো।

বলি বীরেন ভায়া, তোমাদের হাতে যদি বিশ্বহিতের মাপকাঠি থাকে তবে তার পরিচয় তো কখনো পাইনি।

লক্ষ্য থাকলে পেতে।

লক্ষ্য আছে বলেই পেয়েছি। গরীব মক্কেলের জন্য ভেন্ডারের কাছে স্ট্যাম্প কিনতে গিয়ে হিসাবে গোলমাল বাধিয়ে পাঁচ টাকার জায়গায় সাত টাকা আদায় করো না?

আমি না করলেও অনেকে করে স্বীকার করছি, কিন্তু তুমি যে গরীব মক্কেলের কাছা গবেষণা করে ফিসের টাকা আদায় করো।

সেটা কমার্শিয়াল মরালিটি, ব্যবসায়িক নীতি। মোট কথা এই যে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে উকীলদের সর্বনাশ হয়েছে।

হরিপদ, তোমার জগৎটা উকীল-সর্বস্ব।

তোমার মুখটা যেমন সন্দেশ-সর্বস্ব।

খুদু মৈত্র বলল, তবে এক হিসাবে তোমার কথা সত্য, ঢাকায় সন্দেশ এখানকার চেয়ে সস্তা, তাই বলে বঙ্গভঙ্গ রদটা খারাপ বলতে পারি না।

ভবানীগোবিন্দ বয়সে প্রবীণ, নির্বিবাদী লোক, বললেন, যা হয়েছে মেনে নাও। দেশসুদ্ধ লোক খুশী হয়েছে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে।

তোমরা বলছ মেনে নিলাম, কিন্তু মনে রেখো এ-ও ইংরাজের এক শয়তানী নীতি।

গলা খাটো করো ভায়া, এখনো ইংরাজ রাজত্বের লোপ হয়নি।

অনেকে আবার সেই শয়তানীর সহায়।

মন্তব্যটা নির্বিশেষ রূপ ধারণ করে এলেও কারো বুঝতে দেরি হল না যে হরিপদ তার একমাত্র লক্ষ্য।

এ হেন প্রত্যক্ষ আঘাতেও হরিপদ রাগলো না। শয়তান কখনো রাগে না, তাতে মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে তার চাল নষ্ট হয়ে যায়।

এঁদের মধ্যে প্রায় সব বিষয়েই মতভেদ, একটি মাত্র বিষয় ছাড়া। এঁরা সকলেই নিষ্কাম কর্মযোগী, উপার্জন করেন, ভোগ করেন না, আদালত থেকে বাড়ি ফিরবার পথে সারাদিনের উপার্জন লোন অফিসে জমা দিয়ে নিতান্ত খুচরো কিছু হাতে করে বাড়িতে প্রবেশ করেন। টাকার একটা বদ অভ্যাস এই যে ভোগ করলেই ফুরিয়ে যায়—মনে মনে ভোগ করলে অক্ষয় হয়ে সুদে বাড়তে থাকে। মনে মনে ভোগের অশেষ সুবিধা।

এ বারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে হরিপদ বলল, আচ্ছা তারাচরণবাবু আসুন, তিনি প্রবীণ ব্যক্তি, তাঁকে সালিশ মানবো।

এমন সময়ে ত্রিপদী অক্ষয় ফৌজদার প্রবেশ করে বলল, আর তারাচরণবাবু এসেছেন! হরিপদর উক্তি তার কানে গিয়েছিল।

কেন অসুখবিসুখ নাকি?

এখন মনে হচ্ছে আজ যেন তাঁকে আদালতে দেখিনি।

ফৌজদার লাঠিখানা দেয়ালের কোণে সযত্নে রক্ষা করে বলল, অসুখও নয় বিসুখও নয়—সুখ সুখ, মহাসুখ।

ছেলেটির বিয়ে বুঝি স্থির হয়ে গেল?

ছেলের বিয়ে মহাশত্তুরের (তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে নিয়ে বলল) প্রতিবেশীর হোক।

আহা কি হয়েছে খুলেই বলো না।

তার মেয়েটির বিয়ে স্থির হয়ে গেল।

ওই মেয়ের?

এ তোমার শোনা কথা ফৌজদার।

অক্ষয় ফৌজদার শোনা কথা বলে না।

বেশ, তবে বিস্তারিত করে বলো।

পাত্রটি কে?

যজ্ঞেশবাবুর ছোট ছেলে সুশীল।

কী বাজে কথা বলছ!

বাজে মনে করে সান্ত্বনা পাও ভালোই, তবে যা ঘটেছে বলছি। আজ সকালে অবিনাশবাবু আর যজ্ঞেশবাবু দু'জনে গিয়ে তারাচরণবাবুর মেয়ের সঙ্গে সুশীলের বিয়ের প্রস্তাব করে সম্বন্ধ পাকা করে এসেছে।

একেবারে পাকা!

কাঁচাও নয় ডাঁসাও নয়, একেবারে পাকা।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধ করি এমন সর্বনাশ হত না এই সুসংবাদ শ্রবণে সকলে হতবুদ্ধি হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কেবল ধ্বনিত হতে লাগলো দেয়াল-ঘড়িটার টিকটিক শব্দ, সে শব্দও যেন ধিক্ ধিক্ শব্দের বিকার।

কিছুকাল আড্ডাধারীগণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো তবে যেহেতু অনন্তকাল কিছুই স্থায়ী হয় না, সকলে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো আর সেই সমবেত উর্ধ্বোত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস ঘরের ছাদে গিয়ে আঘাত করলো আর সেই আঘাতে ছাদে সংলগ্ন একটি টিকটিকি স্থানচ্যুত হয়ে ফরাসের উপরে সভ্যগণের মাঝখানে পড়লে সকলে চমকে উঠলো। চমক ভাঙলে ফৌজদার বলে উঠলো, 'সভার মাঝে পড়লে জেঠি শুভলক্ষণ নয়কো সেটি' স্বয়ং খনার উক্তি। জেঠি জানো তো, টিকটিকিকে দৈবজ্ঞগণ বলে চালের জেঠি।

হরিপদ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, এখন খনার উক্তি রাখো তো। শেষে তারাচরণ উকীলের ঐ কালো কুৎসিত মেয়ের বিয়ে কিনা সুশীলের সঙ্গে, কেন শহরে কি আর বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল না! এই তো আমাদের বীরেন ভায়ার মেয়ে আছে মাধুরী।

বীরেন বলল, আমার মেয়ের কথা রাখো ভাই, অত বড়লোকের ঘরে মানাবে না।

তুমিই বা কি কম, তিন পুরুষের বনেদী ঘর, যজ্ঞেশ রায়ের বাপকে কে চিনতো!

ফৌজদার বলল, কলি, কলি, ঘোর কলি, আমি বলছি নিশ্চয় জেনো এর মধ্যে রহস্য আছে।

ঐ তোমার মস্ত দোষ ফৌজদার, সব তাতেই রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা।

তুমি তার কি বুঝবে মিত্তির, তোমার সন্দেশ পেলেই আনন্দ।

আরে যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোক সন্দেশ জুটবেই। যাই হোক বিয়ে হলে মেয়েটা খেয়ে বাঁচবে।

তা যা বলেছ মিত্তির, তারাচরণ ঘরে নিত্য দু'বেলা ট্যাঁড়শভাজা আর ডাল, আর এদিকে ব্যাঙ্কে পচছে আড়াই লাখ টাকা। ফৌজদার না জানে কি?

দেখো ফৌজদার, ঐ যে কথায় বলে দায়ী মোৎদায়ী রাজি, কি করবে কাজী! পাত্রের বাপ পাত্রীর বাপ রাজি হয়েছে, তুমি বৃথা বুক চাপড়ে বুকে ব্যথা করে ফেলে সারা রাত ধরে পুরনো ঘি মালিশ করে মরবে। এখন থামো তো।

থামছি চৌধুরী মশাই থামছি, কিন্তু দেখবেন এর পরিণাম ভালো নয়।

এখন পরিণামের উপরে ভার দিলে পরিণামের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আর অপেক্ষা করতে গেলে আড্ডা জমে না। সবাই আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়লো।

এদিকে এই সংবাদে তারাচরণ এতই আত্মহারা হলেন যে আদালত থেকে সোজা বাড়ি ফিরে গৃহিণীর হাতে গোটা একখানা দশ টাকার নোট দিলেন। এতেই তাঁর বিহ্বলতার মাত্রা বুঝতে পারা উচিত। গৃহিণী তো তারাচরণের গৃহিণী, তিনি নোটখানি মেয়ের কপালে ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ মা-লক্ষ্মীর তহবিল-ভুক্ত করে ফেললেন। রাতে খেতে বসে তারাচরণ ব্যঞ্জনাদির কিছু আতিশয্য আশা করছিলেন কিন্তু পাতে যখন নিরন্তর ট্যাঁড়শভাজা আর ডাল ছাড়া কিছু পড়লো না, একবার মাত্র গৃহিণীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আহারে মনোনিবেশ করলেন, গৃহিণীর মিতব্যয়িতায় খুব যে অখুশী হলেন এমন মনে হল না। আহারান্তে সশব্দে একটি উদ্‌গার তুলে বলে উঠলেন, আঃ—ভাতটা খেলাম বটে! ব্যাঙ্কে যার নগদ আড়াই লক্ষ টাকা গচ্ছিত ট্যাঁড়শভাজা ডাল তার কাছে রাজভোগ।

ওদিকে লোন আফিসের সভ্যগণ নিজনিজ বাড়ির দিকে রওনা হল। ফৌজদার মাঝপথে একবার থেমে সিদ্ধেশ্বরীতলার দিকে তাকিয়ে ছড়িসুদ্ধ হাত দু'খানা কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করলো, সিদ্ধেশ্বরী মা, তোমারই চরণতলায় পড়ে আছি, একটু হিসাব করে বিচার করো মা।

হরিপদ অনুরূপ প্রার্থনার উদ্যোগ করলো, এমন সময়ে মনে পড়লো তার ছোট মেয়েটি একজন ধনী মক্কেলের সঙ্গে বের হয়ে গিয়েছে। কপালে উত্থিত প্রায় হাত দু'খানা নামিয়ে নিয়ে দ্রুত চলতে আরম্ভ করলো—ফৌজদারের ডাকাডাকিতে সাড়া দিল না।

চৌত্রিশ

ভোররাতে ঘুম ভাঙতেই সুশীলের মনটা বিকল হয়ে গেল—মনে পড়লো আজ সেই দিন যখন বিকালবেলায় শ্রমজীবী সমবায়ে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর খদ্দের আসবে, যাকে অনুসরণ করে যেতে হবে মার্কাস স্কোয়ারে। কিছু নির্দেশ ও ছোট একটি পুঁটুলি দেবে লোকটা। কি নির্দেশ দেবে, কি থাকবে পুঁটুলিটার মধ্যে! গুরুতর নিশ্চয় কিছু। তার কেমন ধারণা হয়েছিল দলের কর্তারা তার উপরে খুব প্রসন্ন নয়—কর্তা কারা জানতো না, দলের অন্য কেউই জানতো না। এমনি মন্ত্রগুপ্তি। শপথ ভঙ্গ করলে বিষপান করে মৃত্যু বরণ করতে হবে স্বকণ্ঠে এই শপথ করেছিল। তারই নির্দেশ। না, আরও কিছু গুরুতর। কাউকে হত্যা করবার নির্দেশ। সে নির্দেশ পালন না করলে দলের হাতে মৃত্যু। সেদিন লোকটা বলেছিল যে প্রয়োজন হলে নিজের দলের লোককেও সরিয়ে দিতে জানে তারা। বুঝলো যে দিকেই যাক তার রক্ষা নাই। কী ফাঁদেই সে পা দিয়েছে।

যখন সিদ্ধেশ্বরী তলায় গীতার কর্মযোগ সম্বন্ধে পাঠ নিতো, নিষ্কাম কর্মের মর্মব্যাখ্যা শুনতো, শুনতো যে ধর্মযুদ্ধে অরিকে হত্যা করায় পাপ নেই, বরঞ্চ না করাই পাপ, মানুষ মারা অত্যন্ত সহজ মনে হত। আজ যখন সেই সম্ভাবনার দিগন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা দিল, মনটার মধ্যে আর সায় দিল না। দুই পক্ষের হাতে অস্ত্র থাকলে মুখোমুখি হয়ে হত্যা করা বা নিহত হওয়া সহজ, কিন্তু এক পক্ষ যখন নিরস্ত্র এবং অনবহিত অতর্কিতে তাকে হত্যা করা সে-ও কি ধর্ম! আর না করা সে-ও কি অধর্ম! এ কেমন শিক্ষা! উপদেষ্টার মুখে শুনেছিল অপর পক্ষকে নিরস্ত্র মনে হলেও নিরস্ত্র নয়—কারণ সরকারের সমস্ত শক্তি বড়লাট থেকে গাঁয়ের চৌকিদারটা অবধি সমস্তই তার পিছনে, তুমিই বরঞ্চ একক আর অসহায় আর এ হত্যা তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়—দেশের স্বার্থ জড়িত তার সঙ্গে। অতএব ধনঞ্জয় ক্লৈব্য পরিত্যাগ করে উত্তিষ্ঠ হও, ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ করো। এ সমস্ত তখন সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। কিন্তু তখনই মনে পড়লো ধনঞ্জয় তো নিরস্ত্র অরিকে হত্যা করেনি, একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিল। আর তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না তাই বা কি করে বলা যায়। রাজ্যলাভ হলে তারও তো অংশ থাকতো তার মধ্যে। মনে হল ভুল, ভুল, সমস্তই ভুল। পুরাকালে কখন কি ঘটেছিল তার নজির টেনে এ কালে কি কাজ করা উচিত! কিন্তু এখন তো নিরুপায়। যতই টানাটানি করবে ফাঁসের গ্রন্থি ততই শক্ত হয়ে আঁটবে গলায়। সুশীল অনেকবার ভেবেছে আত্মহত্যা করে এই দুরপনেয় জঞ্জাল সাফ করে ফেলবে—তখনই আবার শাস্ত্র-বাক্য মনে পড়েছে, আত্মহত্যা মহাপাপ। আজ এই ভোর রাত্রে মনে হল মহত্তর পাপ নরহত্যা। মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক বৃত্তি নরহত্যার বিরোধী বলেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ঘাতককে প্রস্তুত করে তুলতে হয়। সে জানতো অনেক ঘোরতর বিপ্লবী যাঁরা দেশের নামে নরহত্যা করেছেন, হয় তাঁরা ফাঁসি গিয়েছেন—নতুবা সন্ন্যাস গ্রহণ করে বাকি জীবন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। নইলে এত সংখ্যক বিপ্লবীর সন্ন্যাস গ্রহণের আর কি কারণ থাকতে পারে। সে বেশ অনুভব করলো আগুনের বেড়ার মধ্যে সে দণ্ডায়মান—পলায়নের পথ নেই। একমাত্র পথ মৃত্যু। আজ সেই পথের সম্মুখ দণ্ডায়মান হতে চলেছে সে।

এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়লো, ঠাকুরপো, চা। সকালবেলাকার চা জোগানোর ভার রুক্মিণীর উপরে, মলিনার ঘুম কিছু বেলায় ভাঙে।

তাড়াতাড়ি উঠে চায়ের বাটি হাতে নিয়ে বলল, বউদি, বোসো।

কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে রুক্মিণী বলল, আজ ঠাকুরপোর হল কি, অনেকদিন তো বসবার হুকুম পাইনি—মনে হচ্ছে বউদিকে আজ যেন নতুন দেখতে পেলে।

সুশীলের মনে হল নতুনই বটে কারণ হয়তো আজই শেষ। শেষের পরে তো আর কিছু নেই—কাজেই তার চেয়ে নতুন আর কি হতে পারে। নতুন ও শুরু মুখোমুখি মিলে একটি কালবৃত্ত সৃষ্টি করে, মহাকালের সেটা অঙ্গদ।

রুক্মিণীর বিস্ময় দেখে সুশীল বলল, তুমি বুঝবে না বউদি।

বুঝেছি গো মশায় বুঝেছি, কানে গিয়েছে যে সুশীলবাবুর বিয়ের জন্য বউদি উদ্যোগী হয়েছে।

আমার আবার বিয়ে—বলে হাসলো সুশীল। সে হাসি বিদায়ের। রুক্মিণী অতশত বুঝলো না, সে ভাবলো বিবাহের প্রস্তাবে নবযুবকের লজ্জার হাসি।

জলখাবারের টেবিলে বসে শচীন বলল, হাঁ রে, তোকে আজ কয়দিন থেকে মনমরা দেখছি কেন রে?

তুমি তো মনমরা দেখছ—আমি আজ ভোরে চা দেবার সময়ে মরা গাঙে চাঁদের আলো দেখতে পেয়েছি।

সব সময়ে তোমার চোখে চাঁদের আলো পড়ে—আমি তো ওর ম্লানমুখ ছাড়া কিছু দেখতে পাই না।

তোমার যেমন কথা। ছোট ভাই বিয়ের কথা শুনে বড় ভাইয়ের সম্মুখে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করবে! এই দেখো না কেন, তোমার ছোট বোনটি নাম সার্থক করে সর্বদা মলিন মুখে থাকে—কিন্তু "র" অক্ষরটি শোনবা মাত্র আর তর সয় না, মুখের হাসি চাপবার দুরাশায় পাশের ঘরে পলায়ন করে।

আবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন বউদি?

না ভাই, আগে তোমার অগ্রজের মাথাটি খাই, তার পরে তোমার সম্বন্ধে কোনো একটা রমণীয় ব্যবস্থা করবো।

কারও বুঝতে বাকি রইলো না যে রমণীর কথা হচ্ছে। মলিনা উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

সুশীল শুধালো, তোমরা কি রমণীর সঙ্গে ওর বিয়ের চেষ্টা করছ নাকি?

বিশেষ চেষ্টা করতে হচ্ছে না ভাই, দুই পক্ষই বেশ নরম হয়ে আছে।

রমণী যোগ্য পাত্র কি না খোঁজখবর নিতে হয়।

যতদূর খোঁজ নেওয়া সম্ভব জেনেছি, অযোগ্যতার কোন কারণ নেই—এবারে উত্তর দিল শচীন।

সুশীল কি বলবে ভেবে পেলো না—বলতে গেলে শপথ ভঙ্গ করে গোপন কথা বলতে হয়—অশুভস্য কালহরণং নীতি অবলম্বন করে বলল, পরীক্ষাটা পাস করুক না।

আর তোমার পক্ষে বুঝি তার প্রয়োজন নেই?

কি বাজে বকছ বউদি। আমার বিয়ের জন্য চেষ্টা কোরো না।

সবাই তো ভাই তোমার দাদার মতো সৌভাগ্যবান নয় যে বিনা চেষ্টাতেই জুটে যাবে।

কি মুশকিল, আমার বিয়ে দিচ্ছে কে?

কে নয়। তোমার বাবা-মা, আমার বাবা-মা, মেয়ের বাবা-মা আর তোমার দাদা স্বয়ং।

দাদার সম্মুখে নিজের বিয়ের আলোচনা করা সুশীলের স্বভাববিরুদ্ধ, তবু আজ স্বভাবকে অতিক্রম করে বলল, দাদা, আমার বিয়ের চেষ্টা কোরো না।

কথাটাকে লঘুভাবে গ্রহণ করে শচীন বলল, আচ্ছা সে দেখা যাবে—এখন কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হ গিয়ে।

এমন সময়ে নীচে থেকে ভূষণ এসে শচীনের হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল। শচীন খুলে দেখলো তারাচরণবাবু স্বয়ং সানন্দে বিয়েতে সম্মতি জানিয়েছেন। রুক্মিনী হাত থেকে

টেলিগ্রাম কেড়ে নিয়ে সুশীলের ঘরে প্রবেশ করে বলল, কাজের কথা, দেখো ভাই বউদি সব সময়ে বাজে বকে না।

সুশীল এক নজরে পড়ে নিয়ে বলল, কাজটা ভাল করলে না বউদি।

ভালো কি মন্দ ফলেন পরিচীয়তে।

গাম্ভীর্যের মাত্রা চরমে উঠিয়ে দিয়ে সুশীল বলল, আমিও তা-ই ভাবছি।

তবে অপেক্ষা করে থাকা যাক।

সুশীল কলেজে রওনা হওয়ার সময়ে প্রণাম করে বলল, চললাম বউদি।

ওকি কথা ভাই, বলো আসি।

সুশীল মনে মনে বলল—ফাঁসি।

শচীন আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। সুশীল রওনা হয়ে গেলে মলিনা বলল, বউদি, ছোটদা আজ তোমাকে প্রণাম করে গেল কেন, কলেজে যাওয়ার সময় তো কখনও প্রণাম করে না!

আজ কি অন্য দিনের সঙ্গে তুলনা হয়! আগেকার দিন হলে হীরের কণ্ঠি জুটতো।

না বউদি, ছোটদাকে আমি তোমার চেয়ে বেশি দিন দেখছি, এমন বিষণ্ণ কখনো দেখিনি। ওর মনের মধ্যে একটা কিছু আছে।

ও কাউকে বিয়ে সম্বন্ধে কথা দিয়ে ফেলেনি তো?

কেমন করে বলবো!

নিজের মন দিয়ে বুঝে বলো।

আবার আমাকে কেন এর মধ্যে টানাটানি?

তুমি কাউকে কথা দাওনি তো? বেশ, সেটাই খুলে বলো, তা হলে নির্ভয়ে এগোনো যায় রমণীর দিকে।

তোমার কি আর কাজ নেই?

ঠাকুরপো ঠাকুরঝির বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি কাজ থাকতে পারে বউদিদের?

কেন শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করে জেলে যাওয়া?

সেটা আপাতত হাতে রইলো।

কিন্তু ভাই বউদি, ছোটদার ম্লান মুখ আর প্রণাম করে যাওয়া আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

তোমার ভয় হচ্ছে সন্ন্যাসী হয়ে বের হয়ে যাবে?

আশ্চর্য কি।

তুমিও কি সন্ন্যাসিনী হবে নাকি?

তাতেই বা আশ্চর্য কি।

না মলিনা, আজ আনন্দের দিনে মুখ ভার করে থেকো না।

না, চলো।

এই বলে দুজনে গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হল—তবু মলিনার মুখে ভয়, রুক্মিণীর মুখে সংশয় মাঝে মাঝে উঁকি মারতে লাগলো।

বিধাতাপুরুষ নির্মম বলেই বিশ্বনাট্য এমন জমে ওঠে।

পঁয়ত্রিশ

শ্রমজীবী সমবায়ে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী কিনতে যে লোকটা এসেছিল তাকে অনুসরণ করে সুশীল যখন গিয়ে পৌঁছল মার্কাস স্কোয়ারে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এসেছে, লোক দেখা যায়, চেনা যায় না। মার্কাস স্কোয়ার নামেই স্কোয়ার কিন্তু যেমন হৃতশ্রী তেমনই নির্জন, আগাছায় ভরতি, চারিদিকে ঘন বসতি, সন্ধ্যার পরে সেখানে আসতে ভয় করে। সুশীলকে পৌঁছে দিয়ে লোকটা কোথায় কোন্ দিকে চলে গেল। সুশীল হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পরে শুনতে পেলো কে যেন পিছন থেকে বলছে , এসো, আমার সঙ্গে এসো।

সুশীল পিছন ফিরে দেখলো আমহার্স্ট স্ট্রীট থানার কাছে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই লোকটা, সেই কণ্ঠস্বর, মাথায় সেই খাড়াই।

সুশীল বলল, এ নির্দেশ নূতন, সে দিন নির্দেশ পেয়েছিলাম এখানে এলে একটা পুঁটুলি পাবো, কোন্‌টা শুনবো?

এখন যা বলছি।

তখন অন্য রকম বলেছিলেন। আপনি যে আমাদের দলের লোক নিশ্চয়তা কি?

কি, আমাকে সন্দেহ?

সব লোককে, সব নির্দেশকে যাচাই করে নেবার উপদেশ পেয়েছি।

উত্তম, তবে যাচাই করে নাও।

এমন কোন সংকেতবাক্য বলুন যা আমরা ছাড়া আর কারো জানবার কথা নয়।

দামড়া ফলে আমড়া গাছে।
আমরা বলি না
কৎলু খাঁয়ের কাটবো গলা
কোথায় পাবো দা।

এবারে বিশ্বাস হল তো?

হাঁ, হয়েছে।

তবে আমার সঙ্গে এসো।

দীক্ষার পরে প্রত্যেক দীক্ষিতকে একটি কাগজের খণ্ড দেওয়া হতো, যাতে লিখিত থাকতো আজগুবী একটা ছড়া, কোন দুটি ছড়া এক রকম নয় এটাই দীক্ষিতদের বীজমন্ত্র। যে কোন ব্যক্তি এই ছড়া উচ্চারণ করলে তার নির্দেশ গুরুবাক্য রূপে পালনীয়।

সেই লোকটাকে অনুসরণ করে আঁকাবাঁকা নানা গলিঘুঁজি পার হয়ে সংকীর্ণ একটা গলির মধ্যে জীর্ণ একটা দোতালার বাড়ির সম্মুখে এসে সুশীল উপস্থিত হল। দরজায় টোকা দিল লোকটি, অমনি ভিতর থেকে একজন দরজা খুলে দিল, সুশীলের মনে হল শ্রমজীবী সমবায়ে গিয়েছিল সে।

চলো ভিতরে, দোতালায় যেতে হবে।

বাড়ির জীর্ণতা দেখে সুশীলের মনে হল বাড়িটা জব চার্নকের আগে তৈরি হয়ে থাকতে পারে, পরে নিশ্চয় নয়।

এই ঘরটায় আজ রাতে থাকবে, আজ তোমার সংযম, কাজেই খাওয়ার হাঙ্গামা নেই। তোমার সেই পুঁটুলি এনে দিচ্ছি।

এই বলে গৃহান্তরে গিয়ে মুহূর্ত পরে ফিরে এসে একটা ছোট পুঁটুলি তার হাতে দিল।

পড়বো কি করে, ঘর যে অন্ধকার।

আমি বের হয়ে গেলেই আলো আসবে।

আপনাকে কি দেখতে পাবো না?

না, তোমার উপরে গুরুতর কাজের দায়িত্ব, পুলিশের অত্যাচারে আর কাউকে যাতে ফাঁসাতে না পারো সেইজন্য এই রকম ব্যবস্থা।

পুলিশের মার সহ্য করতে পারবো।

সেরকম মার খাওনি কখনো মনে হচ্ছে, তা ছাড়া মারেরও নানা রকম আছে, কঠোর ও মধুর।

মধুর মার আবার কি?

সে মার যেন কখনো জানতে না হয়। আলো এলে ভালো করে নির্দেশ পড়ে বুঝে নাও। আর ঐখানে মাটির কলসিতে গঙ্গাজল রইল, খেতে পারো, সংযমে জলপানে বাধা নেই।

লোকটি চলে যেতেই পূর্বদৃষ্ট ব্যক্তি একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন দিয়ে গেল।

সুশীল পুঁটুলি খুলে দেখলো একখানা নির্দেশনামা, একখানি ফটোগ্রাফ, আর ছোট্ট একটি পিস্তল। নির্দেশনামা পড়ে সুশীল দরজায় টোকা মারতেই পূর্বদৃষ্ট লোকটি এসে শুধালো, কী চান?

নির্দেশদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

লোকটি আলো নিয়ে বাইরে যেতেই নির্দেশদাতা এসে উপস্থিত হল—আবার কেন ডেকেছো?

নির্দেশ পড়লাম, মনে হচ্ছে না ফিরতেও পারি। বাসায় গিয়ে একবার বৌদিকে প্রণাম করে আসতে পারবো না?

শপথবাক্য স্মরণ করো—যতদিন না দেশ উদ্ধার হচ্ছে আত্মীয়স্বজন স্ত্রী-পুত্র পিতামাতা কেউ নেই, সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ।

কিন্তু বৌদি যে আমাকে খুব ভালবাসে।

খুবই স্বাভাবিক—সেইজন্যেই আরও বেশি নিষিদ্ধ।

আপনাদের মন বড় কঠিন।

বৎস, তরল মন নিয়ে দেশ উদ্ধার হয় না।

যদি আপনার এ নির্দেশ না মানি?

তবে ঐ পিস্তলের অন্য রকম ব্যবহার হবে।

আমাকে মেরে ফেলবেন এই তো, তার বেশি আর কি করবেন?

তার বেশিতে আমাদের প্রয়োজন নেই। নাও, এখন নির্দেশ পড়ে, ছবিতে মানুষটাকে ভালো করে চিনে নিয়ে প্রস্তুত হও। পিস্তল চালনায় তোমার নাম আছে—চাবটা ঘরেই গুলি ভরা আছে মনে থাকে যেন। শেষ রাতে আর একবার দেখা পাবে।

আলোতে ফটোগ্রাফ দেখে মনে হল পুলিশ ইনস্‌পেকটর হওয়া সম্ভব, পোশাক সেইরকম বটে। নির্দেশ হচ্ছে কালকে দুপুরবেলা দেড়টার সময়ে লোকটা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে বের হয়ে লালদীঘির পূব পাড় দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাবে—প্রত্যহ এই সময়ে তার এই অভ্যাস। তখন তার তলপেট লক্ষ করে পরপর চারটা গুলি মারবে, আর তার পরেই পিস্তলটা দিঘির জলে নিক্ষেপ করবে। পালাতে চেষ্টা করে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের উপরে ফিলিপসের প্রকাণ্ড বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়বে, বাঁচলেও বাঁচতে পারো, আর ধরা পড়লে ভুলো না যে আমরা সকলেই মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত। বন্দে মাতরম্।

নির্দেশনামায় ও নির্দেশদাতার নির্বিকার কঠোরতায় সুশীলের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তার উপরে স্বাস্থ্যবান যুবকের সারাদিনের দারুণ ক্ষুধা। আর এমন সময়ে কিনা সংযম! মনে হল নির্দেশদাতা এর মধ্যে কয়বার যে খেয়েছে তার ঠিক নাই, আবার রাতেও খাবে নিশ্চয়, আর তার বেলায় কিনা সংযম, তবে জলপানে আপত্তি নাই, বিশুদ্ধ গঙ্গাজলের ব্যবস্থা আছে—অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। আনন্দমঠ সুশীলের ভালো করে পড়া ছিল—কই সন্ন্যাসীদের সংযমের কথা তো নেই। জীবানন্দ বোনের বাড়ি গিয়ে বাড়ির সমস্ত অন্নব্যঞ্জন খেয়ে শেষ করে ফেলে আস্ত একটা পাকা কাঁঠাল খেয়ে ফেললো। তবে তো তারা ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করতে পেরেছিলো—আর এখানে গোড়াতেই সংযম। আবার মনে পড়লো গীতাতেও আছে হৃদ্য, মেধ্য, স্বাদু খাদ্য গ্রহণের উপদেশ। গীতা ও আনন্দমঠ দুয়েরই রায় সুশীলের অনুকূলে। তবে এরা কে! তার মনে পড়লো বউদি মলিনা সারাদিন ভেবে ভেবে সারা হয়েছে, দাদা হয়তো খুঁজতে বের হয়েছে, বাবা ও মা অবশ্য জানেন না, তাঁরা নিশ্চিন্ত আছেন। এমন সময় অদূরে কোথাও পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং রবে দশটা বাজলো। ওঃ, এত রাত হয়েছে! বাসার খাওয়াদাওয়া তো নটার মধ্যে মিটে যায়। তার জন্যে খাবার ঢাকা থাকে। কিন্তু আজকার নিয়ম যেন আলাদা বলে মনে হল। সে দিব্যচক্ষে দেখতে পেলো বউদি ও মলিনা খাবার কোলে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে, দাদা এখনো ফেরেনি, ভূষণ দরজা পাহারা দিয়ে হা পিত্যেশ হয়ে বসে আছে, আর গলির ওদিকে দোতালার ঘরটায় পরীক্ষার্থী ছাত্রটি মাথা দোলাতে দোলাতে সজোরে মুখস্থ করছে—Akbar The Great Mogol emperor died in 1605. প্রত্যহ ঐ উক্তিটা শুনতে শুনতে আকবর বাদশার মৃত্যু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। প্রত্যহের সংসারে যে এত সৌন্দর্য এ মাধুর্য—কই আগে তো চোখে পড়েনি! আজ কেন এমন করে মনে পড়লো! দূরে যাওয়ার আশঙ্কাতেই কী! হঠাৎ মনে হল—মৃত্যুর দূরত্বে, যার বেশি দূরত্ব আর নাই—জীবন বোধ করি চরম মধুর ও সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। এসব কথা আগে কখনো ভাবেনি সুশীল, তবে এর আগে তো কখনো মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসেও দাঁড়ায়নি।

এসব তত্ত্বচিন্তা খুব স্বাস্থ্যকর সন্দেহ নাই, তবে অপরিহার্য বাধা দারুণ ক্ষুধা। সে কালের মুনিঋষিদের আমিষনিরামিষ সিদ্ধনিষিদ্ধ কিছুতে আপত্তি ছিল না আর তার ফলেই না ব্রহ্মসূত্র ষড়দর্শন প্রভৃতির উদ্‌ভব। শূন্য উদর শূন্যতা মাত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুশীলের মনে যে-সব চিন্তা নীহারিকা রূপে ছিল গুছিয়ে বললে তা কতকটা এই রকম দাঁড়ায় বটে।

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, উঠে গিয়ে এক ঘটি জল পান করলো—তবু ভালো যে মনটা সংযমের অনুকূল করবার উদ্দেশ্যে কলসীতে গরম জল রক্ষিত হয়নি। জলপান করে শরীর শীতল হতেই বর্তমান অবস্থায় ক্ষুধার একমাত্র বিকল্প নিদ্রা এসে তাকে অভিভূত করে ফেলল। ক্ষুধা শয়তানের সৃষ্টি, নিদ্রা দেবতার।

ছত্রিশ

ভোরের আলো হওয়ার আগেই ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল সুশীলের। ঘুমোবে না বলে দেয়াল ঠেসান দিয়ে বসে ছিল, সেই অবস্থাতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখল সম্মুখে সেই লম্বা লোকটি। লোকটি বলল, আজ তোমার চরম পরীক্ষার দিন, যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো, অনেক কথা বলবার আছে। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলে লোকটি বলল, বসো, এসো বন্দেমাতরম্ সংগীত গাওয়া যাক। দু'জনে গাইতে শুরু করলো সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্। সুশীল দেখল লোকটি সুকণ্ঠ, আর বন্দেমাতরম্ এমন এক সংগীত যে সুকণ্ঠের অপেক্ষা রাখে না। গান গাওয়া শেষ হলে লোকটি আবার বলল, নাও জপ করো। জপের মন্ত্র জানতো সুশীল—সে মনে মনে জপ করতে লাগলো, নানা সংকটের সম্মুখে সে জপ করেছে—আজ তো চরম সংকট। তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। জপ শেষ হলে লোকটি বলল, কালকে যা বলেছি আজ আর একবার মনে করিয়ে দি। নাও, তার আগে একটু দুধ পান করে নাও। আগের দিনে দেখা সেই লোকটি এক বাটি দুধ, এক গেলাস জল রেখে গেল। ঈষদুষ্ণ দুধ পান করে নূতন বল লাভ করলো সুশীল। ভোরের হাওয়া, নিদ্রার আবাম, দুগ্ধের অমৃত সবসুদ্ধ মিলে তার মনে নবীন আশার সঞ্চার করলো, তা ছাড়া হিংসার নিজস্ব একটা মাদকতা আছে, তার মনে হল কিছুই তার পক্ষে অসম্ভব নয়, মনে হল গতকল্য রাতে যে-সব দুশ্চিন্তা তার মনে প্রবেশ করেছিল সে-সব শয়তানের হস্তক্ষেপ। অনুতাপ হল সেই চিন্তাকে মনে প্রশ্রয় দিয়েছিল বলে, কেন তখন জপের মন্ত্রটা মনে পড়েনি—আজ আর তার ভুল হবে না।

শোনো, এর পরে আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না, যা বলছি মনে রেখো। এই ঘর থেকে বের হয়ো না, এ ঘর সম্পূর্ণ নিরাপদ। এখান থেকে থানার পেটা ঘড়ির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। বারোটা বাজা শুনলে বের হয়ে পড়বে; কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে গিয়ে স্ট্র্যান্ড রোডের ট্রামে চাপবে; চিৎপুরের মোড়ে নেমে লালদীঘির ট্রামে চেপে লালাদীঘির স্টপে নেমে বাগানের মধ্যে ঢুকবে; অন্য কোনো পথ ধরবে না, বা দেরী করবে না। দীঘির ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে থাকবে যেন তুমি বিশ্রাম করছ। দেড়টার কাছাকাছি দেখতে পাবে ফটোগ্রাফে মুদ্রিত চেহারার এক ব্যক্তি রাইটার্স থেকে বেরিয়ে দীঘির পুব দিক বরাবর দক্ষিণ দিকে চলেছে। লোকটা দীঘির কাছে এসে পড়লে ধীরে উঠে গিয়ে তার তলপেট লক্ষ করে পরপর চারটা গুলি মারবে, আর তার পরেই পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে দিঘির জলে। এই শেষের কথাটা বিশেষ ভাবে মনে রাখবে, কারণ পিস্তল পুলিশের হাতে পড়লে আমাদের দলকে ধরতে তাদের কষ্ট হবে না, এ সব সরকারী পিস্তল, নম্বর দেখলে কবে কোথায় খোওয়া গিয়েছে জানতে পারবে। এই পর্যন্ত বলে লোকটা থামলো।

সুশীল শুধালো, তার পরে?

তার পরে আর নেই। পালাতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে পড়বে, আরম্ভ হবে উৎকট পীড়ন, ইচ্ছা থাকলেও আমাদের ফাঁসাতে পারবে না, কারণ আমাদের নাম ধাম তোমার অজানা, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ এত সতর্কতার কারণ, মন্ত্রগুপ্তি সিদ্ধিলাভের প্রধান সহায়।

মামলা হলে সাহায্য করবেন কি?

সে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে লোকটি বলল, এবারে আমি চললাম, আলো হলে আমার মুখ দেখতে পাবে। মনে রেখো বিশ্বাসঘাতকের নিস্তার নেই আমাদের হাতে।

আমাকেও অবিশ্বাস! অভিমানের সুরে বলল সুশীল।

তুমি কে? তুমি দাবার ছকের একটা বোড়ে মাত্র।

আপনি তো চালক।

না, আমিও আর এক বোড়ে।

তবে পরিচালক কে?

আমরা কেউ জানি নে, খুব সম্ভব তিনি হিমালয়বাসী মহাপুরুষ, আনন্দমঠের কাহিনী স্মরণ করো।

এ দাবা খেলছেন কারা?

এক দিকে মহাকাল, আর-এক দিকে—না, আর নয়, ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। এই পর্যন্ত বলে বিনা উপসংহারে লোকটি প্রস্থান করলো।

সুশীল মনে মনে বলল, আর এক দিকে শয়তান! না, শয়তানও তো চিরন্তন। তবে কে! খণ্ডকাল, না, ইংরাজ, না, আমার অদৃষ্ট! সে ভাবলো, না, আর চিন্তাস্রোতে আত্মসমর্পণ করবে না—আর সকলেরই অন্ত আছে—চিন্তা ছাড়া।

অদূরে থানার ঘড়িতে একটার পরে একটা ঘণ্টাজ্ঞাপক আওয়াজ বেজে যেতে লাগল। সে বসে শুনছে আর গুনছে। পাছে ঘরের কথা মনে পড়ে যায় তাই জপ আরম্ভ করলো। কিন্তু দেখতে পেল মন্ত্রগুলো নীরন্ধ্র নয়—কোন্ ফাঁক দিয়ে বউদির কথা, মলিনার কথা, দাদার কথা, বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। অনভিজ্ঞ সুশীল জানতো না যে সাধনার আসন জীবনব্যাপী, মন্ত্র কি নীরন্ধ্র হবে দুদিনের সামান্য জপতপে!

ঐ বারোটার ঘড়ি পড়লো। উঠে পড়লো সুশীল, যথানির্দিষ্ট ট্রামে চাপলো। ট্রাম ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে, ট্রামের যাত্রী, পথের জনতা, গাড়িঘোড়া এসব যেন আর এক জগতের দৃশ্য, সুশীল তার মধ্যে থেকেও আলাদা। ব্যস্ততার মধ্যে কারো সময় নেই তার মুখের দিকে তাকাবার, তাকালে কি দেখতে পেতো জানি না, হয়তো দেখতে পেতো এ মানুষটা রক্তমাংসের মানুষ নয়—মানুষের মরীচিকা মাত্র।

ট্রাম বদলিয়ে যথাসময়ে লালদীঘির স্টপে নেমে বাগানের মধ্যে ঢুকে দীঘির পুবদিকে একটা গাছের ছায়ায় বসলো। দেখলো এমন ছায়াশ্রয়ী আরও লোক, তাদের থেকে সুশীলের পার্থক্য বুঝবার উপায় ছিল না। একটা চিনেবাদামঅলার কাছ থেকে চার পয়সার চিনেবাদাম কিনে খোসা ছাড়িয়ে মুখে দিতে গিয়ে মনে পড়লো দুধ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া

তার নিষিদ্ধ। বাদামের ঠোঙাটা একটা লোককে দিতে উদ্যত হলে সে বলল, আমি ভিখারী নই, আফিসের পিওন। তখন সে খোসা ছাড়িয়ে বাদামগুলো ছড়াতে লাগলো আর চড়ুই কাক শালিখের দল খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করলো। একসময় বাদাম শেষ হয়ে গেল, পাখীগুলো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে উড়ে চলে গেলো। এমন সময়ে বড় ডাকঘরের ঘড়িটার দিকে নজর পড়তে দেখল একটা বেজে পনেরো মিনিট। আর সময় নাই, কিংবা সময় আসন্ন। তার ইচ্ছা হল আর একবার ফটোখানা দেখে নেয়, লোক চিনতে পাছে ভুল করে। কিন্তু ফটোখানা রেখে দিয়েছিল সেই লোকটা, বলেছিল বাজে কোন চিহ্ন থাকবে না তোমার কাছে—পিস্তলটাও নয়—সেটা যাবে দীঘির অতল জলে।

ঐ তো একটা সাহেবী পোশাক পরা লোক আসছে, সেই চিহ্নিত সময়ে, সেই চিহ্নিত পথে, এই সেই লোক ভুল নেই। লোকটা সুপুরুষ, বয়স চল্লিশের নীচে, নিঃসংশয়ে চলেছে, এখনই সমাপ্তি ঘটবে সব সংশয়ের। একবার পলকের জন্য মনে হল লোকটারও স্ত্রীপুত্রকন্যা আছে—হয়তো বা স্নেহময়ী বউদিও। তখনই জপ করলো তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম....। সে দাঁড়িয়ে উঠলো, ট্যাক থেকে পিস্তলটা হাতে নিল, অবশ্য হাতটা রইলো কামিজের তলে। হাঁ, এখান থেকে গুলি চালালে তলপেটে বিদ্ধ হবে....আর একটু কাছে আসুক। এমন সময়ে পিছনে চোখ পড়তেই দেখতে পেলো গন্ধরাজ গাছটার আড়ালে সেই লোকটার মাথা। সে ভাবলো মরতে যাচ্ছি তবু অবিশ্বাস, এত অবিশ্বাস...পাহারা দিতে এসেছে....এই ক্ষীণ বিশ্বাসের ডিঙি নৌকোয় পার হবে এরা দুস্তর সমুদ্র! সে স্থির করে ফেলল—তিনটা গুলি মারবে লোকটার দেহে, চতুর্থটা দিয়ে শেষ করে দেবে নিজের জীবন, বেঁচে থাকলেও একদিন না একদিন কোন অজ্ঞেয় কারণে ওদের হাতেই মরতে হবে, তার চেয়ে....এই বারে পরপর চারটা গুলি মারল লোকটার তলপেটে, রক্ত ছিটিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা, নিঃসাড় নিস্পন্দ। কি করলো সে, মনের ঝোঁকে চারটা গুলিই মারলো ওকে, নিজের জন্যে কিছু রইলো না। হাতের পিস্তলটা নিক্ষেপ করলো দীঘির মধ্যে—পড়লো অগভীর জলে।

কয়েক জন পুলিশ অদূরে দাঁড়িয়ে খৈনি টিপছিল, যখন দেখল হাতে পিস্তল নেই, বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো তার উপরে। টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে গেলো লালবাজার থানায়। যারা দেখল বলল স্বদেশীবাবু। লালবাজারে ঘটনা রেকর্ড করে গাড়িতে করে তাকে পাঠিয়ে দিল ইলিশিয়াম রো-তে আইবি-র স্পেশাল ব্রাঞ্চে।

কলকাতার জীবনযাত্রা যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগলো।

সাঁইত্রিশ

দেখো, কাল রাতে ঠাকুরপো ফেরেনি, আজ এত বেলা হল তবু এলো না। ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না পারবার কোন কারণ নেই। কালকে তোমরা বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করেছিলে তাই তোমাদের জব্দ করবার জন্যে কোথাও রাত কাটিয়েছে। আজ সেখান থেকেই কলেজ যাবে, বিকালে ঠিক আসবে।

তুমি তো বুঝিয়ে দিলে কিন্তু কলকাতায় রাত কাটাবে কোথায়? ওর বন্ধুবান্ধব তো কেউ আছে বলে জানি না।

কেন রমণী?

রমণীর সঙ্গে আগে ওর ভাব ছিল বটে কিন্তু ইদানীং ওর সঙ্গে কেমন ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে।

রাত কাটাবার মতো সহপাঠী ওর নিশ্চয়ই আছে।

তুমি তো নিশ্চয় বললে, আমার মন মানছে না।

এমন সময়ে মলিনা ওদের ঘরে ঢুকে বলল, দোষ তোমার বউদি, তুমি কালকে যা ঠাট্টা করলে।

এমন ঠাট্টা বউদি থাকলেই করে। ওগো, আমি বলি কি তোমরা দুই ভাই-বোনে ওকে খুঁজতে বের হও।

কোথায় যাবো বলে দাও?

কেন, হরিদ্বার—ওখান থেকেই তো মহাপ্রস্থানের পথ শুরু হয়েছে।

বউদি, তোমার ঠাট্টার মুখটা অত্যন্ত মুখর।

কেন ভাই, আমি কি মিথ্যা বলেছি, বিয়ে করবার ভয়ে কতজনে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে।

আচ্ছা তোমার কথাই মেনে নিলাম রুক্মিণী, আজ কলেজে গিয়ে যদি দেখা না পাই তবে একেবারে হরিদ্বারের টিকিট করে ফিরবো।

তাহলে একেবারে তিনখানা করো, ভাই-বোনের সঙ্গে আমিও যাবো, আর কিছু না হোক তীর্থদর্শনের পুণ্য হবে।

মন্দ নয়, একসঙ্গে ঠাকুর ও ঠাকুরপো দুজনেরই দেখা পাবে।

দশটার সময়ে শচীন কলেজে চলে গেল। বেলা দুটো আড়াইটা নাগাদ সুরেন বাঁড়ুজ্জের খাস কামরায় তার ডাক পড়লো।

ওহে শচীন, সুশীলের খবর পেয়েছো?

না স্যার, কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি, আজ এত বেলা অবধি দেখা নেই। ভেবেছিলাম কলেজে দেখা পাবো, এখানেও কোন ক্লাসে যায়নি।

স্থির হয়ে বসো, খবর খুব গুরুতর। খুনের দায়ে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

খুনের দায়ে! আর কোন কথা জোগালো না তার মুখে। তারপরে বলল, সে তো কোন সন্ত্রাসবাদী দলে নেই।

কি করে জানলে? ওসব দলে যারা ভর্তি হয় মন্ত্রগুপ্তিতে তারা অভ্যস্ত।

খুনের দায়ে ধরা পড়েছে এ খবর আপনাকে দিল কে?

আমাকে খবর দেবার লোক সর্বত্র আছে।

সে ব্যক্তি কি জানতো সুশীল রিপন কলেজের ছাত্র?

ছাত্র হলেই আমাকে খবর দেয় যে কলেজেই সে পড়ুক। শোনো, আর বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই, তুমি এই চিঠিখানা নিয়ে হাইকোর্টে গিয়ে মিঃ ব্যোমকেশ চাটুজ্জের সঙ্গে দেখা করো, কি বলেন আমাকে এসে জানাবে। এখানে না পেলে বেঙ্গলী আফিসে আমাকে পাবে। এই নাও চিঠি লিখেই রেখেছি।

শচীন চিঠি নিয়ে হাইকোর্টে রওনা হল, পথে অবিনাশবাবুকে অবিলম্বে আসবার জন্যে জরুরী টেলিগ্রাম করে দিল।

চাটুজ্জে সাহেব চিঠি পড়ে বললেন, তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

বেশিক্ষণ শচীনকে অপেক্ষা করতে হল না, এক ঘন্টার মধ্যেই তিনি ফিরে এসে জানালেন, হল না, সুশীলকে ইলিশিয়াম রো-তে পাঠিয়ে দিয়েছে, আজ আর দেখা হওয়ার আশা নেই।

কালকে দেখা হবে কি?

চেষ্টা করতে হবে। কালকে নিতান্ত না হয় পরশু যখন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিসট্রেটের আদালতে ওকে হাজির করবে তখন দেখা হবে, পরশুর মধ্যে ওকে আদালতে হাজির করতেই হবে। এর মধ্যে আমি খবর নেবার চেষ্টা করবো ওর বিরুদ্ধে কি চার্জ।

শুনছি খুনের চার্জ।

লোকটা যদি একেবারে খুন হয়ে গিয়ে থাকে তবে মন্দর ভালো। আসামীকে খালাস করা সহজ, আধমরা করে ছেড়ে দিলে সেরে উঠে গোল বাধায়। যাও, যেমন শুনলে বাঁড়ুজ্জে সাহেবকে বলো, আমি আর চিঠি দিলাম না।

সুরেনবাবু কলেজেই ছিলেন। সমস্ত বিবরণ শুনে গম্ভীর ভাবে বললেন, তাইতো! একে বারে ইলিশিয়াম রো-তে নিয়ে গিয়েছে! সহজে ছাড়া পাবে মনে হয় না। ভরসা এই যে চাটুজ্জেসাহেব কেস টেক আপ করেছেন।

শচীন বলল, স্যার, একটা বিষয়ে আপনার উপদেশ চাই।

কি বলো?

বাড়িতে সকাল থেকেই সকলে উদ্বিগ্ন, আসল কথা শুনলে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেবে। কি করা যায়?

আসল কথা এখন না-ই বললে।

জিজ্ঞাসা করলে?

বলো যে আমি খোঁজখবর নিচ্ছি।

তা হলে অনেকটা ভরসা পাবে।

তোমার আবার বাড়িতে প্রবীণ পুরুষ মানুষ কেউ নেই—আচ্ছা এক কাজ করো না কেন, অবিনাশবাবুকে আসতে জরুরী তার করে দাও।

দিয়েছি।

উত্তম।

কিন্তু স্যার, কাল সকালে খবরের কাগজেই যে সব কথা প্রকাশ পাবে?

না, সব কথা প্রকাশ পাবে না। এ-সব রাজনৈতিক খুনে সব কথা প্রথম দিনেই ছাড়ে না পুলিশে। কালকে থাকবে লালদীঘিতে দুপুরবেলা একজন পুলিশ ইনসপেকটার খুন হয়েছে—আসামী পলাতক।

পলাতক তো নয় স্যার?

পলাতক না বললে নাম ধাম দিতে হয়, সেটা ওরা অত সহজে জানাতে চায় না, তাতে

দলের অন্য লোক ধরবার অসুবিধা হয়। দেখো ইতিমধ্যে যদি অবিনাশবাবু এসে পড়েন, তুমি বল-ভরসা পাবে, ধীরে ধীরে মেয়েদের মন তৈরি করবার সুযোগ হবে।

শচীন বাসায় ফিরে গিয়ে সুরেনবাবুর শিক্ষা মতো বলল। স্বয়ং সুরেন বাঁড়ুজ্জে হাত দিয়েছেন শুনে রুক্মিণী ও মলিনা আশ্বস্ত হল। তবু তারা প্রতি মুহূর্তে সুশীলের প্রত্যাবর্তনের আশা করতে লাগলো, দরজায় সামান্যতম শব্দ হতেই ওরা উৎসাহ বোধ করে।

শচীন জানালো কালকে ভোরের গাড়িতে মাস্টারমশাই আসবেন।

রুক্মিণী শুধালো, হঠাৎ?

কলেজের ঠিকানায় তার করেছিলেন, বোধ করি কোন কাজ আছে।

অবিনাশবাবু আসলে আসতে পারেন এই আশা নিয়ে শচীন ভোররাতে শেয়ালদহ স্টেশনে গেল। আশাভঙ্গ হল না তার। অবিনাশবাবু গাড়ি থেকে নামতে নামতে শুধালেন, কি শচীন, তার করেছিলে কেন, বাসাতে সব ভালো তো?

হাঁ, সব কুশল; চলুন বলছি—বলে একখানা ঠিকে গাড়িতে তাঁকে উঠিয়ে নিজে উঠল, উঠবার সময় একখানা ইংরাজি কাগজ কিনে নিল। পড়ে দেখল সুরেনবাবু যেমন বলেছিলেন খবরটা প্রায় ঠিক তেমনি আকারে বের হয়েছে, প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সেই রকম। তখন শচীন আদ্যন্ত বিবরণ, সুরেন বাঁড়ুজ্জে ও চাটুজ্জে সাহেবের হস্তক্ষেপ প্রভৃতি বিবৃত করলো, জানালো এ সময়ে আপনি থাকলে বল ভরসা পাবো—সুরেনবাবুরও সেই মত।

অবিনাশবাবু বললেন, সুরেনবাবুর কথাই ঠিক, এখন আসল কথা প্রকাশ করা হবে না। ওরা অবশ্য এর মধ্যেই খবরের কাগজ পড়ে সব জেনেছে। খুন হয়েছে তো খুন হয়েছে, কলকাতায় এমন তো আজকাল হামেশা খুন হচ্ছে। খুনীর নাম না জানতে পারলেই হল।

অবিনাশবাবুর আগমনে রুক্মিণী ও মলিনা অত্যন্ত খুশী হল, এই সংকটের মধ্যে কোন একটা আশ্রয় জুটলো।

চা খাওয়ার সময়ে রুক্মিণী বলল, বাবা, সুশীল ঠাকুরপো আজ দু'দিন কোথায় গিয়েছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি বললেন, পুরুষমানুষ, কলেজে পড়ে, বাইশ বছর বয়স, গিয়েছে তো গিয়েছে, অত ভাবছিস কেন?

রুক্মিণী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না, ভাববো কেন, খবরটা তোমাকে জানালাম। দেখেছ বাবা, কালকে একজন পুলিশ ইনসপেকটার লালদিঘিতে খুন হয়েছে!

কলকাতাতে তো এমন হচ্ছেই মা।

শচীন একবার কলেজে গেল, পড়াবার জন্য নয়, সুশীলের কোন খবর আছে কি না জানবার আশায়। সুরেনবাবু জানালেন, না, কোন খবর এ পর্যন্ত আসেনি, তবে আগামীকাল খবর জানতেই হবে, আর চেপে রাখবার উপায় নেই পুলিশের। অবিনাশবাবু এসেছেন তো?

বিকালবেলা অবিনাশবাবুকে নিয়ে শচীন বেড়াতে বের হল, আসল উদ্দেশ্য কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা।

রুক্মিণী ও মলিনা দোতালার বারান্দায় বসে গল্প করছিল, দু'জনেরই মন আজ অনেকটা

হাল্কা। এমন সময়ে শুনতে পেলো একজন হেঁকে চলেছে, আবার একী খুন হইয়ে গেল বাবু, আবার এক খুন, লালদীঘির পরে গোলদীঘি, শহর ভারি গরম বাবু ভারি গরম।

ভূষণদাসকে দিয়ে একখানা কাগজ কিনিয়ে এনে ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার উপরে এবং পরমুহূর্তেই মলিনা ছিন্ন জ্যা ধনুকের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। রুক্মিণী দেখল তার দুই চোখ আগুন ছিটোচ্ছে। কী ব্যাপার জানবার জন্যে কাগজের দিকে তাকিয়ে দেখল মোটা মোটা নির্বিকার অক্ষরে মুদ্রিত "রমণী ভৌমিক নামে এক যুবক গোয়েন্দা সন্দেহে গোলদীঘিতে দিনদুপুরে নিহত।" মলিনার দিকে তাকাতে দেখল, সে নেই, পিছু পিছু গিয়ে দেখতে পেল বিছানার উপরে শুয়ে পড়ে বালিশ মুখে গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে এল সে।

আটত্রিশ

আবার আমার ডাক পড়ল কেন?

বসো, বসো, একটা ত্যাঁদড় ছোকরা এসেছে, কিছুতে মুখ খুলছে না।

মজুমদার, তোমাদের হাতে তো অনেক রকম আছে।

মিস ফ্লোরা আছে সত্যি, সবরকম চেষ্টাই হয়েছে, থার্ড ডিগ্রির চরম করে ছেড়েছি কিন্তু সেই যে দাঁতে দড়ি দিয়ে শুয়ে আছে না রাম না কৃষ্ট।

আরও একটা চালাও না, মুখ খুলতেই হবে।

ভয় হয় পাছে মারা পড়ে।

ভয় কি, ডাক্তার তোমার হাতে, মরলেই অ্যাপোপ্লেক্সির সার্টিফিকেট; এমন তো কত হল।

সে-সব দিন আর নেই। এই স্বদেশী আরম্ভ হওয়া অবধি হাওয়া বদলে গিয়েছে। খবরের কাগজগুলো হৈ হৈ করে উঠবে, শেষে জবাবদিহিতে পড়ে যাবো।

যেন তাতে কত ভয় তোমার!

না না, যাও মাইরি, মধুর ভাবে যদি হয় সেই ভালো।

আর যদি না হয়?

তবু প্রাণে মরবে না। আর হবেই বা না কেন, তোমার অসাধ্য কি!

তা বটে, তবে কি জানো মজুমদার, এই স্বদেশী আসামীগুলো একটু আলাদা রকমের।

দেখোই না একবার চেষ্টা করে।

এই কে আছিস, মিস ফ্লোরাকে নিয়ে যা ৪ নম্বর সেলে।

মিস ফ্লোরা প্রস্থান করলে মজুমদার আবার ফাইলে মনোনিবেশ করলো। মিঃ মজুমদার ইলিশিয়াম রো স্পেশাল ব্রাঞ্চের সর্বশক্তিমান সুপারিন্টেনডেন্ট আর মিস ফ্লোরা, যদিচ এখন মধ্যবয়সী, তবু ধার কম নয়, মজুমদারের শেষ অস্ত্র, ইন্দ্রের যেমন উর্বশী, মহিলাটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান।

ফাইলে মন লাগছিল না মজুমদারের, বারে বারে মনে পড়ছিল ৪ নম্বর সেলের তরুণ আসামীর কথা, তার অদম্য সাহস, অসীম সহিষ্ণুতা। হঠাৎ মনের কথা তার মুখে উচ্চারিত

হল—আহা এই সব ছোকরা যদি দেশের কাজ করতো! তা নয়, নরহত্যা করছে, কোথা থেকে শিখলো এসব! স্কুল-কলেজে মাস্টারগুলো কী শিক্ষাই না দিচ্ছে আজকাল, পড়তো আমার হাতে! একী, এরই মধ্যে ফিরে এলে কেন?

কোথায় পাঠিয়েছিলে মজুমদার, এ যে আমার নাতির বয়সী!

ক্ষতি কী?

ক্ষতি এই যে মন সরলো না। ওর সঙ্গে কী—ছিঃ ছিঃ—

কালে কালে কতই দেখালে মিস ফ্লোরা, তোমারও লজ্জা—

ভেবেছিলাম নেই।

হঠাৎ ওকে দেখে বাৎসল্যরস জেগে উঠল, কি বলো?

ঠাট্টা করো আর যাই করো আমার দ্বারা হবে না। আর এক কথা, আমার সমবয়সী আসামী ছাড়া ভবিষ্যতে আর কারো কাছে পাঠাবে না।

বয়সমাফিক আসামী এখন পাই কোথায়। আচ্ছা মনে রাখবো।

না না, থাক, আজকার ফি আর দিতে হবে না।

অবশেষে মিস ফ্লোরারও বৈরাগ্য!

হয় হয় মজুমদার, হঠাৎ কোনদিন দেখবে তোমারও হবে।

এই অসম্ভব ইঙ্গিতে মজুমদার হো হো শব্দে হেসে উঠল।

আমি চললাম, দরকার হলে মিস রোজিকে ডেকে পাঠিও, সে ওর সমবয়সী হবে।

আচ্ছা তাকেই ডাকাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস রোজি এসে হাজির হল। বয়সে তরুণী, সুন্দরী বলাই চলে, এক সময়ে আরও সুন্দরী ছিল তবে অনেক শান পড়াতে সৌন্দর্য কতকটা ক্ষয়ে গিয়েছে। এটিও মজুমদারের উর্বশী আয়ুধ।

গুড ইভনিং মিস রোজি, একটি আসামী কিছুতেই মুখ খুলছে না অথচ ওর পেটে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য আছে। কিছু করতে পারো?

কেন পারব না, বয়েস কত?

এই ধরো বছর বাইশ হবে।

রাইট এজ।

আর বুড়োরা?

বুড়োরা সহজে মুখ খোলে, কিন্তু আমারও তো ভালো মন্দ লাগা আছে।

তবে যাও, একে ভালই লাগবে, বেশ সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবক।

রাইটো, বাই-বাই।

আমি এখানেই আছি।

ঘন্টা দুই-তিন লাগতে পারে।

যা বলে লিখে নিয়ো।

না, তা চলবে না, মনে রাখবো, তোমার কাছে এসে অবিকল বলবো, ভুলবো না।

আবার বাই-বাই করে মেয়েটি একজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে ৪ নম্বর সেলের দিকে চলে গেল।

ঘন্টা দুই-তিন পরে ফিরে এলো মিস রোজি।

আশা করি সাকসেসফুল।

আশাতীতভাবে সাকসেসফুল।

মুখ খুলেছে?

খুলবে না! একি বুড়ী ফ্লোরা।

তবে এত দেরী হল কেন?

ছাড়তে চায় না।

ইনডিড! ইউ আর এ ব্রিক।

গোড়াতে একটু আপত্তি করেছিল, ওরকম করেই, একেবারে প্রথম কিনা—

বুঝলে কি করে ?

না বুঝলে এলাইনে আসবো কেন?

মুখ তো খুললো, কি বলল?

দাও, একখানা কাগজ দাও লিখে দিচ্ছি।

সুশীল নামধাম পিতৃপরিচয় কলেজের নাম, কোন্ বার্ষিক শ্রেণী প্রভৃতি সমস্তই বলেছিল, কেবল কলকাতার বাসার ঠিকানা ছাড়া। জানতো ঠিকানা দিলে দাদাকে নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

এতক্ষণে এইটুকু! মজুমদারের কণ্ঠে হতাশার সুর।

বুঝলে না মজুমদার, কিছু হাতে রাখলো, বলল কালকে এসো আরও বলবো। পাছে না আসি এই ভয়।

তার মানে রীতিমতো রস পেয়েছে।

পাবে না! একি বুড়ী মাগী ফ্লোরা নাকি!

কালকে দশটার সময়ে ওকে আদালতে নিয়ে যেতে হবে, তার বেশ কিছুক্ষণ আগে এসো। এই নাও—বলে টাকাভরা একটা থলি তার দিকে ছুঁড়ে দিলে, সেটা লুফে নিয়ে গুডনাইট জানিয়ে চলে গেল মিস রোজি। কত টাকা দিল মজুমদার নিজেও জানে না—দুষ্কর্মের টাকার হিসাব কে রাখে!

বেলা তখন আটটা হবে, মজুমদার বসে আছে নিজ কক্ষে, পাশের চেয়ারে মিস রোজি, এই সকালেই এসে জুটেছে সে।

এমন সময়ে ওয়ার্ডার ছুটে এসে বলল, হুজুর একবার ৪ নম্বর সেলে আসুন। মজুমদার উঠল, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মিস রোজি। ওয়ার্ডার বলল, মিসি বাবা এখানে থাকুন। মিস রোজি শুনলো না, মজুমদারের পিছু পিছু চলল।

৪ নম্বর সেলের দরজা খোলা, ঢুকবার আগেই দুজনে দেখতে পেলো ভেন্টিলেটারের শিকের সঙ্গে পরনের কাপড় জড়িয়ে গলায় ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় ঝুলছে সুশীলের গতপ্রাণ দেহ।

কখন দেখলি?

হুজুর, সেলের দরজা খুলতেই।

মিস রোজি সহ্য করতে পারলো না এই দৃশ্য, ফিরে গিয়ে সে বসলো চেয়ারখানায়, কালকে যে দেহটা নিয়ে এত মাতামাতি করেছিল আজ তার এই বীভৎস পরিণাম!

যা, ডাক্তারকে খবর দে।

এমন সময়ে তার চোখ পড়লো দেয়ালের দিকে—ওকি , ওসব কে লিখল! দেয়ালে লোহার আঁচড় দিয়ে লেখা আছে—"চরিত্রহানি, শপথভঙ্গ, মৃত্যু।"

লিখল কি দিয়ে? ·

কি জানি হুজুর!

এই যে মগের হাতলভাঙা, হাতলের আঁচড় দিয়ে লিখেছে। আগে মুছে ফেল্, এখনই মুছে ফেল্। তার পরে দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আয়।

এ দৃশ্য মজুমদারের পাষাণ-প্রাণের পক্ষেও অসহ্য।

ভাগ্যে কলেজের ঠিকানা দিয়েছিল, যাই একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দি সুরেন বাঁড়ুজ্জের নামে, যা হয় করবেন। খস খস করে চিঠি লিখে ডাকলো ইনসপেকটার এই জরুরী চিঠিখানা এখনই সুরেন বাঁড়ুজ্জের হাতে পৌঁছে দাও, বেঙ্গলী আফিসে গেলে তাঁকে পাবে।

এতক্ষণে খেয়াল হল যে সামনের চেয়ারে বসে আছে মিস রোজি। বলল, মিস রোজি, এই নাও তোমার ফি। সে উঠে দাঁড়িয়ে জানালো, না, ওটার প্রয়োজন নাই। তার পরে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই দ্রুত বের হয়ে গেল। উর্বশীও মাঝে মাঝে ঘায়েল হয়।

মজুমদারের মন বিকল হয়ে গিয়েছিল। অনেককাল আগে তার ঐ বয়সের একটি ছেলে রাগারাগি করে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। এই দৃশ্যে সেই দৃশ্য তার মনে চাবুক চালাচ্ছিল।

উনচল্লিশ

এই দিন সুশীলের সংবাদ বলে সুরেন্দ্রবাবু একখানা চিঠি এগিয়ে দিলেন অবিনাশবাবু ও শচীনের দিকে। ওরা সুরেনবাবুর জরুরী চিঠি পেয়ে বেঙ্গলী আফিসে এসে পৌঁছেছে। চিঠি পড়বার আগে ওরা সুরেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলো, তাঁর সদাপ্রফুল্ল মুখ আজ গম্ভীর ও ম্লান।

কী আর পড়বেন। ইলিশিয়াম রো-এর পুলিশ থানায় সুশীল মারা গিয়েছে। পুলিশ থানায় যখনই যার মৃত্যু হয় মরে অ্যাপোপ্লেক্সি রোগে—কখনো কাউকে অন্য কারণে মরতে দেখলাম না। ঐ রোগটা বড়ই একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে—এ বারে পুলিশের উচিত অন্য কোনো রোগের নাম ব্যবহার করা—আমাদের দেশে রোগের অভাব কি। ওরা পড়ছিল, শচীনের চোখে অক্ষরগুলো নাচছিল—অবিনাশবাবুর চোখ অবশ্য ধীর স্থির।

পড়ুন পড়ুন, দেখবেন অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। আসামীর গলায় পৈতে দেখে বুঝলো ব্রাহ্মণ—তাই তার মৃতদেহ চার-পাঁচজন বিশুদ্ধ পাঁড়ে ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠিয়ে দিয়েছে—প্রেসিডেন্সি জেলে। আহা পুলিশের কি ধর্মজ্ঞান। সেখানে আদিগঙ্গার ধারে আপনারা না

পৌঁছানো অবধি তারা মৃতদেহ নিয়ে অপেক্ষা করবে। আরও কত বিবেচনা দেখুন, জ্বালানী কাঠ, পুরোহিত ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদিও সেখানে মজুত থাকবে। আপনাদের কাজ কেবল কষ্ট করে উপস্থিত হওয়া।

স্যার, কিছুই তো বুঝতে পারছি না, হঠাৎ, আর দিব্য সুস্থ স্বাস্থ্যবান ছেলে—

শচীন, পুলিশের মতো বিশেষজ্ঞ হলে বুঝতে পারতে অ্যাপোপ্লেক্সি রোগে মৃত্যু হঠাৎ ছাড়া হয় না, আর ও রোগটা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবানকে বড় খাতির করে না। অবিনাশবাবু, আর দেরি করবেন না, শচীন ছেলেমানুষ, বিচলিত হয়ে পড়েছে, ওকে সামলে নিয়ে আপনারা অগ্রসর হোন।

সেই ভালো, চলো শচীন।

আমিও চললাম, গিয়ে কলেজ ছুটি দিয়ে দেবো।

এই উপলক্ষে?

কেন নয়? বেটারা খবরটা চাপা দেবার চেষ্টায় আছে—এখন কলেজ ছুটি হলে হাজার মুখে খবরটা দশ হাজার হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। তার পরে বেঙ্গলীর সম্পাদকীয় তো হাতেই রইলো।

শচীন ও অবিনাশবাবু প্রেসিডেন্সি জেলে আদিগঙ্গার ধরে পৌঁছে দেখল, পুলিশ পাহারায় চার-পাঁচজন পাঁড়ে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বাহিত একখানা চার-পাইয়ের উপরে চাদরে ঢাকা মৃতদেহ শায়িত।

পাঁড়েদের মধ্যে প্রবীণতম একজন বলে উঠল, কি করবেন বাবুজি, এহি তো সংসারের নিয়ম—তুলসীদাসজি বলেছেন—

শচীন রাগে গরগর করছিল, বলে উঠল, অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরু—

পাঁড়েজির বিদ্যা ততদূর পৌঁছায় না, বলল, বাত তো ওহি হ্যায় লেকিন তুলসীদাসজি ভাখামে বোলা হ্যায়—সদ গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করো উপদেশ—হয় পরবর্তী ছত্রটা মনে পড়লো না কিংবা ওদের মুখে প্রশংসার আভাস না দেখতে পেয়ে নিবৃত্ত হল।

চিতা সজ্জিত ছিল, পুরোহিতের ইঙ্গিতে পাঁড়ে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক দেহ চিতার উপরে ওঠানো হল। পুরোহিত যথারীতি মন্ত্রাদি পাঠ করে শচীনকে মুখাগ্নি করতে অনুরোধ করলো। অবিনাশবাবু বললেন, মুখের চাদর খুলে দিন। মৃতদেহের বীভৎস বিকার দেখে শচীন বালকের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। অবিনাশবাবু এক নজরেই বুঝলেন গলায় ফাঁস মৃত্যুর কারণ, পুলিশের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি শচীনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন, শচীন, শচীন, শান্ত হও, তোমার চেয়েও অনেক বেশি দুঃখ পাবেন যাঁরা তাঁদের কথা ভাবো।

শচীন চিতা প্রদক্ষিণ করতে লাগলো কিন্তু চোখের জল থামলো না। বহ্নিময় পাবক কিছুক্ষণের মধ্যেই সুশীলের যা কিছু নশ্বর বহন করে নিয়ে গেল দেবলোকের দিকে। চিতাগ্নি গঙ্গার পবিত্র জলে নির্বাপিত করে দুজনে রওনা হল বাসার দিকে। দুজনেই নীরব। গাড়ি বাসার কাছে এসে পৌঁছলে শচীন বলল, মাস্টারমশাই, কি বলবো ওদের?

তোমার কিছুই বলতে হবে না, যা বলবার আমি বলবো।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শচীন বলল, কি বলবেন?

এ সব বিষয় সোজাসুজি সংক্ষেপে বলাই প্রশস্ত, পল্লবিত করতে গেলেই খেলো হয়ে পড়ে। গাড়ি বাসার সম্মুখে এসে থামলো।

দোতালার বারান্দার পথের দিকে তাকিয়ে রুক্মিণী ও মলিনা সারাদিন আজ অভুক্ত অস্নাত অবস্থায় অপেক্ষা করেছে। তাদের মন বলছিল গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে আর সেটা সুশীল সম্বন্ধীয়। ঠিক মৃত্যুর কথাটা মনে আসেনি, কিংবা দু-একবার উঁকি মারলেও ওদের প্রযত্নে ঢুকতে পারেনি। এমন সময়ে দেখতে পেলো, একখানা গাড়ি থামলো, গাড়ি থেকে নামলো অবিনাশবাবু ও শচীন, তাদের রুক্ষ মলিন বেশ, মুখের চেহারা মলিনতর। সঙ্গে সুশীল নেই কেন!

অবিনাশবাবুর পিছনে পিছনে শচীন প্রবেশ করলো, সে নীচের তালায় অপেক্ষা করবার প্রস্তাব করলো।

না, সে হবে না, দুঃখকে পাশ কাটিয়ে দুঃখের প্রতিকার হয় না, আমার সঙ্গে এসো।

বাবা সুশীল কোথায়?

সুশীল নেই, কাল বাতে পুলিশের থানায় অ্যাপোপ্লেক্সি রোগে তার মৃত্যু হয়েছিল, আদিগঙ্গার তীরে যথারীতি তার সৎকার করে ফিরে আসছি।

মলিনা গর্জন করে উঠল, সব সাজানো মিথ্যে কথা, পুলিশে মেরে ফেলেছে ছোটদাকে।

রুক্মিণী মুখে কিছুই বলল না, অবিনাশবাবুর কন্যা সে।

রুক্মিণী, আজ রাতের এক্সপ্রেসে সকলকে বাড়ি রওনা হতে হবে।

তোমরা কিছু খাবে না বাবা?

এক গ্লাস জল।

এক কাপ চা?

রুক্মিণী, তোমরা কিছু খেয়েছো কি না আর জিজ্ঞাসা করবো না।

না, কোরো না বাবা।

ভূষণদাসের হাতে বাসার চাবি দিয়ে সেই মুহ্যমান পরিবারটি রওনা হল— আর ভোরবেলায় এসে নামলো দিনাজশাহী রেল স্টেশনে।

হঠাৎ একখানা ঠিকে গাড়ি বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে দেখে, চারজনকে নামতে দেখে যজ্ঞেশবাবু দরজায় এসে দাঁড়ালেন, নিস্তারিণী দেবী উঁকি মারলেন দরজায়।

সঙ্গে সুশীল নেই কেন! এদের এমন দীন রুক্ষ বেশ কেন!

অবিনাশবাবু এগিয়ে গিয়ে নিস্তারিণীর কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, বেয়ান, সুশীল নেই।

সুশীল নেই, সুশীল নেই বার কয়েক মুখে উচ্চারণ করে প্রথমটা বুঝতে না পেরে, তারপর বুঝতে পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন নিস্তারিণী দেবী।

ততক্ষণে যজ্ঞেশবাবু এসে পৌঁছেছেন।

এতক্ষণে অন্তর্লীন শোকের ধ্যানভঙ্গ হল রুক্মিণীর, মা, যাওয়ার সময় আমাকে প্রণাম করে গেল কেন, বুঝতে পারিনি, কেন আমি বারণ করলাম না, বলে সে মূর্ছিত হয়ে পড়লো। মূর্ছিতার পায়ের উপরে মূর্ছিত। এখন আর সে অবিনাশবাবুর কন্যা নয়, এই হতভাগ্য পরিবারের বধূ।

পরিশিষ্ট

রুক্মিণী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। এই নিদারুণ আঘাতের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক দিন আগে তার দুটি যমজ পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নিস্তারিণী দেবী চোখের জল মুছতে মুছতে সদ্যোজাত পৌত্রদের কোলে তুলে নিলেন। পিতামহ যজ্ঞেশবাবু তাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, একেবারে এক রকম, নাম দিলেন লব আর কুশ। যজ্ঞেশবাবুর ঐ 'একেবারে এক রকম' কথাটা সকলের মনে একই তরঙ্গ উত্থিত করল ওরা কেবল নিজেদের মধ্যে এক রকম নয়, সুশীলের সঙ্গেও।

সমাপ্ত